চিমনীর কালো ধোঁয়া

মুরারী মুখোপাধ্যায়

পরিবেশক :
প্রকাশক ॥ ৮২/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

'উর্বশী'র যাত্রা শুরু হবে এবার।

'মেসার্স হোর এণ্ড মিলার' কোম্পানীর জোড়া চিম্‌নী দোতলা যাত্রীবাহী জাহাজ উর্বশী। গেরুয়া নদীর জলে-ভাসা সচল রাজ-প্রাসাদ যেন! গ্রাম বাংলার মানুষ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময়ে! সেদিনকার মানুষের অবশ্য থাকার কথা। 'উড়ো জাহাজ' দেখার জন্যে যখন মানুষ ঘর থেকে হুড়মুড় করে উঠোনে নেমে আসতো। নিচু চালের ধাক্কায়—মাথা যাবে বা কপাল যাবে, সে কথা অগ্রাহ্য করে। ছেলে বুড়ো সবাই। বুড়োরা রীতিমত নাটকীয় ভঙ্গিতে বুকের ধড়ফড়ানির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বল্‌তো, বাব্বা! নোহার দিব্য। আগাশে উড়তেচে। ঘোর কলি—ঘোর কলি। আরো কত কি পাপ চোকে দেক্‌তে হবে ঠাকুর—। কথা শেষ হবার আগেই দুই কানে দুই হাত এসে স্পর্শ করতো; আর তারপর দুই হাতের অঙ্গুলি সমষ্টি একত্রিত হয়ে অনেকখানি ঊর্ধ্বে উঠতো, দুটি হস্তদণ্ডকে যথা সম্ভব শক্ত করে। যে সুপরিচিত ভঙ্গিটি কোন্ আদিমযুগ থেকে মানুষ রপ্ত করেছে এবং আজো কোটি কোটি করযুগলের যে ঘনিষ্ঠ মাধ্যম পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সৃষ্টিকর্তা-রূপী সাকার-নিরাকারের উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে।

সমাজে বাড়তি সৌভাগ্যের অধিকারীরা অবশ্য এই দেবদুর্লভ সম্মানের সিংহভাগ আজো সমানে পেয়ে আসছেন।

জাহাজের নোঙর তোলার আগে—কয়েকবার ভোঁ বাজে। যাত্রীরা ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় একটু জায়গা খুঁজে নেবার জন্যে চারদিকে তাকায়। শ্যেন চক্ষু দিয়ে। এক চিলতে জায়গা পেলে,

হুমড়ি খেতে খেতে ছুটে আসে। কাপড়-গামছা বা কাগজ মেলে বসে পড়ে।

নিচের সমস্ত 'পাটাতন' তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট। ওপরের তলায় কাঠের ফাঁকা ফাঁকা বাটাম মারা—সাদা রঙ মাখান বেঞ্চের সারি। ওখানে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উচ্চবিত্ত যাত্রীরা বসেন। রাজা (!) ও রাজপুরুষদের ওখানে হামেশাই দেখা যায়।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ওপরে ওঠার এন্তার সুযোগ। 'দাঁড়িয়ে-যাবার' সুযোগও আছে। শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মার্কা দেওয়া আসনে বসতে মানা। এই সুযোগ অনেকেই নেন না। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে যাদের বিশেষ সম্পর্ক আছে তারা ওপরে বা নিচে রেলিং ধরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। নির্বাক। নিস্পন্দ। 'চেকারদের' লক্ষ্য আসনগুলোর ওপর।

'ফায়ার ম্যান' জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে বেলচার পর বেলচা কয়লা ছুঁড়ে দেয়। তাদের সারা অবয়বে এক অনির্বচনীয় ছন্দ ফুটে ওঠে। ছুঁড়ে দেওয়া কয়লার রঙ মুহূর্তের মধ্যে কেমন রাঙা হয়ে যায়। কয়লা পোড়ার গন্ধ কোন্ দূর দেশের হাতছানির মত উড়ন্ত মনের পাখনায় কেমন এক ধরনের চঞ্চল গতিবেগ সৃষ্টি করে দেয়। এখানেও দাঁড়িয়ে থাকে কিছু মানুষ।

এছাড়া ডেক বোঝাই যাত্রীরা পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে গল্প-গুজবে মশগুল হয়ে যায়। আলাপ আলোচনার বহর আর বসার ঢং দেখলে কে বলবে কিছুক্ষণের মধ্যে তাদের সবাইকে উঠে যেতে হবে। সবার মধ্যেই কেমন উচ্ছল প্রাণচঞ্চল ভাব। বড় স্পষ্ট। বড় জীবন্ত। এত মার্জিত জীবন যেন চোখেই পড়ে না। সারা দেশ থেকে ঝগড়াঝাটি, বিবাদ, বিসংবাদ, 'খিটিমিটি' সব কি রাতারাতি উধাও হয়ে গেছে? নইলে সংসারের ছোটখাট ঘটনা, বা মোটামুটি গড়নের বা স্থূল বিষয় নিয়ে হেসে পাগল কেন সবাই? অবশ্য এই ছড়িয়ে পড়া হাসির মাঝখানে—কারো কারো কথাবার্তায়

কষকষে কাল মেঘ ভেদ করে বিদ্যুৎ রেখা ফুটে ওঠে। বক্তার চোখে মুখে দৃপ্ত সত্যানুসন্ধানী তীক্ষ্ণ ভঙ্গি। শ্লেষ-বিদ্রূপ কারো কারো কথায় মূর্ত হয়ে ওঠে। অনেক দৃষ্টি মাঝে মাঝে সেদিকে আট্‌কে যায়।

তাসের আসরে আট্‌কে যায় অনেকে। দূর পথ। মনটাকে কায়দা ক'রে দূরে সরিয়ে রাখার খাসা পথ। সাহেব-বিবি-গোলাম আর তুরুপ টেক্কার ঘায়ে ঘায়ে দূর পথের দূরত্ব হারিয়ে যায়। মাঝে এক সময় সব কিছু ছেড়ে, হুড়মুড় করে উঠে পড়তে হয়। নামার জায়গায় এসে পড়েছে ইষ্টিমার। কাগজের টুক্‌রোর উপর কৃত্রিম মূল্যমানের ওজন চাপিয়ে 'ডাক' ওঠা পড়ার অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

মনের সামনে হার জিতের এক প্রতিযোগিতা খাড়া করে—যাত্রা পথের দু'পাশে, সামনে, পিছনে, ওপরে, নিচে কালো পর্দা ফেলে হারিয়ে যাওয়া—সাময়িক ভাবে। ভেসে চলে উর্বশী। কয়লার ধোঁয়া ছড়িয়ে।

ছোট ছোট চাক তৈরি হয়ে যায় সারা ডেক জুড়ে। মুড়ির বোচ্‌কা খুলে, মেয়েপুরুষ নির্বিশেষে যেন মুখ-চালানোর প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। এরই মাঝে ছোট্ট নাত্‌নি ঠাকুরমার নথের ফাঁদে আঙুল গলাবার চেষ্টা করে। তার হাত ওঠানো নামানোর কায়দা দেখে কেউ ফিক্‌ ফিক্‌ করে হাসে।

জাহাজের ডেকের দু'পাশে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, দু'দিকের জীবন্ত ছবি দেখে প্রাণ ভরে। কেউ চুল সামলাতে সামলাতে পাশের মানুষের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলে।

'আরমেনিয়ান' ঘাট ছেড়ে হুইসেল বাজাতে বাজাতে সশব্দে ছুটে চলে উর্বশী। পিছনের জগদ্দল পাখ্‌নার ক্রমাগত আবর্তনে এক গম্ভীর ছন্দ সৃষ্টি হয় যেন। খালাসীদের জীবনে এর প্রভাব প্রতি মুহূর্তে ঝরে ঝরে পড়ে। জাহাজীদের পেশী আর বুকের রক্ত নেচে

নেচে ওঠে। এই ছন্দের তালে তালে। নৃত্যরত উথাল পাথাল গেরুয়া জলে মাঝি-মাল্লাদের এ এক জবরদস্ত জীবন।

প্রশস্ত নদী বুকে নৌকো ডিঙির ভিড়। সামনে নৌকো পড়লে জাহাজের হুইসেল বাজে। সতর্ক মাঝি ঢেউয়ের দোলনায় দুলতে দুলতে উচ্চারণ করে: সাবাস জোয়ান—সাবাস জোয়ান—

দাঁড়িদের কাছ থেকে জবাব আসে—হেঁইয়ো—, হেঁইয়ো—

দাঁড়িদের শক্তি লাখো গুন বেড়ে যায় এতে।

মাঝি ক্রমাগত 'ঝিঁকে' মেরে যায়।

নৌকোগুলো 'এই গেল এই গেল'—অবস্থা থেকে ফিরে আসে। দাঁড়ি-মাঝিদের শিরা ওঠা হাতের কসরত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিখ্যাত ভাস্করের অনবদ্য সৃষ্টি যেন।

কোলকাতা থেকে ছুটে চলে উর্বশী। এঁকে বেঁকে। দক্ষিণ মুখে। সুন্দরবনের লাগোয়া এলাকায় রাস্তা ঘাটের বড় অভাব। দূরের যাত্রীরা সকাল-দুপুর-বিকেল বেলা ইষ্টিমারের ইষ্টিশানে ইষ্টিশানে ভিড় জমায়। ভাগ্যবানেরা অবশ্য এই দ্রুত-গতির জাহাজে চড়ে। অন্যেরা ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত। সামনে নদীনালা পড়লে তামার দু'একটা পয়সা বহু কষ্টে গামছার খুঁট থেকে খোলে। নৌকো কিংবা শালতি যোগে এপার ওপার হয়। তারপর ধূ ধূ মাঠের পটভূমিকায় হাঁটা—শুধু হেঁটে চলা। পথিকের এই জীবন্ত ছবি কোন নিপুণ শিল্পী যেন তুলির পোঁচে পোঁচে সৃষ্টি করে চলে।—সবুজ গাছ গাছালি আর রুক্ষ মাঠের প্রশস্ত পটভূমিকায়।

ক্রোশের পর ক্রোশ, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শুধু হাঁটা। পায়ের শিরাগুলো টন টন করে। পেশীর মধ্যে যন্ত্রণা শুরু হয়। কিন্তু তাকে গ্রাহ্য করা যায় না। আরো এগিয়ে যেতে হবে। মাথার

ঘাম গামছায় বা কাপড়ের খুঁটে মুছে ফেলে লোকালয়ের মানুষ জনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে এগিয়ে যেতে হবে। পরিচিত কেউ আছে কিনা খুঁজে বার করতে হবে। কিংবা নতুন করে বাঁধতে হবে পরিচয়ের রাখী। চলা তো এইভাবেই। যুগ যুগ ধরে মানুষ এইভাবে চলে আসছে।

রাত্রির বিশ্রাম। তারপর নতুন দিন। নতুন সূর্যের আলো। আঁকা বাঁকা রাস্তা। বাঁশের সাঁকো। মস্ত মস্ত হাঁ করা 'হানা'। তার ওপর দিয়ে পায়ে পায়ে পথ করে নিতে হবে। নদীর চরে, পলিমাটির ওপর পদচিহ্ন এঁকে এঁকে, এপার থেকে ওপার।—ওপার থেকে এপার! আসা। যাওয়া। নদীর ওপর আনন্দে নাচে ঢেউ। মনের ময়ূরের পেখম খুলে যায়! পাট ক্ষেতের সবুজ রঙ, মনের নিভৃত কোণে হিল্লোল তুলে।

পথিক হাঁটে। তার শিরায় শিরায় দৃপ্ত পদক্ষেপের প্রেরণা। আরো আগে--আরো আগে এগিয়ে যেতে হবে। এই তো জীবন!

এরই মাঝখানে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার মত কিছু দেখা যায় মাঝে মাঝে। সুন্দর করে সাজান, জমিদার বাবুর রঙচঙে নৌকো গুঞ্জনভরা স্রোতের উপর দেহখানা এলিয়ে দিয়ে ভেসে যায়। পরম নিশ্চিন্তে। সেদিকে তাকিয়ে চরের ওপর কোদাল-চালান-মানুষ কপালে হাত ঠেকায়। কপাল তখন অসংখ্য ঘামের ফোঁটায় ভরা। মনের মধ্যে গুঞ্জন ক'রে ওঠে একটি মাত্র কথা—'ভগমান ওদের ভাগ্যে নিখেচে—'

এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না মানুষ। সমানে দিনরাত খেটে যায়। এর জন্যে কোন আক্ষেপ নেই।

রায়নগরের গিরিধারী কর্মকার ভাগীরথীর ঢেউ ছড়ান চরের পাশ দিয়ে একমণ, দেড়মণ, লোহার 'মোট' মাথায় নিয়ে হেঁটে যায় বেহালা-বঁড়িশায়। প্রায় চোদ্দ পনেরো ক্রোশ রাস্তা। যাবার সময় কোঁচড় ভর্তি করে চাল নেয়। পথের শেষে কোঁচড়ে আর কিছু থাকে না।

অসুরের মত মানুষ লক্ষ্য বস্তুকে সামনে রেখে শুধু ছুটে চলে। বিরামহীন ভাবে। কোন আফশোষ নেই মনে। রাত্রির অন্ধকার-গর্ভ করুণাময়ী জননীর মত টেনে নেয় নিবিড় স্নেহচ্ছায়ায়। শরীরের অসংখ্য স্নায়ুকোষ পরম নিশ্চিন্তে এলিয়ে পড়ে। কর্মক্লান্ত জোয়ানদের নাক ডাকে।

হু হু করে ছুটে চলে উর্বশী। দূর যাত্রীদের অভিজাত যানবাহন। পথের দুপাশে সবুজ গাছপালা। মন্দির, মসজিদ, গম্বুজ সবুজ ডাল-পাতার আলিঙ্গনে জড়ান। ফাঁকে ফাঁকে জেটী, ক্রেন, কারখানা আর বাণিজ্য জাহাজের ভিড়। স্রোতের ওপর দোল খায় অজস্র 'বয়া'। রাতের অন্ধকারে এই বয়ার মাথার ওপর জ্বলে লাল নীল আলো। কোনটা স্থির। কোনটা জ্বলে নেভে। জাহাজের কাছে এই সংকেত মূল্যবান দিক্‌দর্শন হিসাবে বিবেচিত।

চলার পথে এই ইসারার ভাষা মানুষ হালফিলে বিশেষ ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে। আলো জলা আর নেভার মধ্যে সমুদ্রগামী বা সমুদ্র-ফেরা জাহাজের গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হয়। এরই পাশ দিয়ে উঁকি মারে একটা ভাবনা। মুহূর্তে মনকে আচ্ছন্ন করে দেয়। অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন অতিক্রম করে—মাটির শক্ত আবরণ ভেঙে আসে ছোট্ট একটু সবুজ ইসারা। এই সবুজের কণা একদিন সবুজের বান ডাকিয়ে দেয়। তারই ফাঁকে ফাঁকে হেসে ওঠে ফুল। ছড়িয়ে পড়ে গন্ধ। এই বর্ণ আর গন্ধ জীবনকে আঁকড়ে ধরতে শেখায়।

বাঁকের পরে বাঁক পেরিয়ে চলে উর্বশী। লোহা-লক্কড়ের আওয়াজ। সবুজের সমারোহ আর তার মাঝে মাঝে বিরাটাকার চিম্‌নীর মাথায় ধোঁয়ার কুণ্ডলী—ঊর্ধ্বে আরো ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চায়। বিরাট নীল আকাশখানাকে ঢেকে দিতে চায় যেন! উর্বশীর 'জোড়া চিমনী' দিয়েও কিছু ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে। এই সমস্ত

ধোঁয়াই কি আগামী দিনে নীল আকাশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিতে চায় ?

বেলচা হাতে কয়লার কালি মাখা একটা মূর্তি। আগুনের কুপে কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্লান্ত। সারা শরীর ঘাম আর কয়লার গুঁড়োর রঙে একাকার। আসল মানুষটিকে চেনা যায় না আদৌ। ছুটন্ত আন্দোলিত জলের দিকে তাকিয়ে সে ভাবে। ছোট্ট ভাবনা। শুধু কয়লাই কি ধোঁয়া হয়ে চিম্‌নী দিয়ে উড়ে যায় ? নদীর দুই ধারে অসংখ্য চিম্‌নী দিয়ে শুধু কি কয়লার ধোঁয়া উড়ে যাচ্ছে ? তার মত অজস্র মানুষ সারা দিনরাত যে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের উপর, তাও কি ধোঁয়া হয়ে আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে না ? ধোঁয়ার মধ্যে কি নেই তার মত অজস্র মানুষের যৌবন—'তাকত'—দীর্ঘশ্বাস - আশা —আকাঙ্খা - মর্মবেদনা ?

বেলচা হাত থেকে খসে পড়ে। হা হা করে হাসতে থাকে কালি মাখা আদিম-প্রায় মানুষটা। সে দেখতে পায় তার বুকের অজস্র রক্ত অসংখ্য স্রোতধারায় অগ্নিকুণ্ডে মিশে যাচ্ছে। বাধা দেবার ক্ষমতা নেই তার। বড় অসহায়। অবসন্ন। দুর্বল।

এখলাস—

জী হুজুর। চিন্তা ভাবনা ফেলে আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায় এখলাস।

উর্বশী এগিয়ে চলে। মানুষের সঙ্গে, নদীর জলে গরু মোষ স্নান করে পরম নিশ্চিন্তে। ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে তারই মধ্যে ঘাটে ঘাটে চলে পূজার্চনা। চলে সূর্য-প্রণাম। হাতের রক্তপুষ্প স্রোতের জলে ভেসে যায়। সূর্য দেবতার উদ্দেশে তার যাত্রা! চুলচেরা বিশ্লেষণে এর গন্তব্যস্থল সম্পর্কে অবিশ্বাস আছেই। কিন্তু বিশ্বাসী মনের ভাবনা ইস্পাত কঠিন। একবুক জলে দাঁড়িয়ে তারা। তাদের চোখে-মুখে সেই প্রত্যয়ের চিহ্ন জ্বল জ্বল করে।

কোন ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না, অনাহারে অর্ধাহারে ভোগা

মৎস্যজীবীরা। 'আজ খাই কাল আল্লা আছে'—বলা স্বভাব এদের। জালে মাছ পড়লে এদের চোখের কোণে আনন্দের রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জালে মাছ নেই তো হন্যের মতো ঘুরে বেড়ায় জলে জলে। অন্তত পক্ষে সিট্‌কি জালটা হাতে নিয়ে জলের নিচে পা মেপে মেপে এগিয়ে যায়। জলের ধাক্কা আর 'টান' ক্ষুধার তেজ বাড়িয়ে দেয় প্রতি মুহূর্তে।

এমনি বিভিন্ন ধরনের জীবনযাত্রার পাশ দিয়ে সগর্বে ভেসে চলে উর্বশী। জাহাজের পাখনার আঘাতে জলের ফেনার সঙ্গে ভেসে ওঠে ছোট ছোট মাছ। আকাশের উড়ন্ত চিলের দৃষ্টি এড়ায় না। ভেসে ওঠা মাছ পায়ের নখের কব্জায় আট্‌কে—তারা ছুটে চলে নিরাপদ আশ্রয়ে। যেখানে অন্তত সংগ্রহ করা খাবারটুকু বিনা বাধায় একটু আরাম করে খেয়ে নিতে পারে। জাহাজের পিছু পিছু পঙ্গপালের মতো ঘুরপাক খায় 'গাঙচিলের' দল। জাহাজের লক্ষ্য-স্থলই তাদের লক্ষ্য। খাবার জুটলে তীক্ষ্ণকণ্ঠে আনন্দ প্রকাশ করে। না পেলে করুণ কান্নায় ভরিয়ে দেয় আকাশ। খাবার নিয়ে কাড়াকাড়িও লেগে যায়। সাবধানতার হিসাব তাদের প্রতিটি পদক্ষেপে। লক্ষ্য স্থির করে তাকালে দেখা যাবে তারা প্রচণ্ড হুঁশিয়ার। চোখের তারাতে তার ছাপ সুস্পষ্ট।

মাঠের কৃষক আকাশের দিকে তাকায় মাঝে মাঝে। উদাস দৃষ্টিতে কি যেন বোঝার চেষ্টা করে। কেউবা কপালে হাতের তালু রেখে বলে, 'আর না—ঘাঁটাল ইষ্টিমার এসে গেল। বেলা অনেক হয়েছে।...'

জাহাজ থেকে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া, গুঁড়ো কয়লা আর একরকম সোঁদাটে গন্ধ ভেসে আসে। নতুন লোকজন বিশেষ করে মেয়েরা নাকে কাপড় চাপা দেয়। অনেকে কাগ্‌জী লেবুর পাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আঁচলে বেঁধে। না হলে বেয়াড়া উৎপাত শুরু হয়ে যায় পথে। পথে অবশ্য অনেক কিছুই হয়ে যায়—যার জন্যে

মানুষ প্রস্তুত থাকে না আদৌ। সেবার কাপড় ঘিরে দিয়ে এক নবজাতককে আহ্বান জানানো হলো এই কাঠের ডেকে। জাহাজের মধ্যেই জুটে গেল ধাইমা। …

বেলা বেড়ে যায়। উর্বশীর ভেতরেও ভিড় বাড়ে। বাচ্চারা কাঁদতে থাকে। লোকারণ্যে দমবন্ধ হয়ে যাওয়া ঘিঞ্জি পরিবেশে তারা থাকতে নারাজ। প্রতি মুহূর্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কান্না থামে না। স্বর উঁচু থেকে আরো উঁচুতে এসে পৌঁছয়। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ভোলাবার চেষ্টা বিফল হয়। তাব পাশাপাশি একদল মানুষ সমানে অকারণে পাল্লা দিয়ে চিৎকার, পাল্টা চিৎকার করে যায়।

'বাচ্ছা থামাও—থামাও—বাচ্ছা, থামানারে বাবা…'

সাদামাঠা মানুষেরা সব কিছু দেখে। দূর থেকে হাসে। বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করে। কথাবার্তা কয়।

এরই মাঝে অদ্ভুত ছাঁটের রঙ বেরঙের পোষাক পরা একটি জীবন্ত মানুষ ভীড় ঠেলে আসে। সার্কাসের ক্লাউন যেন! না, মজা দেখাতে আসে না সে। ভিড় ঠেলে অদ্ভুত ধরনের টোপর পরা এই মানুষ পায়ে ঘুঙুর বাজিয়ে মনসা কবিরাজের 'হাত-কাটা তেল', 'ভাস্কর লবণ' ইত্যাদির মহিমা কীর্তন করতে শুরু করে দেয়। সঙ্গী হারমোনিয়ামের রীড টিপ্‌তে থাকে। গান শুরু হয়। তারপর সরব ভাষণের পালা।

কেমন করে কাটা হাত জুড়ে যায়, তা দেখার জন্য ছুরি সঙ্গে রাখেন ভদ্রলোক। অন্য কেউ এ ব্যাপারে হাত নিয়ে এগিয়ে না এলে কি হয়, নিজের হাতের ওপর শুরু হয় গুণাগুণ পরীক্ষার প্রদর্শনী। কাটা হাতে রক্তের ওপর ওষুধ লাগিয়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে দেখানো হয় কাটা অংশ রীতিমত জুড়ে গেছে!

ওষুধ ভালই বিক্রি হয়। তাছাড়া বিক্রি হয়, ত—র—ল, ত—র—ল দাস্তবন্ধ করে দেওয়া ভাস্কর লবণ। আর মাথার যন্ত্রণা বন্ধ করা আশ্চর্য মলম।

এ লাইনে যারা চলা ফেরা করে টুপ্‌টাপ করে কিনে নেয় দু-এক ফাইল। তারপর হুড়মুড় বাজার শুরু হয়ে যায়।

উর্বশী থামে। লোক ওঠানামা করে। কোথাও জেটির ওপর দিয়ে। কোথাও নৌকোর সাহায্যে। অধিকাংশ ইষ্টিশানেই অবশ্য নৌকোর ব্যবস্থা। দক্ষিণ দিকের ইষ্টিশানে নৌকোগুলো লোক ভর্তি অবস্থায় যখন আসে তখন মনে হয় বনজঙ্গলের মধ্য থেকে এতগুলো লোক এলো কোথা থেকে? যাবার সময় ঐ একই কথা মনের মধ্যে গুন-গুন করে—এত লোক নৌকোয় করে নেমে গেল, এরা যাবে কোথায়? এই ধরণের চিন্তা মাথার মধ্যে বেশ জট পাকায়।

জাহাজের মধ্যেও কথার জটলা। একদল হিন্দীভাষী লোক গোল হয়ে বসে, কি একটা কথা নিয়ে হট্ট চট্ট লাগিয়ে দেয়। দেখেই এক নিমেষে বোঝা যায় দেশের ঝগড়া ওরা বাইরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে যত্ন করে নেওয়া গাঁট্‌রি বোচকার মতো। মাঝে মাঝে মাঠের মাঝখানে গ্রামের ছেলেদের এমনি উচ্চ গ্রামের চেঁচামেচি হয়। কারণে অকারণে। শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি। এই চেঁচামেচির পরিণতি কি এখানেও সেই রকম হয়ে উঠবে না কি? হাত-পা ছোঁড়ার বহর দেখে তাই মনে হয়। নেহাৎ এতলোকের সামনে চক্ষু-লজ্জাতেই তা হচ্ছে না বোধহয়। মাঝখানে গোঁফ নেড়ে, মিটি মিটি হেসে, শান্তি জল ছেটায় মাঝ বয়সী ভদ্রলোকটি। হাতের তৈরি খৈনি উভয় পক্ষকেই নেবার জন্য সাদর আহ্বান জানান তিনি। যেন বলেন, ওসবে কিস্‌সু দরকার নেই। সব বিবাদ দ্বন্দ্বকে জিভের আর মাড়ির নিচে পুরে রেখে পরম নিশ্চিন্তে চোখ বোজাও। তার উপদেশ মত খৈনি মুখে পুরে কেউ কেউ আরামে গোঁফ পাকায়। এরই মাঝখানে দেখা যায় এক জোড়া অতি সুচতুর দৃষ্টি উভয়পক্ষের মুখমণ্ডল লেহন করছে যেন।

এই হিন্দীভাষীদের অধিকাংশই নেমে যাবে বজবজ ঘাটে, বাকি কয়েকজন যাবে শ্যামগঞ্জে। ভাগীরথীর দক্ষিণে সর্বশেষ চটকলে।

এরা সবাই প্রায় চটকলের শ্রমিক।

মুঙ্গীর কাছাকাছি এসে গেছে ইষ্টিমার। হিন্দীভাষী লোকগুলোর মধ্যে মোটঘাট গোছাবার তৎপরতা বেড়ে যায়। হঠাৎ কর্পূরের মতো উবে যায় ঝগড়া বিবাদ। কয়েকজনের মধ্যে অবশ্য চাপা আক্রোশ ফেটে পড়তে চায়। আর হায়নার চোখের মতো এক জোড়া চোখ এদিক-ওদিকে তাকায়।

সারেঙ শিকল টানে। চিম্‌নীর পাশের পিতলের পাইপ থেকে সশব্দে বাষ্প বেরিয়ে আসে। ভোঁ বাজে। জলের ওপর ওঠে সশব্দ ঢেউ—ঢেউ আর ঢেউ। ডিঙি, পান্‌সি, খিলের 'জান' সামাল সামাল। লোক বোঝাই একটা নৌকো ঢেউয়ের দোলনায় দুলতে দুলতে জাহাজের দিকে এগিয়ে আসে। নৌকোর মাঝি ঢেউ কাটতে কাটতে জাঁদরেল গলায় নিজেই নিজের কাজের তারিফ করে কিংবা দাঁড়িদের উৎসাহ জোগায়। বারে বারে উচ্চারণ করে -'সাবাস জোয়ান-। সাবাস জোয়ান-। সাব্বাস—।'

উন্মত্তের মতো দাঁড় টানতে থাকে দাঁড়িরা! মাঝি ঘন ঘন ঝিঁকে মারে। ঘুরে ফিরে। জোরদার ভঙ্গিতে। ধীরে ধীরে নৌকো এসে যায় জাহাজের কাছাকাছি। খালাসি মাঝির দিকে তাকিয়ে দোতলা থেকে শক্ত কাছি ছুঁড়ে দেয়। একজন দাঁড়ি, মাঝির হাত থেকে দাঁড় নিয়ে নৌকোর গলুয়ের পাশের মোটা একটা কাঠে বেঁধে দেয়। পর পর তিন চারটে গেরো মারে। ব্যাস্! পাশাপাশি হয়ে যায় নৌকো আর ইষ্টিমার। সামান্য উঁচু-নিচু অগ্রাহ্য করে লোক ওঠা-নামা করে। মাঝি চিৎকার করে 'ধীরে--খুব ধীরে—'

ভোঁ বাজে। সাময়িক বিরতির পর, উর্বশীর পিছনের প্রকাণ্ড পাখনাখানা নড়াচড়া করে ওঠে। ধীরে ধীরে শুরু হয় আবর্তন। এক ইষ্টিশান থেকে কাজ সেরে, আর এক ইষ্টিশানের দিকে এগিয়ে চলে জলযান। হৈ চৈ করতে করতে অসংখ্য মানুষ ভেসে চলে।

দু-পাশে শুধু সবুজ—সবুজ আর সবুজ। মাথায় নীল আকাশ। সাদা মেঘের টুকরো ছড়ান। হলুদ রোদ্দুর মাথা শঙ্খচিলের পাখনা কেমন যেন স্থির। ডানা না নেড়েই আলতো ভাবে ভেসে চলে গাঙচিলের দল। দজ্জালপনা দেখিয়ে ছোটাছুটি করে অনেকে।

উলুবেড়িয়া ইষ্টিশান পেরিয়ে নদীর স্রোত দক্ষিণমুখী হয়ে যায়। নদীর বুকের প্রশস্ততা বেড়ে যায় অনেকখানি। গেরুয়া নদীর বুকে মোচার খোলের মতো পাল তোলা নৌকোর ঝাঁক। দিগন্ত প্রসারিত আকাশ। নিপুণ শিল্পীর হাতে আঁকা দৃশ্যপট যেন।

উলুবেড়িয়া থেকে আড় পার হয়ে কিছুদূর এলেই শ্যামগঞ্জ। এখন কেবলমাত্র পুলিস-ফাঁড়ির সঙ্গে নামটি জড়িয়ে আছে। আর কোথাও এর অস্তিত্বই নেই আজ। ভারতের বিরাট এক শিল্পপতির পদবী এই নামের ওপর শক্ত ইস্পাতের এক ঢাক্‌নি চাপিয়ে দিয়েছে জবরদস্ত ভাবে। শ্যামগঞ্জের চটকলের আকাশ ছোঁয়া চিমনী ঐ শিল্পপতির উদ্ধত্যের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। তার ওপর দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। দিন রাত।

আলমপুরের উপেন বাবুরা খাজনায় জমিটা বন্দোবস্ত দেন। সেলামীর টাকাটা ভালই দেয় কোম্পানী। খাজনার অঙ্কটাও খারাপ নয়। আশপাশের সামন্ত প্রভুরা তখন কোম্পানীদের মুখের মধুঝরা কথায় গলে যায়। অবশ্য না গলার কিছু ছিল না। বন-জঙ্গলে-ভরা নদীর ধারের ওই লোনা জমির কিই বা দাম ছিল তাদের কাছে। না হবে চাষ-বাস, না হবে অন্য কোনোভাবে ব্যবহার। তাই আলমপুরের উপেন সরকার নয়—বাওয়ালীর বাঘা জমিদার মোড়ল বাবুরাও ওই একইভাবে জমি দিয়ে দেয়। জমি দেয় শ্রীকৃষ্ণ ভঞ্জ আর ফজেল মল্লিকরা। অনেক কিছু দেবার আশ্বাস দেওয়া হয় কোম্পানীর তরফ থেকে। পরে পরে দেখা যায় অধিকাংশ কথাই মূল্যহীন। মিথ্যা। চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে জমি নেওয়া হয়, সাদামাঠা সরল মানুষগুলোর থেকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়

সবাই। কি না কি কাজ দেবে। মাথায় 'শোলার টুপি পরা' কাজ দেবে বুঝিবা। শেষ পর্যন্ত দেখা যায় কথার ফুলঝুরি ছাড়া ওগুলো আর কিছুই নয়।

চারদিকে পাঁচিল টেনে—গেটে মোটা গোঁফের দারোয়ান বসে যায় লাঠি হাতে। বাবুদের সঙ্গে এখন আর সহজ ভাবে কথাবার্তা বলা যায় না। যেমনটি হতো, মিল তৈরির সময়। জঙ্গল সাফ হবার সময়। মাঠে ময়দানে। এখন রীতিমতো অনুমতি লাগে দেখা করার জন্য। বাবুরা লঞ্চে করে কোলকাতা থেকে এসে, সোজা মিলের 'বাউণ্ডারীর' মধ্যে চলে যায়। জঙ্গল কাটার সময়কার বাবুরা পাল্টে যায়। ওসমান খাঁর জমি নেবার সময় যিনি বলেছিলেন, 'তোমার তিন জোয়ান ব্যাটাকেই কাজে নেবো।' সেই কথার কোন দাম থাকে না। ওসমান একটি ছেলেকে রাজমিস্ত্রীদের যোগাড়ের কাজে লাগাতে পারে মাত্র। অন্য ছেলেদের কাজ হয়নি। কাজের জন্যে পায়ের চামড়া ছিঁড়ে যাবার যোগাড়। হেঁটে হেঁটে।

নতুন আস্তানা তৈরির সময় এ তল্লাটে ইঁট না পেয়ে কোম্পানীর লোকেরা উপেন সরকারের কাছে লোক পাঠায়। আর্জি জানায়, উপকার করতে হবে ইঁট দিয়ে। উপকার করেন সরকার বাবু। এ বাগান সে বাগান ঢুঁড়ে বিভিন্ন পাঁজার অবশিষ্ট ইঁট দিয়ে সাহায্য করেন। আগামী দিনে হয়ত একটা সুবিধা পাওয়া যাবে। তাছাড়া মোটা খাজনার প্রজা। সেলামীও ভাল দিয়েছে। ব্যবহারটা ভাল করাই দরকার।

এমনি করে ছোট্ট অবস্থা থেকে দানা বেঁধে বেঁধে, চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘিরে পেল্লাই এক চটকল গড়ে ওঠে। জঙ্গলের একাধিপত্যের মেরু থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে চলে যায় শ্যামগঞ্জ।

অসংখ্য বোট আর মাল বোঝাই নৌকো বাঁধা থাকে শ্যামগঞ্জের ঘাটে। ইঁট-কাঠ-পাথরে ভর্তি। লঞ্চে ছুটে আসে সাহেব বাবুরা। ছুটে যায়। গাধায়-ঘোড়ায় মাল বয়ে নিয়ে যায়। হ্যাট্‌—হ্যাট্‌—

শব্দে পথ ঘাট মুখর। রাত-দিন রাজমিস্ত্রীরা কাজ করে। 'ডে-লাইট' জ্বালিয়ে রাতকে দিনের মত অবস্থায় এনে কাজ চলে। দূর থেকে লোকজন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। জমিদার বাবুদের কাজ তারা দেখেছে। কিন্তু এমনটি কোনোদিন দেখেনি।

মিলের চিম্‌নী তৈরি হয়। আকাশ ছোঁয়া।

পাঁজা পাঁজা ইঁট খেয়ে ফ্যালে দৈত্যকায় চিমনীটা। মাঝে-মাঝে খবর আসে 'পড়ে গিয়ে লোক খুন।' কিন্তু কোন সাড়া শব্দ থাকে না। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিল্পনগর গড়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে চারদিক। রিক্রিয়েশন ক্লাব, বিলিয়ার্ডস রুম, আমোদ স্ফূর্তির ঘর, ক্লাব, সজান গোছান বাড়িগুলির সামনে সবুজ লন আর ফুলে ভরা বাগান ছবির মতো দেখায়। এত তাড়াতাড়ি যে এত পরিবর্তন হবে তা কেউ ভাবতেও পারে না।

একদিন এই জায়গাগুলোতে ছিল শিয়াল ডাকা জঙ্গল, সাপ আর উদ্‌বেড়ালদের লীলাক্ষেত্র। তা আজ আর কেউ বিশ্বাস করবে না। কোটালের জোয়ারের সময় নদীর জল অবাধে উঠে আসতো এই এলাকায়—সেকথা আজ আর কেউ ভাবতে পারবে কি? ভাবতে পারবে কি, ফণা তুলে একদিন কেউটে, গোখ্‌রোর দল এখানে অবাধে রাজত্ব চালাত? অবশ্য কেউটে গোখ্‌রোর ফণা আজো সমানে ছোবল মেরে যাচ্ছে।

আলোক মালায় সজ্জিত এই উৎসবপুরীর মাত্র কয়েক শ গজ দূরে তিন ফটকের খালের ধারে কুঁপি, হ্যারিকেন আর গ্যাসবাতি জ্বালা ছোট্ট একটা বাজার। সরকারের বাজার। উপেনবাবু বড় সখ করে তৈরি করেছিলেন এই বাজার। আজ শিল্প ও শিল্পাঞ্চলের কল্যাণে এর মূল্য বেড়েছে।

এখানকার শ্রমিকদের বস্তি মৌমাছির চাক যেন। ছোট ছোট

ঘরে গাদাগাদি করে মানুষ থাকে। এছাড়া শিল্প নগরীর আশপাশে ব্যাঙের ছাতার মত যা অনিবার্য ভাবে গজিয়ে ওঠার কথা তারো কমি নেই। পতিতাদের সারি সারি ঘর। জুয়ার আড্ডা। সরকারী আর বেসরকারী মদ, গাঁজার দোকান।

শ্যামগঞ্জের মত আলোর বন্যা নেই এখানে। সামনে দু'একটা আলো থাকলেও—ভেতরে জমাট বাঁধা অন্ধকার। এক প্রহর রাতের আগেই অন্ধকার শকুনের প্রকাণ্ড পাখনার ঝাপটায় আলোর ছোট-খাট উৎসগুলি স্তব্ধ হয়ে যায়। শয়তানের হাসি ছড়িয়ে পড়ে, জমাট বাঁধা গাঢ় অন্ধকারে। হুহু শব্দে ভৌতিক বাতাস বইতে শুরু করে। মাঝে মাঝে সব কিছুকে সচকিত করে আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। ভেসে আসে জমাটবাঁধা দীর্ঘশ্বাস যেন।

দিনেও সূর্যের আলো এসে পৌছতে পারে না এই রাজ্যে। পাঁক-বজবজে, ভ্যাপ্সা গন্ধে ভরা এই এলাকায় অসংখ্য শ্রমিক বাসা বেঁধেছে। অন্ধকারে সরু গলিতে পথ চলা ভার। এখানে ওখানে এঁদো ডোবা। ভট্‌কা, পানা, শেওলা আর আবর্জনা বোঝাই জলের বর্ণ দেখলে কিংবা এর গন্ধ নাকে এলে অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্যন্ত পাকস্থলী থেকে সজোরে বেরিয়ে আসবে।

গরু, মোষ, গাধা, ঘোড়া আর শুয়োরের অসংখ্য খাটাল তৈরি হয়েছে এখানে। কয়েকটা ডোবার জল বারোয়ারী মহোৎসবের প্রসাদ যেন। অধিকারের দাবি নিয়ে, সবাই এতে ইচ্ছামত হুড়মুড় করে নেমে পড়ে। ভালভাবে বাতাস লাগে না, আলো আসে না, এমন জলাশয়গুলির দশা কেমন হতে পারে তা সহজে অনুমান করে নেওয়া কঠিন নয়। পরিশ্রমে নুয়ে পড়া, ক্লান্ত, কঙ্কালসার মানুষগুলো টলতে টলতে এখানে এসে পৌছয়। সমস্ত ক্লান্তি দূর করে, নোংরাধোয়া এই দূষিত জলে।

এখানের অধিবাসীরা ধর্ম, গোত্র, জাত, সমাজ, সংস্কার ইত্যাদি কথাগুলোর সামনে দাঁত খিঁচিয়ে ব্যঙ্গ করছে সব সময়।

এই বস্তি-জীবনের পাশেই, মৎস্যজীবীদের জীবনধারা ঝির্ ঝির করে বয়ে যায়—না আছে রূপ না আছে কোন জৌলুষ এমন অবস্থায়। কয়েকজন মহাজন রীতিমত শাঁসালো হয়ে ওঠে দিন দিন। তারা চড়া সুদে টাকা ধার দেয়, নৌকো এনে দেয় 'বলাগড়' থেকে। বর্ষায় পেটাই রূপো ইলিশ মাছ যখন 'ছান জালে' দলে দলে ধরা দেয়, তখন চোখ ভরে মৎস্যজীবীদের। পেট ভরে না। কিংবা ওদের সাহায্য নিয়ে, বড় নৌকোয় যারা যায় সাগর দ্বীপ ছেড়ে দু'তিনটে ভাঁটা নিচে শেলেমাছ বা শুটকিমাছ শিকার করতে। মাছ এনে ফেলে দিতে হয় তাদের, মহাজনের নির্ধারিত 'এজেন্টের' কাছে। ওয়াগন ভর্তি হয়ে শুটকিমাছ চলে যায়। রৌপ্য মুদ্রার ঝনঝনানির শব্দ প্রাণ ভরে শুনে যায় মহাজন। দীর্ঘ খরার পর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি যেন নতুন জীবনের স্বাদ আনে মহাজনদের জীবনে। মৎস্যজীবীরা তা শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে দেখে। তাদের জীবনে লাগাতার খরা। এই খরার মধ্যেই চলে জন্ম-মৃত্যুর লীলা। কান্নাহাসির পালা বদলের অধ্যায়। একরাশ ঠাকুর দেবতার পায়ে, পালা করে এরা জল-তুলসী, ফুল-বাতাসা চাপায়। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে নেচে কুঁদে এরা পুজো আচ্চা করে। জীবনে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য। তবু শান্তির মুখ দেখতে পায় না কেউ। কোন্ অদৃশ্য শক্তি যে এদের জীবনী শক্তি হরণ করে রেখেছে তা এরা জানে না। শুধু মাঝে মাঝে কপাল ঠুকে বুক চাপড়ে চিৎকার করে বলে, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ না থাকলে এমন হয়?

কথাগুলো লুফে নেয় নিশিকান্ত সাধু। গেরুয়া পরা। নদীর চরে ত্রিশূল পুঁতে আস্তানা বানিয়েছে। ছাই মেখে প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে বসে থাকে। বিরাট শরীর আর গোল গোল করমচা চোখ নিয়ে বলে, 'হ্যাঁ—হ্যাঁ ঠিক বলিচিস। পরের দেখে শুধু চোখ ধাঁধালে হবে কি? নিজের পাপ কাটা। জন্ম-জন্মান্তরের পাপ কাটা। প্রায়শ্চিত্ত কর। নাহলে শান্তিসুখ কোথা পাবি বল?'

আষ্টে-পিষ্টে এই 'পাপ-চিন্তার' জালে জড়ান মানুষগুলো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পিট্ পিট্ করে তাকায়। পথ খোঁজার চেষ্টা করে। কোথায় মুক্তির পথ? সুদ আসল মেটাতে মেটাতে যখন হাতে কিছু থাকে না—কয়েক পাত্র ধেনো বা তাড়ি গিলে গিয়ে বৌকে হরদম পেটায়। যেন সব দোষটা তার।

॥ ২ ॥

রায়নগর গ্রামখানা খুব বড়। কাজের সুবিধার জন্য একে কয়েকটি খণ্ডে চিহ্নিত করা হয়েছে। পূর্বমুখী বিরাট জোয়ার-ভাঁটা খেলা খালের ধারের অংশটির নাম চড়ারায়নগর। খালে চড়া পড়ে পড়ে এই অংশের জন্ম বলেই বোধহয় এই ধরনের নামকরণ।

গ্রামখানার নাম রায়নগর হলেও কাগজপত্রে দক্ষিণ রায়নগর মৌজা হিসাবেই এর পরিচিতি। এর পিছনে ইতিহাস আছে। সুন্দরবনের একটি অংশ এটি। এখানে মেদিনীপুর, হুগলী জেলা থেকে চাষীরা এসে বসবাস শুরু করে। জঙ্গল কেটে, চাষের জমি বার করে। বীরভূম বাঁকুড়া থেকে রাজবংশী, তিওর, জালিয়া-কৈবর্ত ইত্যাদি মৎস্যজীবীরাও এসে নদীর ধারে কুঁড়ে বাঁধে। চাষবাস শুরু হয়। শুরু হয় মাছ ধরা। কিন্তু নির্বিঘ্নে কাজ করা যায় না। মাঝে মাঝে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। কর্মরত পৌণ্ড্র কৃষকের ঘাড়ে কিংবা রাজবংশী ধীবর পল্লীর মাঝে। এ জিনিষ তো সহ্য করা যায় না। পথ খুঁজতেই হবে। শালের কচা, বাবলার খেঁটে ইত্যাদির সদ্‌ব্যবহারের সঙ্গে শুরু হয় দক্ষিণরায়ের পূজো। সন্তুষ্ট করতেই হবে বাঘের দেবতাকে। না হলে তো নিরাপদে কাটান যায় না। সাপের ভয়ে মনসা পূজো অবশ্য আগে থাকতেই চলে আসছে। এবার নতুন করে এই পূজোও ঘটা করে শুরু হয়। আর এই দক্ষিণরায় ঠাকুরের নাম অনুসারে এই চক্‌টির নাম হয়ে যায় দক্ষিণরায়নগর। একেবারে জেলা জরিপের খাতায়। পরচায়। উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত নদীর

আশপাশে জালের মত নালা আর খাল ছড়িয়ে। জোয়ার ভাঁটায় গাঁয়ের মানুষ গাছ-গাছালির মধ্য থেকে প্রত্যক্ষ করে জলের ওঠা-নামা। নৌকোয় ডোঙায় মালপত্রের যাতায়াত হয় অনায়াসে। অবশ্য জোয়ার ভাঁটার হিসাব নিকাশ করেই। জঙ্গলের মধ্যে, খালের ধারে ভেসে যাওয়া নারকেল আটকে গিয়ে গাছ হয়ে যায়। নজরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দখল প্রতিষ্ঠা করে মানুষ। ফলের গাছ ছাড়া অন্য কোন গাছের খুব বেশি একটা কদর ছিল না তখন। জ্বালানীর প্রয়োজনে মানুষ গাছের ডাল ভেঙে আনে, পুরো গাছটার উপর রাক্ষুসে ক্ষুধার যুগ তখনো আসে না।

মুঘল যুগ থেকে এই জায়গাটা ছিল ঘড়, মাগুরা, বালিয়া ইত্যাদি পরগনার অন্তর্গত। নামেই জমিটার পত্তন দেওয়া হয়েছিল। নামেই জমিদারীর আওতায় ছিল। খাজনা বা করের কোন প্রশ্নই ছিল না। মাথা নেই, তার মাথা ব্যথা। লোকজন নেই তার আবার খাজনা?

ধীরে ধীরে মানুষ ঘর বেঁধেছে ভাগীরথীর তীরে। জমি পাবার লোভে। মাছ ধরার সুবিধায়। জমিদার বাবুদের কাঁচারিতে খবর গেছে। ডাকাডাকি হয়েছে। নতুন করে পত্তন ব্যবস্থা হয়েছে। জনপদ গড়ে উঠেছে, জঙ্গলের আদিম জীবের সঙ্গে পাঞ্জার লড়াই করে। বাঘের-সাপের ভয় ভীতিকে উপেক্ষা করে।

মুখ্যত মাটি আর জলের ওপর নির্ভর করেই চলে জীবন। যাতায়াত। যোগাযোগ রক্ষা। সব কিছুই। ডোঙার জন্য হাঁ করে বসে থাকে মানুষ। ফসল কেটে। ক্ষেতের পাশে। জোয়ার আসুক—ডোঙা আসুক—তবে তো গিয়ে পৌছবে আপন আস্তানায়। মানুষের বাহন ডোঙা। এই ডোঙাকে কেন্দ্র করে একদল মানুষের জীবিকা গড়ে ওঠে। মানুষগুলো যে চত্বরে বসবাস করতো সে জায়গার নামকরণ হয় ডোঙাড়ে বা ডোঙ্গাড়িয়া। নাম করণের পরেই দুই গোঁফে আন্দোলন সৃষ্টি করে, ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে গোমস্তা বাবু বলে ওঠেন, কি তোফা নাম। ভাল নাম হয়নি

হরকিষণ ? সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হরকিষণ সিং সারা মুখে হাসির জোয়ার এনে এর সপক্ষে সারা শরীর আন্দোলিত করে। গলা ঝেড়ে বলে, বহুৎ বড়িয়া নাম হোয়েসে হুজুর—

জেলা জরিপের সময় ম্যাপে লেখা হয়ে যায় মৌজার নাম :— ডোঙ্গাড়িয়া।

গ্রামের মানুষ পথে পথে বার হয় জীবিকার সন্ধানে।

রুক্ষ বাদামী চুলের বোঝা মাথায়। কঙ্কালসার দেহ। বাঁকের ছ'পাশে খালুই আর গোটান জাল। খাল, বিল, আর পুকুরে খেপ্‌লা জাল ফেলে। ফাঁদি দেয়। নদীতে নামে সিট্‌কী জাল নিয়ে।

মেয়েরা কোমরে 'জলের কষে' গেরুয়া রঙের কাপড় জড়িয়ে, পেছনে হাঁড়ি ভাসিয়ে মাছ ধরে।

কয়েকটা মরশুম অবশ্য আসে এদের জীবনে। তবে এ ক্ষেত্রেও কথা আছে। মেয়েরা গাবতলায় বেশ সুর করেই বলে, জেলের ভাগ্যে ছেঁড়া টেনা, পাঁজারির কানে সোনা।

সোনার হকদার, পাঁজারি, ফোড়ে আর মহাজনরা। এদের টাকায় তৈরি হয় বড় নৌকো, জাল আর নৌকোর সাজ-সরঞ্জাম। নদীতে কিংবা 'বার-দরিয়ায়' চলে মৎস্য শিকার। ইলিশ, শেলে, শুঁটকির আড়তে আড়তে চলে কারবার। মহাজন মালিকরা এই সব কারবারে আড়তে বসার মালিক। সাড়ে পনের আনার হিস্যাদার। গরীব গতর খাটিয়েরা ছোট ছোট ভাগ পায়। যা তাদের পরিশ্রমের তুলনায় খুবই সামান্য।

মৎস্যজীবী পাড়ার অনেক মেয়েই তাই পান চিবুতে চিবুতে যায় শ্যামগঞ্জের চটকলের কেরানীবাবুদের কোয়ার্টারে কোয়ার্টারে। সকাল-বিকেল কাজ করে দেয়। অনেকের পেটের ভাত যোগাড় হয় এমনি ভাবে।

বুড়ো হাব্‌ড়ারা যায় ঝুড়ি কাঁকালে কয়লা কুড়োতে। বয়লার থেকে ফেলে দেওয়া ছাই থেকে কয়লা কুড়িয়ে জীবনযাপন করার চেষ্টা

চালায় অনেকে। এখানেও যাদের ছাড়পত্র মেলে না তারা যায় নদীর 'পাতায় পাতায়' টুক্‌রো কাঠ, কাল হাল্কা মাটি বা গাছের ডাল-পালা কুড়িয়ে আনতে। বাঁচার জন্যে কি প্রাণপণ প্রচেষ্টা। পেটের জ্বালা নিয়ে চুপ চাপ বসে থাকা যায় না তো।

রাতের অন্ধকারে এ গ্রামের চেহারা যায় পাল্টে। এবাড়ি ওবাড়িতে লোকজন হৈ হৈ করে। চোলাই মদের দোকান খুলে যায়। নদীর চর থেকে জোয়ান জোয়ান ছেলেরা মদের পিপে মাথায় করে বয়ে আনে। জুয়ার আড্ডায় কুপি জ্বলে। দীর্ঘদিন থেকে এই রীতি চলে আসছে। অভাবের দম্‌কা হাওয়া আর মহাজনদের ফাঁদ ক্রমাগত এদের পা পিছ্‌লে দিচ্ছে। অন্ধকার কুয়ো থেকে উঠে আসার কোন পথই আজ মনে হয় খোলা নেই।

শিল্প নগরীর পাশের এই গ্রামটিতে রাত্রির অন্ধকারে সারি দিয়ে আসবে মানুষ। অনেক রাত পর্যন্ত চলবে তাদের হৈ-হল্লা গালি-গালাজ মাতলামি। আইনশৃঙ্খলা সামাজিক ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা যারা বলেন তাদের নাকের ডগায় ঘুষি লাগিয়ে দেয় এখানকার মানুষজন।

॥ ৩ ॥

পূবদিকের লাগোয়া সমস্ত গ্রামের রাস্তা এসে মিশেছে ভাগীরথী তীরের শ্মশানে। চুল্লীর উত্তরদিকে বটের ছায়ায় সাধুজীর আস্তানা। পেল্লাই লম্বা চওড়া চেহারা সাধুজীর। সারা শরীরে ছাইভস্ম মাখা। গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা। মুখ বোঝাই দাড়িগোঁফ। আমড়া আঁটির মত রক্তবর্ণ দু'টি চোখ। কপালে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা। নাকটা অস্বাভাবিক রকমের মোটা আর থ্যাবড়া। এই এলাকার 'ডাক সাইটে' নিশিকান্ত সাধু।

শ্মশানের পাশে মহাবীরের আস্তানা। সারাদিন কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকে মহাবীর। অবসর সময়ে নদীর স্রোতের দিকে মুখ করে

চুপচাপ বসে থাকে।—একটা খেজুর গাছে হেলান দিয়ে। দুটো হাঁটু দু'হাতে সাপ্টে ধরে। মন্ত্রমুগ্ধ যেন।

সদম্ভে চলে যায় উর্বশী। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তীরে আছড়ে পড়ে। দুধের মত সাদা ফেনা আকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হয়। তুবড়ীর ফুল্‌কির মত ওঠা জলের সাথে সাথে।

ইষ্টিমারের মধ্যে গিস্‌গিস্‌ করে যাত্রী। ওদের চেঁচামেচি তীর থেকেও স্পষ্ট শোনা যায়। অনেক দূরে যাবে ওরা। ফলতা, গেঁওখালি হয়ে রূপনারায়ণের স্রোতে গিয়ে পড়বে। নাম ঘাটাল ইষ্টিমার হলেও—অতদূর যাবে না। মাঝখানে আট্‌কে যাবে।

ভাগীরথীর দক্ষিণ দিকের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায় জাহাজখানা।

মহাবীর একবার পিছনের দিকে তাকায়। শ্যামগঞ্জের মিলের বিরাট চিমনী দিয়ে, আকাশের দিকে ওঠে কাল ধোঁয়ার রাশি। ওদিকে তাকালেই মনটা অনেক—অনেক দূরে চলে যায়। বেশ মনে পড়ে, বাবা আর মায়ের সঙ্গে ইষ্টিমারে করে বজবজে আসার কথা। তখন তার বয়েস ন'দশ বছরের মত। তার বাবা আর মা বজবজ চটকলে সাফাইয়ের কাজ করতো। একদিন তাদের বস্তি থেকে মিনিটে মিনিটে মানুষ মরতে লাগল। দেখতে দেখতে কদ্‌বেল তলার বস্তি প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। তার বাবা আর মা একই দিনে চলে যায়। তার চোখের সামনে। কী বীভৎস সে মৃত্যু! কয়েকজন ভদ্রলোক এসে তাকে গাড়িতে উঠিয়ে নেয়। হাসপাতালে জ্ঞান ফিরলে দেখে, আরো বেশ কয়েকজন তার আশে পাশে শুয়ে আছে। বেশ কয়েকদিন শুয়ে থাক্‌তে হয় এখানে। তারপর ছুটি। ছুটি মানে ফাঁকা মাঠের মাঝখানে ছাড়া পাওয়া যেন। কেউ কোথাও নেই। বাসাবাড়ির কপাটখানা হাঁ হাঁ—অর্গল মুক্ত। ভয়ঙ্কর সেই শূন্যতার সামনে দাঁড়াতে পারে না মহাবীর।

জীবনটা কেমন যেন বৃন্তচ্যুত, বাঁধনহারা বলে মনে হয়। এই বস্তি থেকে মা-বাবা আরো অনেকে চলে গেছে। সারা এলাকাটা

যেন খাঁ খাঁ করছে। মন টেকে না এখানে। এক মুহূর্ত দাঁড়াতে ইচ্ছা হয় না। মহাবীর চলে যায় নদীর তীরে। বসে থাকে দিনের পর দিন। দু'চোখ বেয়ে কখন জল গড়িয়ে পড়ে। হদিশ করতে পারে না।

'ছুড়োগাদি' একমাথা পাকা চুল, মুখে মিষ্টি হাসি বিস্তিয়া নানি একদিন তাকে আবিষ্কার করে নদীর এই নির্জন প্রান্তরে। বলে, মহাবীর—বেটা আমার, ভগবান তোর জীবনটা দান করে দিয়েছে বেটা? হামাকেও তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন বেটা। কিন্তু বেঁচে হামার কি লাভ আছে বেটা? সব নিয়ে নিয়েছেন ভগবান—আর কেউ নেই – তোরো কেউ নেই বেটা—

মহাবীরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বিস্তিয়া নানি। কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারে না। অনেক পরে দেখা যায় দু'জনেরই বুক ভিজে গেছে।

মরুভূমির মাঝখানে ছোট্ট একটা ফুল যেন বিস্তিয়া নানি। বার্ধক্য-জীর্ণ দারিদ্র্যের মাঝখানে প্রাণের এক ফল্গুধারা আবিষ্কার করে মহাবীর। জীবনের চরমতম দুর্দিনে যেন অমৃত আস্বাদন।

ছিন্নপাল ক্ষতবিক্ষত দিশেহারা নৌকোখানা যেন দিগন্তরেখায় দ্বীপের চিহ্ন খুঁজে পায়। আলগা হাতের মুঠো শক্ত হয়ে আসে। আসে জীবনের ওপর প্রত্যয়!

আকাশে একটার পর একটা তারা ফুটে ওঠে। জোর বাতাসে পালতোলা নৌকো আড় হয়ে আসতে আসতে আবার সোজা হয়ে যায়। মহাবীরের সামনে ভেসে ওঠে বাবা-মায়ের মুখ। মৃত্যু-কালীন যন্ত্রণার দৃশ্য। মুখগুলো কেমন বীভৎস হয়ে গিয়েছিল। চেনা যাচ্ছিল না কাউকে। অবস্থা দেখে শিউরে উঠেছিল সেদিন। মুষ্টিবদ্ধ করেছিল হাত। কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে, তা সে জানে না।

এরপর এসেছে ঋতুর পর ঋতু। সময়ের পাল-তোলা নৌকো-খানা একনাগাড়ে, অবিরাম ছুটে চলেছে সবার অলক্ষ্যে।

জীবনের আবর্তে পাক খেতে খেতে মহাবীর এসে গেছে শ্মশানের এই আজব আস্তানায়।

আজ আকাশের দিকে তাকালে সব চেয়ে স্পষ্ট তারাটাকে বিস্তিয়া নানি বলে মনে হয়। বিস্তিয়া নানি তাকে এই জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে গেছে। চুরি নয়, ডাকাতি নয়, ভিক্ষা নয়, ফরাসের ছেলে শ্মশানের কাজে লেগে যা। কোন কাজকে ছোটো ভাবিস নি বেটা। তার স্পষ্ট কথা আজো তার কানে বাজে।

রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ পাখনায় এক এক করে আবলুস পাখিরা নামে তার চিন্তার রাজ্যে। সারা রাত তারা ডানার ঝাপট মারে। এই তো জীবন? মৃত্যু রাক্ষসী যে কোন মুহূর্তে তার বীভৎস নখ দাঁত বার করে ছুটে আসবে। নির্দয়ভাবে একের পর এক প্রাণ প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যাবে। যন্ত্রণা আর করুণ আর্তনাদে বাতাস ছেয়ে যাবে। তবে এ জীবনের কি দাম?

এর পাশাপাশি আর একটা ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। চড়ারায়নগর দিয়ে ফিরছে মহাবীর। রাত বেশ গভীর। সন্ধ্যা থেকে মাতাল বাতাস আর বৃষ্টি মাতিয়ে রেখেছিল চারদিক। পথে বার হতে সাহস করেনি কেউ। সবাই ঠাঁই নিয়েছিল একটু নিরাপদ আশ্রয়ে। ঝড় অপেক্ষাকৃত কমেছে। অধৈর্য্য মানুষ আপন আপন জায়গায় যাবার উদ্যোগ নিচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল, এক মা হাতে একটা লম্ফ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাস সহস্র মুখে ঘন ঘন ফুৎকারে চেষ্টা করে আলোটা নিভিয়ে দিতে। মা তার সমস্ত শরীরটা বাঁকিয়ে হাতের তালুর আড়াল দিয়ে সতর্ক পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশের ঘরে। তার ছেলেটা যেখানে চেঁচাচ্ছে, মাগো, আয় গো— মরে গেনু গো—

এই মূর্তি তার আস্থা ফিরিয়ে এনেছে জীবনের উপর। ভালবাসার প্রদীপটিকে এমনি ভাবে সযত্নে বাঁচিয়ে নিয়ে চলতে হয়। প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে এই ছবিটি তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়।

ওই মায়ের মুখখানা হঠাৎ বিস্তিয়া নানির মুখে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

দু'হাত তুলে প্রণাম জানায় মহাবীর।

শ্মশানে এক বিচিত্র জীবন মহাবীরের।

একটার পর একটা চিন্তা এসে তাকে গ্রাস করে যেন। কিছুক্ষণ আচ্ছন্নের মত থাকার পর রাহুমুক্তি ঘটে। মা বাবা কবে চলে গেছে জীবন থেকে। তাদের ছবি ঝাপসা হয়ে গেছে। কিন্তু বিস্তিয়া নানি আজও তার কাছে দেবতার সমান।

চড়ারায়নগরের শ্মশানে পোড়ান হয়েছিল বিস্তিয়া নানিকে। প্রায় শ'খানেক মানুষ চোখের জল ফেলে শ্মশানে এসেছিল। যত অনাথ আর হতভাগা, সবার মা ছিল বিস্তিয়া। সেদিন, মৃত্যু যে কত মহান হতে পারে তা প্রত্যক্ষ করেছিল মহাবীর। সেই থেকে মৃত্যুর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকে সে। কত অভিজ্ঞতা—কত ভাবনা—কত চিন্তা তার মনের ওপর ছায়া ফেলে যায়।

চিতার দাউ দাউ জ্বলা তেজ এক সময় কমে আসতে থাকে। আগুনের লক্‌লকে জিহ্বা চেটে পুছে সাফ করে দেয়—পঞ্চভূতের দেহটাকে। একটু আগে পর্যন্ত যে অস্তিত্ব ছিল—তা আর থাকে না। মহাবীর মাঝে মাঝে সবার মুখের দিকে তাকায়। যার মুখটা ভাল লাগে তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ায়। বলে, বিড়ি দিন এক্‌টা।

বিড়ি?

হ্যাঁ।

শুধু বিড়ি কেন? আজ যা চাইবে তাই দিতে পারি বাবা। হরির লুট হচ্ছে যে।···কাল চাইলে বাবা ফক্কা। এই নাও। দেশলাই আছে? আচ্ছা বাবা লাগাও টান। ব্যোম শঙ্কর।

শ্মশানযাত্রীরা শেষ পর্যন্ত চিতার ওপর কলসী কলসী জল ঢালে। ফুঁপিয়ে কান্নার মত চিতা থেকে ফিকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠতে থাকে। সারা নদীর তীরে

এক খাঁ খাঁ শূন্যতা। মাঝে মাঝে নদীর বুক থেকে ভেসে আসে ঠাণ্ডা বাতাসের হল্কা। পাশের ঝোপের বনফুলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। মন কেমন যেন উদাস হয়ে যায়।

কাজ শেষ।

শ্মশানযাত্রীদের বাড়ি ফেরার পালা। চোখে মুখে মনে এক করুণ শূন্যতা নিয়ে দাঁড়ায় সবাই। মহাবীর সময় বোঝে। এই সময়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। গলার স্বর যথা সম্ভব নিচু করে বলে, বাবু—গঙ্গাপুত্তুরকে কিসু দিন বাবু –

যা পায় কপালে ঠেকিয়ে ফতুয়ার পকেটে রাখে। এক নির্মল প্রসন্নতায় তার সারা মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রাত্রি শেষের পাতলা অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা পৃথিবী। মহাবীর একমনে আপন কাজ করে যায়। দু'হাতে নরম পলিমাটি সরিয়ে গর্ত খোঁড়ে। কিছু মাটি ওঠানোর পর পচা দুর্গন্ধ গলিত মাংস আর মাথার চুল ভস্ ভস্ করে উঠে আসে। মুঠো মুঠো। ক্রমাগত। মহাবীরের মনে খুশির খোশবু ছড়ায় ছোট্ট এই সার্থকতা-টুকু। জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্তগুলি ধীরে ধীরে তাকে এই পথে নামিয়ে আনে। আজ সে নির্বিকার চিত্ত। আগে সে ভাবতেই পারতো না, এমন সহজ সরল ভাবে এই কাজ করে যেতে পারবে।

বিস্তিয়া নানি চলে যাবার পর উদাস বাউলের মত ঘুরে বেড়ায় মহাবীর। নদীর এপারে ওপারে জানা শোনা কয়েক জনের বাড়ি যায়। সহানুভূতি জানায় তারা। নানা জনে নানা উপদেশ দেয়। এরা সবাই অন্য রাজ্যের মানুষ। বিস্তিয়ার প্রগাঢ় ভালবাসার তুলনায় এদের কথাবার্তা নেহাৎ কথার কথা। পানসে। জোলো। তাহলে আর পৃথিবীতে থেকে লাভ কি? বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পায় না মহাবীর।

মনে পড়ে মহাবীর দেরি করে ফিরলে বিস্তিয়া ভীষণ রেগে যেত। খাবারের ঢাকা খুলতে খুলতে গজ্ গজ্ করতো। বলতো, বুঝবি

একদিন—, বুড়ী চোখ বুজোক—, তারপর—

সেই ঠাসা ভালবাসা, গাঢ় প্রাণ কোথা ?

এই সময় মাধাই এসে হাজির হয় শ্মশানে। এসেই বলে, কই মাল কই আমার—, দাম বাড়াতে চাও ? বললেই হয়। হঠাৎ বন্ধ করে কি লাভ হলো ?

কোন কথার জবাব দেয় না মহাবীর। শুধু চুপচাপ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে মাধাই বলে, কি হয়েছে তোর ?

নানি নেই।

ওঃ! তাই এই দশা! নানি চিরকাল বাঁচবে আর আদর করে তোর মুখে রুটির টুকরো তুলে দেবে ? তাও কি হয় রে ভাই। তিনি যে ভালবাসা তোকে দিয়ে গেছেন তার দাম দে তুই। লড়াই করে দেখিয়ে দে, মরদ আছিস। 'মওগা' হোস তো বসে বসে কাঁদ। নানি তোকে বাঁচার কায়দা শিখিয়েছিল তো ?

জরুর।

তবে বাঁচ।

মাধাই শুধু কথায় চাঙ্গা করে দেয় না। অগ্রিম টাকা দিয়ে বলে, মাল আমি নোবো। কি কি মাল লাগবে তা আমি বলে দুবো। সব জিনিসের আলাদা আলাদা দাম পাবি।

কথার ফাঁকে ফাঁকে দু' একবার গাঁজার কোল্‌কে এসে যায় তার কাছে। আসে তরল পানীয়। সঙ্গে কিছু খাবার।

শেষে ধীর গলায় মাধাই বলে, আমি কারবারী লোক আছি ভাই। আজ যা দিলুম এর কোন হিসাব নেই। কাল থিকে চলবে হিসাব। আমি লিবো—কাঠ কয়লা, জামা-কাপড়, তোষক-গদি, খাট-পালং, আর যে 'চিজের' কথা আজ বলিছি—মনে রাখিস এর জন্যে পাবি মোটা দাম। দেখবি, পেটের জন্যে আর ভাবতে হবেনে। আমি আছি—অসুবিধে হলে জরুর দেখবো।

পরের দিন কপালে মোটা সিঁদুরের কোঁটা পরে মহাবীর কাজে লেগে যায়। নিশিকান্ত সাধু চোখ পাকিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ কায়দায় হেসে জোর গলায় বলে, 'জীতা রহো বেটা'।

আজ প্রাতঃস্নান সেরে মহাবীরের অবস্থিতি অনুমান করতে পারে না নিশিকান্ত সাধু। বেজায় কুয়াশা। একহাত দূরের জিনিসকেও ঠাওর করতে পারা যায় না। কাছাকাছি এসে সাধু 'রাম রাম'—করে ওঠে। পরবর্তী মুহূর্তে চেঁচিয়ে ওঠে হারামজাদা পিচেশ কোথাকার। এই সাত সকালে নরককুণ্ডু ঘাঁট্‌চিস দু'হাতে। উঃ! জান যায়রে বাবা। চাপা দে, চাপা দে হারামজাদা। আজ সারাদিনটাই মাটি করে দিলি তুই।

মহাবীর সহাস্যে বলে, কি করবো গো সাধুবাবা। এহি হোলগে হামার কাজ কাম। রুজি রোজগার। ই না কল্লে কেমনে জান বাঁচবে পরভু—।

এর কোন জবাব দেয়না সাধু। দ্রুত গতিতে ছপাস্ ছপাস্ শব্দ করতে করতে এগিয়ে যায়। বাঁধের দিকে। দূর থেকে তার কাঁসর কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায়, এত লোক মরে, তোর মরণ কবে হবে? সাত সকালে নরক দর্শন। কি বিট্‌কেল গন্ধ রে বাবা। নরক যন্ত্রণা ভোগ। ওয়াক থু—ওয়াক—

মহাবীর হাসে।

নিশিকান্ত সাধুর গলা ভেসে আসছে সমানে। জানোয়ার—। পশু—। মরণ—। নরক—। নরক যন্ত্রণা—? হেসে লুটোপুটি খায় মহাবীর। কোন কথাই তার গায়ে লাগে না। কোমল পলিমাটি ভরা নদীর চরে এ এক জীবন।

দিবসের সুদীর্ঘ পরিক্রমা শেষ করে ক্লান্ত সূর্য পশ্চিমের রক্তাক্ত চিতায় আপনাকে এলিয়ে দেয়। মহাবীর এসে দাঁড়ায়

চরের ধারে। চোখে বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণী দৃষ্টি। চরে পোঁতা কোদালের বাঁটগুলো খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে দেখে। তার সাম্রাজ্যে ফসলের অভাব নেই। শুধু রাত্রির অন্ধকার আসার অপেক্ষা। কালো পর্দার আড়ালে ছাড়া একাজ হওয়া আদৌ সম্ভব নয়।

রাতের অন্ধকারে চলে রুজির লড়াই। অনেকেই জানে না এ জীবনকে। পোঁতা মড়ার মাংস যখন প্রায় মাটির সঙ্গে একাকার হয়ে যায়, বহু কষ্টে তখন মাটির আলিঙ্গন থেকে মহাবীর সমস্ত অস্থিগুলিকে খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে তুলে আনে। মাধাইয়ের কাছে পাঠাতে হবে এগুলো। কোলকাতা শহরে এর প্রচুর খরিদ্দার। অন্যান্য শহরেও চালান যায় এই নরকঙ্কাল।

এ ব্যাপারে মহাবীরের গর্বের শেষ নেই। সে বলে, এই চীজ লিয়ে কাজ কম্ম করে, কত্তো ডাগদারবাবু—বড়া আদমী হবে। মানুষের ভুখার সারাবে। এ ছোট চীজ আছে না বাবু। ই কাম ভি ছোটা নয়। বহুত আচ্ছা কাম। মাধাইয়ের কণ্ঠ তার মনে পড়ে,—কৌয়ার বাসায় কোকিল—এই সব গন্ধা কাজে বন্‌বে বড়া বড়া ডাগদার—।

এসব কাজ করার আগে খানিকটা চন্‌চনে পানি গলায় ঢালতে হয়। চওড়া বুকের মধ্যে ওঠে আগুনের লকলকে শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলে। আর কোন বিকার থাকে না। কোন দুর্গন্ধ নাকে আসে না। কাজের মধ্যে ডুবে যায় মহাবীর। বুকে হাত বুলিয়ে বলে,

ইঞ্জিন লিয়া ইষ্টার্ট ভাইয়া
হুস্ হুস্ ছোড়বে টিরেন
চালাইয়ে কাম সাবাস জোয়ান
বাজ গিয়া সাইরেন—

চেতনার রাজ্যে আসে আলোড়ন। দেখতে দেখতে কোথায় যেন হারিয়ে যায় মহাবীর। সে যেন একটা যন্ত্র। নির্বিকার কাজ চালিয়ে যায় একটানা।

গরীব মানুষগুলো চট চাটাই জড়িয়ে মড়া আনে শ্মশানে। এদের থেকে নগদ প্রাপ্তির আশা খুবই কম। অর্থের অভাবে মুখে 'মুড়ো' জ্বেলে দিয়ে মৃতদেহ নদীর চরে পুঁতে রাখে এরা। মহাবীর হাসে। মনে মনে বলে, গঙ্গাজী শান্তি দিবে। পুরা জীয়ন খুব দুখ্ পেয়েসে। বহুত জ্বালা শাস্তি—আজ সব ঠাণ্ডা।

রুক্ষ চুল ফ্যাকাসে মানুষগুলোর মুখেও এই কথার প্রতিধ্বনি, জ্বালা—শুধু জ্বালা সারা জীবন। জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছি ভাই। এ তবু শান্তি পেল। আমাদের রেখে গেল জ্বলতে। ···কি দাম আছে এ জীবনের ?

মহাবীর হাসে। এই দীর্ঘশ্বাস মাখা, জ্বালায় ভরা জীবন-গুলোই তার কাছে সব চেয়ে দামী। এদের সারা শরীরের হাড়-গোড়গুলো না মিললে শুধু পোড়া কয়লা আর কাপড়-চোপড় কুড়িয়ে পেট চলে না। ঘন ঘন নিশিকান্ত সাধুর আস্তানায় গিয়ে মোটা মোটা 'পুরিয়ায়' পুজো দিতে পারে না। পারে না দু'দিন ছাড়া 'শিবা ভোগ' দিতে। সারাদিনের তরল পানীয় আর তার উপকরণ যোগাড় করতে। আর সাধু বাবাজীদের সেবাও দিতে পারে না।

'শিবা ভোগ' দিয়ে আনন্দ আছে! 'খাবার দাবার' সাজিয়ে নিশিকান্ত সাধু চিৎকার করে ডাকে, আয়—, আয় বেটা সগ্‌গের দেবতারা। নেবে আয় তাড়াতাড়ি। আজকের ভোগ দিয়েচে মহাবীরে। ভোজন কর। তার মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ডাকার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে চার পাঁচটি শেয়াল। সাজান 'ভোগ' মুহূর্তে শেষ করে দিয়ে চলে যায়। অন্ধকারের জীব অন্ধকার গর্তে। হা-হা—করে হাসে নিশিকান্ত সাধু। এই ক্ষমতা জাহির করে তৃপ্তি পায়।

সেদিন বেশ খোস মেজাজেই ফিরে আসে মহাবীর আনন্দে ডগ্‌মগ্ করতে করতে। ভক্ত লাফাতে লাফাতে মনিবের কাছে এসে দাঁড়ায়। দুটো পা মহাবীরের বুকে তুলে দেয়। মুখের কাছে

আনে মুখখানা। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মহাবীরের চোখের দিকে। জিভ বার করে হাঁপায়।

মহাবীর ওর মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে আদর করতে থাকে। থুত্‌নীটা ঠেকিয়ে দেয় ভক্কুর মুখের উপর। কি যেন বলতে থাকে, বিড় বিড় করে।

ভক্কুকে কাছে পাওয়া না গেলে আনন্দটা কেমন যেন জমে না। বাহু বন্ধনে ছটপট করতে থাকে ভক্কু। শেষ পর্যন্ত মুক্তি পায়। এবার লাফালাফি শুরু হয়ে যায় তার। মহাবীর গলার স্বরটা বেশ মোলায়েম করে নিয়ে বলে, লিয়ে এসিচি রে বাপ। লিয়ে এসিচি। এই নে—

পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে মহাবীর। কাঁউ কাঁউ শব্দ করতে করতে সেটা লুফে নেয় ভক্কু। লেজ নাড়তে নাড়তে দূরে পালায়।

মহাবীর হাসে। হাসির ফাঁকে ফাঁকে বলে—সাবাস বেটা। সাবাস। খাবার 'মতলব' জীয়ন। দুনিয়ার সব্‌সে বড়া চীজ। খাবার নেই মিলেগা—তো জীয়ন ঠাণ্ডা। জান বরবাদ।

আজ মদের পরিমাণটা একটু বেশিই হয়। হাতে পয়সা থাকলে ওটা কমান সম্ভব নয়। সারাদিন চলে বোতলের মহোৎসব। নিঃসঙ্গ জীবনে এর মূল্য যে কতখানি তা মহাবীর বোঝে ভাল ভাবেই। কোথা দিয়ে চলে যায় দিন। সময়ের স্রোত।

রাত্রি আসে। আকাশে তারার মেলা। নদীর নিস্তরঙ্গ স্রোত প্রাণহীন সরীসৃপের মত পড়ে থাকে। সূক্ষ্ম মসলিন আঁধারের ঢাক্‌নায় অপূর্ব হয়ে ওঠে নির্জন নদীর বুক। মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে লাল সবুজ আলোর সংকেত।

শ্মশানের উত্তরে শ্যামগঞ্জের কারখানা। আলোয় ঝলমল করে। কোলকাতা থেকে লঞ্চ এসে জেটীতে ভিড়ে যায়।

ঘন ঘন হুইসেল বাজে। দু'পাশে গুচ্ছের গাদাবোট বেঁধে আর

একটা লঞ্চ আসে। তার সার্চ লাইটের আলোয় তটভূমি আলোকিত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে জাহাজখানা দক্ষিণের বাঁকের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। খানিক পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়। মহাবীর বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে সার্চ লাইটের আলোর ফোয়ারা নদীর বুকে দ্রুত এগিয়ে যাবার ধরণ আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সুদূর দক্ষিণে একটা নীরেট আলোক বিন্দু সৃষ্টির দিকে।

সার্চ লাইটের আলোয় আজ সে দেখে শ্যামগঞ্জের মিলের চিম্‌নী খানা। একটা অজগর যেন খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর নিচে আছে কারখানা।

দু'একবার মিলের ভেতরে গেছে সে। বয়লার ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছে বার কয়েক। বেল্‌চা হাতে কয়লা-মাখা মূর্তিগুলো কয়লা ছুঁড়ে দেয়। দাউ দাউ করে জ্বলা আগুনের রাজ্যে। আগুন। শুধু আগুন ওখানে। ওই আগুনই যোগায় শক্তি। যে শক্তির সাহায্যে বজ্জর লোহার তৈরি যন্ত্রপাতি ঘুরে বন্‌বন্‌ করে। কালো কয়লা কিংবা চিম্‌নীর মাথায় ওড়া ধোঁয়া কোনটা দেখেই এই বিরাট শক্তিকে অনুমান করা যায় না।

বেশ মজা লাগে দেখতে। কয়লা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়ে কয়লা মাখা মানুষগুলো দরজা এঁটে দেয় বয়লারের। যা কিছু হবার সব ভেতরে চলে। বাইরের মানুষ কিছুই টের পায় না।

মহাবীর আলকাতরার মত অন্ধকারে দাঁড়িয়ে। মাথায় তার ভাবনা। জাহাজখানা চলে যাবার পর নদীতে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ঢেউ একটার পর একটা এসে কূলে আছড়ে পড়ে। ধীরে ধীরে ঢেউয়ের গতি কম্‌তে থাকে। শব্দও কম হয়। মহাবীর সযত্নে কি সব হিসাব করে যায় যেন। ভুল হলে মহা বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে।

এই অবস্থা দেখে দূর থেকে নিশিকান্ত সাধু বলে, শালা ঋষি-যোগী বন গ্যায়া।

চিন্তার ছেদ পড়ে না মহাবীরের। হিসাব করে ধীরে ধীরে পা ফেলে যায় সে। না হলে অসীম অন্ধকারের মধ্যে ঘটবে পরিসমাপ্তি। এমনি একটা ভাব যেন।

॥ ৪ ॥

অন্ধকার।

চড়ারায়নগরের শ্মশানে গাঢ় অন্ধকার। ঝোপঝাড়, আঁকাবাঁকা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে শিয়াল, খাটাস, বন-বিড়ালের দল। হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকে তারা উত্তর দিকের আলোর মালার দিকে। বার বার উপহাস করে যেন তারা এই আলোক সভ্যতাকে। অন্তত তাদের হাবভাব, গতিবিধি ইত্যাদি দেখলে তাই মনে হয়। সমবেত কণ্ঠে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়—ক্যা হুয়া—ক্যা—হুয়া—হুয়া—হুয়া—ক্যা—ক্যা—

ফেউ—ফেউ—ফেউ—

এদের সহ্য করতে পারে না ভক্ত। চিৎকার করতে করতে এদিক ওদিক ছুটে যায়। দাপাদাপি সুরু হয় ঝোপ ঝাড়ের আশপাশে। খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় যেন।

মহাবীর—। অন্ধকারে ডোবা মানুষটা ডাকে, আয় বেটা—, আয়-। ভক্ত ছুটে আসে। কিন্তু তার কণ্ঠের ভাষায় বেশ বোঝা যায়, এমনি ভাবে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে আস্‌তে সে আদৌ রাজি নয়।

শিয়ালের ডাক বন্ধ হয়ে আসে। শাঁ—শাঁ—শব্দে বাতাস বওয়া শুরু হয়। খেজুরপাতার মধ্যে একটা শব্দ ওঠে। নদীর গম্ভীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ যেন ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে যায়। মহাবীর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকায়। সামনের কাঠের পাঁজার ওপর

বসে পড়ে। মাথাটা উঁচু-হয়ে-থাকা কাঠে ঠেকিয়ে দেয়। মহা আরাম।

আকাশ ভরা তারা। তু'চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। প্রহরের পর প্রহর ঘোষণা করে এগিয়ে চলে সময়ের স্রোত। তার ওপর পাল তুলে ছোট্ট ছোট্ট নৌকোর মত মিলের পেটা ঘণ্টা বেজে চলে—এক—তুই।

পাশে শোয়া ভক্তর গায়ে হাত বুলোয় মহাবীর। ফতুয়ার পকেট খুঁজে দেশলাই বার করে। বিড়ি ধরায়। দেশলাই জ্বালার আর বিড়ি টানার আলোয় অনেকখানি অন্ধকার একসঙ্গে ফাঁকা হয়ে যায়। হো হো করে হাসে মহাবীর। ভক্ত প্রভুর মুখের দিকে তাকায়। মুখ চোখ বাঁকায়। কি হয়েছে অনুভব করতে চায়। কিন্তু পারে না।

নদীর মাঝখানে দাঁড় টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ বেশ স্পষ্ট। ওখান থেকে আরও স্পষ্ট চিৎকার ছুটে আসে—বাঁচাও—বাঁচাও—মেরে ফেললে। ছেড়ে দেরে—বাবা—

চোপ্। চুপরও—। ভারি শব্দ ওঠে।

ঝপঝাপ করে কি সব নদীর জলে পড়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ চিৎকার, গম্ভীর দাবড়ানি শোনা যায়। তারপর সব ঠাণ্ডা।

এর মধ্যে হাতড়ে-হুৎড়ে জীবনকে খুঁজে পেতে চায় মহাবীর। আজ খাওয়া হয় না তার। সবই তো পড়ে আছে আজব কুঁড়েতে। কুপি জ্বেলে ছোট্ট সংসারের জিনিসপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে। সানকিতে খাবার সাজায়। ভক্ত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। তার দৃষ্টিতে কেমন যেন সমীহের ভাব। প্রাজ্ঞ পুরোহিত যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ষোড়শোপচারে থরে থরে সাজান পূজার মহার্ঘ উপকরণের দিকে।

মহাবীর খাওয়া শুরু করে। ঘরের সামনে ছোট্ট একটা মাটির

একটু দূরে কোথাও চলে গেলে, মনটা কেমন যেন হু হু করে। ছটপট করে ভক্তুর জন্যে।

তার মধ্যেও কেমন যেন এক বিষণ্ণ ভাব। ফুলের মাঝে কীট।

আজ মহাবীর ভীষণভাবে বিচলিত। চড়ারায়নগরের একটি ঝুবড়ি দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। ঘরের মধ্যে তক্তায় সাজানো অসংখ্য বোতল। পাশের ঘরে কয়েকটা বেঞ্চি আর বাক্স এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। মেঝেয় ছড়ানো শালপাতা, কাগজের ঠোঙা, ঝালমুড়ি, হাড়ের টুকরো। ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি উড়ে বেড়ায় ভন্ ভন্ করে। কয়েক জায়গায় বমি পড়ে আছে—তার ওপর ফেঁতি কুকুর জিভ বোলাচ্ছে। সারা এলাকা জুড়ে এক ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ।

মহাবীরের কাছে এটা বড় শান্তির জায়গা। নোংরা ঘরটার দিকে উঁকি মেরে—তার মেজাজটা বোধহয় খিঁচিয়ে ওঠে। তার স্বর্গপুরীর এ হেন অবস্থা দেখে গালিগালাজ শুরু করে দেয় সে। টেনে টেনে বলে, শালা—শুয়ার কা—হারামী—নয়া-শরাবী—উল্টি হো গিয়া—শালা—

এখানে আগতদের মধ্যে অধিকাংশই এই অঞ্চলের শ্রমজীবী মানুষ। গোড়া-কাটা-গাছের ঝিমিয়ে-পড়া-পাতার মত সবার শরীরে কেমন যেন নিস্তেজ ভাব। ধুঁকুনি-ধুঁকুনি অবস্থা। ভ্যাপ্সা গন্ধ গায়ে—চোখ কোটরে, যারা আসে তাদের উদ্দেশ করে নীলকণ্ঠ সাহা বলে, শালা স্বদেশী সুতোয় স্বদেশী কাপড় হচ্ছে। স্বদেশী মালও তৈরি হচ্ছে তেমনি। খেলে বুক জ্বলে যাবে—অকালে মরবে শালারা—পেটের ভেতর নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাবে—তবু এই 'স্বদেশী' চাই—

মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটা ছবি মদ দোকানের দেয়ালে সটকানো। নীলকণ্ঠ সেদিকে হাত তুলে প্রণাম জানায়।

মহাবীর মহারানীর ছবিটা দেখে মাঝে মাঝে। অনেক সময়

খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে—। মাথায় মুকুট, দেহে পোষাক, অলঙ্কার। কোন দেবী নিশ্চয়। নীলকণ্ঠ তার এই তন্ময় ভাব দেখে বলে, কি দেখছো অতো—মহারানী মাকে? ওর দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি। পোড়া দেশটা অন্ধকার থেকে আসতে আসতে উঠছে। দেউলীর জমিদার বাবুরা এই ছবিটা আমায় দেয়। এখানে টাঙিয়ে রেখিচি। কারণ দিনরাত দেখতে পাই। আর জানো তো—ওর বাড়ির সমস্ত মাল আমাকেই সাপ্লাই করতে হয়।

বিরাট গোঁফের আড়াল থেকে মহাবীরের সাদা দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে এক অনির্বচনীয় অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে। জমিদার-বাড়ির বাবুরা আর সে একই ধরনের জিনিস ভোগ করে। এতে এক স্থায়ী আত্ম-তৃপ্তির আনন্দ তার মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

নীলকণ্ঠ আবার বলে, জানো মহাবীর—শালা স্বদেশীরা আমার গলাতেও ছুরি মারতে চায়। ওপার থেকে নৌকো বোঝাই চোলাই মাল আনে এপারে। আমিও শালা 'টকে-টকে' আছি। দেখাবো একদিন। হাসতে থাকে নীলকণ্ঠ। মহাবীরও সেই হাসিতে যোগ দেয়।

হঠাৎ এই পাড়ার রাস্তা-ঘাটের লোক কেমন যেন সংযত হয়ে যায়। গলি পথে দ্রুত পায়ে হেঁটে যায় রথীন আর তার জনাকয়েক সঙ্গী। এদের চেনে মহাবীর। ওরা সব স্বদেশী করে। একটু আগে ওদের বিরুদ্ধে যে কথা হচ্ছিল চোলাই মদকে কেন্দ্র করে তা হঠাৎ উবে যায়। রথীনকে দেখে সবাই সমীহ করে। মহাবীর কিছুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। নীলকণ্ঠ গম্ভীর হয়ে যায়।

নদীর বাঁধে হাঁটতে মহাবীরের খুব ভাল লাগে। ওপরে অনন্ত নীলাকাশ। নিচে নদীর প্রবাহ। ছ'পাশে দিগন্ত প্রসারিত মাঠ। মাঠের শেষে উঁচু উঁচু নারকেল-তাল গাছের সারি। তারই সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ গাছগাছালি। খোলা বাতাস।

মনটা কেমন যেন বাঁধন হারা —পাগল হয়ে যায়।

ঝাঁকড়া বট গাছটার নিচে মানুষজন প্রায়ই থাকে। এখানে এলে পায়ের গতি কেমন যেন শ্লথ হয়ে আসে। দু'দণ্ড বসতে ইচ্ছা করে। ঘড়ির কাঁটায়—ভোঁয়ের টানে ছোটাছুটির ব্যাপারটা হালফিলে কিছুটা এসেছে। তাও কয়েকজনের মধ্যে। আগে গড়িয়ে গড়িয়ে কাজ করার যুগে মানুষ এখানে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসাটাকে যেন পুণ্যির কাজ মনে করতো।

অবশ্য মনের তাগিদেই। এখান থেকে পুবদিকে একটু হেঁটে গেলে, সরু আলপথটার ধারে যে অশ্বত্থ গাছটা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে তার নিচে 'বাবা দক্ষিণরায়' ঠাকুরের মাটি দিয়ে বাঁধানো বেদী। কয়েকটা মাটির স্তূপ। প্রতিবছর কিছু মাটির ঘোড়া আর দক্ষিণ রায় ঠাকুরের মুকুট সমেত গোল বিকট চোখঅলা মূর্তি আসে। রোদে জলে বিবর্ণ হয়। পশু-পাখিদের সবদিক থেকে মাত্রা জ্ঞানের অভাবে দুর্গন্ধযুক্ত আর এলোমেলো হয়ে যায় দক্ষিণরায়ের সাজানো সংসার।

পৌষ সংক্রান্তির দিন বিকালের দিকে বিরাট পূজো-আচ্চার ব্যাপার। পাড়ার প্রায় প্রতি বাড়ি থেকে পূজো আসে। সাধ্য মত। পাঁঠা বলি হয়। হিন্দু মুসলমান সবাই আসে। জাগ্রত দেবতার পূজো দেয়। মুসলমানেরা হিন্দুদের দিয়ে পাঁঠা কিনিয়ে বলির ব্যবস্থা করায়। তাড়ির নেশায় ভক্তরা আশপাশের খোলা মাঠে গড়ায়। পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকেনা কারো। পরের দিন 'আক্ষিণ' পর্যন্ত সমানে এই পর্ব চলে। নদীর বাঁধ দিয়ে পিঁপড়ের সারির মত নারী-পুরুষ হাঁটে। মেলা বসে। তারও এক তীব্র আকর্ষণ।

মহাবীর মুরুব্বীদের কাছে গল্প শোনে: ইয়া পালোয়ানের মত মূর্তি। ইয়া গোঁফ। গলায় গোছা পৈতে বাবা দক্ষিণ-রায়ের। এই তল্লাট থেকে বাঘ তাড়িয়েছে। এ ছাড়া ঝাঁকড়া মনসা গাছটা

রয়েছে দক্ষিণরায় ঠাকুরের পাশে। এখানে সাপের দাপটও ছিল বেজায়। গরু চরাতে এসে পর পর তিন চারজন রাখাল মারা যায়। শেষ পর্যন্ত রাখাল বালকেরা শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করে মনসা মায়ের শ্রীচরণে। মনসা মা সাপেদের আরো দক্ষিণে চলে যাবার নির্দেশ দিয়ে দেন। বাবা দক্ষিণরায়ও বাঘেদের সরে যাবার জন্যে দেন কড়া হুকুম। সেই আনন্দে গ্রামের মানুষ আনন্দ করে পূজো দেয়। সারা গ্রামে ছেলেবুড়োর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। এই দিনটির অপেক্ষায় মানুষ অধীর আগ্রহে হাঁ করে থাকে।

মহাবীর নতজানু হয়ে এই দেবদেবীর কাছে মনের কথা জানায় : বাবা আমায় রক্ষা কর। গভীর রাতে কারা কুঁড়ের চারপাশে পায়চারি করে বেড়ায়। ফিসফাস কথাবার্তা বলে। গতকাল হরকোচ বনের ধারে একটা ভাঙা বাক্স আর কিছু কাপড়চোপড় পড়ে ছিল। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ায় নিশিকান্ত সাধু। জাঁদরেল লম্বা চওড়া চেহারা। গেরুয়া বস্ত্র, হাতে চিমটি। কপালে মোটা সিঁদুরের ফোঁটা। দেখলেই যমদূত-যমদূত মনে হয়। মহাবীর তাকায় নিশিকান্তর দিকে। চোখ রাখতে পারেনা। তার চোখের ওপর। নামিয়ে নেয়। এই অল্প সময়েই মহাবীর দেখে নেয় নিশিকান্ত কেমন বিটকেল অথচ অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। শিকার ধরার আগে বাঘের চোখের দৃষ্টির সঙ্গে এর কোন পার্থক্য নেই। এই সব ব্যাপার তার আদৌ ভাল লাগে না। তাই একসময় সে চলে আসে জাগ্রত দেবতার থানে

অন্ধকার নেমে আসে। ভক্ত চিৎকার সুরু করে দেয়। ঝিঁঝিঁদের ঐকতান। পাড়ায় শেয়াল ডাকতে শুরু করে। ভক্তর চাঞ্চল্য বেড়ে যায় ক্রমাগত। সেও চেঁচাতে থাকে সমানে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শরতের সকালে-ছড়িয়ে-পড়া অজস্র শিউলীর মত নক্ষত্র ফুটে ওঠে। দক্ষিণ দিক থেকে হুহু বাতাস ছুটে আসে। চৈত্রের এই সুন্দর সন্ধ্যাটার কোন মূল্যই নেই মহাবীরের কাছে।

নেশা যেন জমতে চায় না। সঙ্গে-নেওয়া বোতল থেকে, মাঝে মাঝে কিছু গলায় ঢালতে থাকে। এই তরল পদার্থ দিয়ে চেতনাকে আচ্ছন্ন করতেই হবে। না হলে মাঝ রাতের ওই বীভৎস ব্যাপার সহ্য করা যায় না। দর দর করে ঘাম বেরুতে থাকে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। এই সমস্ত সহ্য করা তার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

চলার পথে মহাবীরের ভঙ্গি 'রাজ্য জয় করে ফেরার' মত। জাগ্রত দেবতার কাছে সব জানিয়েছে। 'মানত' করেছে। আর কি অসুবিধা থাকতে পারে? তবু কেমন যেন ভয় করে। তাই এই প্রতিষেধক। অসাড় নির্জীব হয়ে পড়ার জন্য তার সমস্ত প্রচেষ্টা।

পথটা এত উঁচু-নিচু করে ফেললো কে? যাবার সময় তো এমন ছিল না। গালাগাল করে মহাবীর—কৌন শালা এইসা মাফিক করলে? পা ক্রমাগত এদিক ওদিক পড়ে। মাঝে মাঝে আছড়ে পড়ে। টলমল করে দুলছে পৃথিবী। কাল বোশেখীর না মহাপ্রলয়ের ঝড় উঠছে? বহুকষ্টে উঠে দাঁড়ায় মহাবীর। কিন্তু পা মোটেই ঠিক রাখা যায় না। এবড়ো-খেবড়ো, ফুটি-ফাটা মাটি। পড়তে পড়তে টাল সামলায় মহাবীর। পাশের ছোট বড় গাছে ধাক্কা খায় ক্রমাগত। গাছের গুঁড়ি ধরে চিৎকার করে- কৌন হ্যায় তুম? ধরমপুরকা মহারাজা? হটো—হটো হিঁয়াসে---। হাম– হাম হ্যায় মহাবীর—

বগলে পোরা বোতলটা কোনও রকমে ফসকে যায় না। একটা শেষ হয়ে গেছে। তাই রাস্তার ধারে ছুঁড়ে দেয় সেটা। পেট বোঝাই মদ। বগলে মদ। আগামী দিনের জন্যে কোন সম্বল না থাক—একটু মদ তো আছে। আর আছে সাথী ভক্ত। সে নাজেহাল অবস্থায় সামলাবার চেষ্টা করে মনীব বন্ধুটিকে। পারে না। তাই মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। মুখে চোখে বিরক্তি এনে এন্তার চেঁচায়।

মহাবীর সমানে চেঁচায়—কৌন কিয়া—এইসা কৌন কর দিয়া-রে ভাইয়া?

মাথার ওপর থালার মত চাঁদ। আজ রাতে পৃথিবী দিনের মত সুন্দর। পাখিরা গান গেয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। মহাবীরের এ-রাজ্যে যেন ঘোরাফেরার অধিকার নেই।

কিছুক্ষণ হাঁটার পর আবার একটা বড় রকমের হোঁচট খায় মহাবীর। আছড়ে পড়ে শক্ত মাটির বুকে। ওঠার চেষ্টা করে আপ্রাণ। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করার চেষ্টা করে বার বার। পারে না। শেষ পর্যন্ত এই অবস্থাকেই স্বীকার করে নিতে হয়। আর উপায় কি?

রাতটুকুর জন্যে আর অন্য কোন পথ নেই। যতক্ষণ প্রকৃতস্থ হয়ে উঠতে না পারে। কয়েকবার এদিক ওদিক হাতড়ে পরম নিশ্চিন্তে মাটি আঁকড়ে শরীর এলিয়ে দেয় মহাবীর। পথের মাঝেই তার শয্যা রচিত হয়। অবাধ বিশ্রামস্থান। উপায় না দেখে ভক্ত লেজ গুটিয়ে পাশে শুয়ে পড়ে। মুখ উঁচু করে মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকায়।

পাশ ফেরার চেষ্টা করে মহাবীর। বগলের বোতলটায় হাত পড়ে যায়। কেমন যেন আলগা হয়ে গেছে বগল থেকে। সাথে সাথে মুখে একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে। জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে থাকে সে, কোথা পালাবি রে বাপ? হামার হাতের বাহার যাবি, সেটা হোবে নারে বাপ? আ যা বাবা—আ যা—। কাঁপা হাতে বোতলটা মুখের কাছে আনে। শোলার ছিপি দাঁত লাগিয়ে খুলে ফ্যালে। বোতলের জলীয় অংশ মুখে ঢালার কসরত করে। কিন্তু বেশির ভাগই পড়ে যায় ফুটি-ফাটা শুষ্ক মাটিতে। তবুও যেন কত আরাম! মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি: আঃ-

কিছুক্ষণের মধ্যে নাক ডাকতে থাকে।

পথের ধারে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে লোক হেঁটে যায়। বজবজ থেকে মিলে খেটে হাঁটা-পথে আসে যারা কিংবা শ্যামগঞ্জের মজুররা।

সবাই বলাবলি করে যায়—বেটা খেয়ে বেহুঁস হয়ে গেলে কি হয়—জ্ঞানগম্যি আছে। ইনসাফ আছে লোকটার মধ্যে। গরীব-হাভাতেরা বেকায়দায় পড়লে—গালভরা হেসে তাদের দায় উদ্ধার করে। এটা কি কম কথারে বাবা ?

পাশে-দাঁড়িয়ে-থাকা ক'জন সাদা পোষাকের পুলিশের লোক কথাগুলো শুনে যায়; কোন কথা বলে না। তারা একে অন্যের দিকে তাকায় মাত্র। পথ দিয়ে আরো লোকজন আসে। সবার মুখে প্রায় একই ধরনের মন্তব্য।

একজন বলে, এমন বড় দীল হাড়ি-ডোম-ফারাসের ঘরে জন্মাল। অন্য মানুষের ঘরে এলে এতদিন মানুষ মাথায় করে নাচত। বলে যায় সে, তার কোন দূর সম্পর্কের মাসিমার পয়সার অভাবে মৃতদেহ সৎকার হচ্ছিল না। সামান্য কাঠ কেনার পয়সাও ছিল না। মহাবীর মাসতুতো ভাইয়ের কান্না দেখে কিছুক্ষণ পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, কাঠ হামি দিচ্ছি। তুই ব্যবস্থা কর ভাই। ও হামার ভি মা আছে তো।

ধীরে ধীরে সব ফাঁকা হয়ে যায়। শ্যামগঞ্জ মিলের পেটা ঘড়িতে পর পর বারোবার ঘা পড়ে। নিশুতি রাতের বুকে এই আওয়াজ বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। পাশে কিসের যেন জোর আওয়াজে আর ভক্তর চিৎকারে মহাবীরের ঘুমটা একটু ফিকে হয়ে আসে। আবার পাশ ফিরিয়ে শোয় মহাবীর হাতের তালুর ওপর মাথা রেখে নাক ডাকিয়ে বড় আরামের ঘুম। চোখে মুখে ঘন প্রশান্তির ছাপ।

মাঝে মাঝে মাটিকে সে জড়িয়ে ধরতে চায়। এই আশ্রয়ে কোন চিন্তা ভাবনা নেই যেন।

যারা চিন্তার-মানুষ তারা চিন্তা করে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে। লঞ্চে গিয়ে বসে। কারো মুখে কোন কথা নেই। যেতে

হবে সবাইকে বজবজ থানায়। অন্য ভাবনা-চিন্তা করতে হবে। চিন্তা যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল—সেখানে দেখে ফাঁকা মাঠ।

সন্দেহের কোন চিহ্নমাত্র নেই সেখানে। অথচ প্রতিদিন চলেছে খুন—জখম—ডাকাতি—গাঙ-ডাকাতি। মহাবীরের আস্তানা পর্যন্ত তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। মহাবীরের পিছু ধাওয়া করেছে। তার গতিবিধি আজ নিয়ে বেশ কিছুদিন লক্ষ্য করা গেছে। দু'চারজন সাদা পোষাকে রয়ে যায়। বাকি রাতটুকু দেখবে তারা।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঠাণ্ডা বাতাস বওয়া শুরু হয়ে যায়। পৃথিবী ভর্তি আলো। রোশনাই। ঘেঁটু ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে পাশের ঝোপ্‌টা থেকে। মহাবীরকে দেখে মনে হয় পৃথিবীর আদিম কোন সন্তান প্রকৃতির কোলে খেলা করতে করতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। এই ঘুমের দৃশ্য আকাশের তারারা বহু যুগ আগে থেকে দেখে আসছে। তবু কেমন যেন নতুন তাদের কাছে। না হলে অমন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কেন? বড় ভাল লাগে এই ছবি দেখতে। যশোদার কোলে কৃষ্ণ বা মেরীর কোলে যীশুর ছবি এ যেন! কোন সুদক্ষ শিল্পী নিখুঁত ভাবে খোদাই করেছে যেন এই দৃশ্য। পাশে অতন্দ্রপ্রহরী ভক্ত চুপচাপ বসে। ফাঁকা মাঠের চার দিকের অবাধ উৎসব দেখে সে। বাবলা-সারির ওপর জোনাক পোকার আলো। মাঝে মাঝে শেয়াল কিংবা পেঁচা ডাকছে। তবু কোন উত্তেজনা নেই তার মধ্যে। মানুষের প্রেমের বন্ধনে জড়িয়ে পালাতে পারে না সে।

রাত এগিয়ে চলে।

অদূরে ঝোপঝাড় থেকে দু'একটা শেয়াল মুখ বাড়ায়। পরক্ষণে মাথা নিচু করে নেয়। মাঝে মাঝে ভক্ত ছুটে চলে যায় নদীর বাঁধের ওপর। চাঁদ শতখণ্ড হয়ে ভাসে নদীর ওপর। সেদিকে সে তাকায়। অজস্র আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে যেন। মাটিতে-আকাশে-নদীতে।

তারই মাঝে ছোট্ট একটা কুঁড়ে। যেটা ভক্তর বড় আপনার। কেঁউ কেঁউ করে তার চারপাশে একবার ঘুরে নেয়। আবার ছোটে।

সুযোগ নেয় শেয়ালগুলো। এই অবসরে লোভ সম্বরণ করতে পারে না। উৎসাহ ভরে এগিয়ে আসে। কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে যায় মহাবীরের হাত-পা ছোড়া দেখে।

॥ ৫ ॥

গত রাত্রির কথা জলের দাগের মত মুছে যায়। কিছু আর মনে নেই। উঠে দাঁড়ায় মহাবীর। 'মাটির ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়ান, মরদের কাজ।' কথাটা মনে হতেই কেমন যেন হাসি পায় তার। মাথায় গামছার পাগ্‌ড়ি বাঁধা। মহিষের শিঙের মত দু'দিকে খেলানো বেশ কয়েক ইঞ্চি গোঁফ। ডগা দুটো যত্ন করে পাকানো। ছোট হলে কি হয় দৃষ্টির গুণে চোখ দুটি বেশ স্বচ্ছ। সুন্দর স্বাস্থ্যে যৌবনের জোয়ার।

ঘেউ ঘেউ করে পেছনে পেছনে হাঁটে ভক্ত। যেন গত কালের জন্যে ভৎর্সনা করতে করতে যায় আপন প্রভুকে। আস্তানার কাছাকাছি এসে কুরুক্ষেত্র বাধায় সে। চরের দিকে সরোষে ছুটে যায়। আবার ছুটে আসে মহাবীরের পায়ের কাছে।

হাসে মহাবীর। তার অন্তরের প্রসন্নতা চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

এক ছুটে পালায় ভক্ত।

সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহাবীর।

চরের হন্যে কুকুরগুলো বিব্রত হয়ে পড়ে ভক্তর দাপটে। শকুনগুলোও। সবার পেছনেই ছোটে সে। রণংদেহি মূর্তি। বিনাযুদ্ধে কাকেও এক টুকরো দেবে না সে। চরে-লাগা গরুর মৃত দেহটা নিয়ে রীতিমত লড়াই বেধে যায়।

ভক্তর ভয়ে দুর্বল কুকুরের দু-একটা আত্মরক্ষার জন্যে জলে নেমে যায়। গোঁ গোঁ শব্দ করে—কোঁপরা ঢেঁকির মত। কেউ প্রাণ ভয়ে পেছনে তাকাতে তাকাতে ছুটে পালায়। ফেঁতিগুলো উৎকট ভাবে দু'পাটি দাঁত বার করে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। তাদের সারা শরীর ধনুকের মত বেঁকে যায়। ক্রমাগত লেজ নড়ে। বোধহয় এইভাবেই আত্মসমর্পণ করে। ভক্ত এদের ওপর দাপট দেখায় না। শকুনগুলো লাফাতে লাফাতে আত্মরক্ষা করতে ব্যস্ত হয়।

ভক্ত বড় আদরের। তবু তার আচরণে কেমন যেন বিচলিত হয় মহাবীর। এমন করে খুঁতিয়ে ভক্তর কীর্তি সে আগে কোনদিন বড় একটা দেখে না। চিৎকার করে সে ভক্তকে ডাকে, ভকত—ভকত—ইধার আও বেটা। আও—জল্‌দি আও—

পলি মাটির ওপর দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ছুটে আসে ভক্ত। স্বচ্ছ নদীর স্রোত, প্রশস্ত চরভূমির পটভূমিকায় অদ্ভুত লাগে তার ছুটে আসার দৃশ্যটি।

মালিকের পায়ের কাছে ধপাস্ করে শুয়ে পড়ে ভক্ত। মহাবীরের মুখের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ে। লালা-ঝরা জিভ বার করে হাঁপায়। তার চঞ্চল দুটো চোখের তারায় বীর সৈনিকের দৃষ্টি। আদেশ মাত্র সে যেন বিশ্বের যে কোন প্রান্তে ছুটে যেতে পারে। শত বাধা বিপদ অগ্রাহ্য করে।

মহাবীর ভক্তর মাথায় হাত বুলোয়—সস্নেহে। বলে, তু বেটা কুছ্ কুছ্ হামার কাছে খেতে পাস। ওরা ভুখের জ্বালায় টো টো করে ঢুঁড়ে বেড়ায়। ওদের খানায় কেনো তু ভাগ লাগাবি রে? কেনো ঝামেলা বাঢ়াবি তু। বৈঠ যা। হামার পাশ বেঠ যা।

নদীর চরে মৃত পশুর দেহ নিয়ে টানাটানি, ছেঁড়াছেঁড়ি—ছুটোছুটি করে এক পাল কুকুর-শকুন আর কাক। সেদিকে তাকিয়েও বাধ্য শিশুর মত নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে ভক্ত।

মাথার ওপর করুণ সুর ছড়ায় একপাল চিল। চক্রাকারে ঘুর

পাক খায়। চোখ তাদের মাটির দিকে। মাঝে মাঝে ছোঁ মারে। মাংসের টুক্‌রো নিয়ে বটের ডালে গিয়ে বসে। কষ্টে টুক্‌রো করা মুখের গ্রাস নিয়ে পালালে কিছুক্ষণ শূন্যের দিকে মুখ তুলে আস্ফালনের চেষ্টা করে, বোকা বনে যাওয়া পশু। কিছুক্ষণের মধ্যে আবার ফিরে আসে নিজের কাজে। শত ঝগড়া-ঝাটির মধ্যেও নিজের স্থানটি বহাল রাখতে ব্যস্ত হয়।

কাকেরা এই মহাভোজনের চত্বরে ঢুকে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে। তাড়া খায়। পালায়। টুকরো-টাকরা নিয়ে দূরে সরে পড়ে। ভোজনরতদের মধ্যে মুহূর্তে দল তৈরি হয়ে যায়। কোলাহল আরম্ভ হয়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসে দু'একটা। এদিক ওদিক উড়ে যায়। গাছে পালায় গিয়ে বসে। সুযোগ পেলেই উড়ে এসে বসে পড়ে। উচ্ছিষ্ট সংগ্রহে ব্যস্ত হয়। এতে কুকুরগুলোর রাগের অন্ত থাকে না। ছুটে যায় দাঁত বার করে।

ভক্ত মহাবীরের প্রতিবেশী। আত্মীয়। সন্তান। রাগে তাকে গালাগাল দেয়। আনন্দে বুকে জড়িয়ে নিয়ে আদর করে। অবসর সময়ে তার কীর্তি দেখে হাসে। হাততালি দেয়।

দূর্বার সবুজ গালিচা-পাতা সুবিস্তৃত চরখানায় শ্মশান। এদিক ওদিকে পোড়া কয়লা ভরা চিতা। সবল জোয়ানের অঙ্গে ক্ষত চিহ্নের মত। নদীর চরে এখানেই মৃত মানুষের সৎকার হয়।

কয়েকটা প্রায় পত্রশূন্য খেজুরগাছ এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। একপাশে কেয়া, হরকোচ, সেঁকুল, বনযুঁইয়ের ঝোপ। এর পাশে ভাঙা আধভাঙা মাটির কলসী গড়াগড়ি যায়। ছেড়া কাঁথা বালিশ লেপ তোষকের তুলো চট চাটাই ছড়ানো এদিক সেদিকে।

তারই একপাশে ঝোপটার গা ঘেঁসে মহাবীরের আস্তানা। দুটো পাশাপাশি খেজুরগাছ মাঝের খুঁটি। শ্মশানে মৃতদেহ আনার বাঁশের খাটের থেকে বাঁখারি আর বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরি করা কাঠামো।

চট-চাটাই দিয়ে ছাওয়া। ওগুলোও মৃতদেহের সঙ্গে আসা শেষ সম্পত্তি। আজব আস্তানা সত্যিই আজব।

ঘরের ভেতর অসংখ্য গেরোস্তালির জিনিসপত্র। কানা-ভাঙা কলসী, তোবড়ান-এ্যালমুনিয়ামের গ্লাস, ইটের বেদীর ওপর কালি-মাখা হাঁড়ি, ভাঁড়, মালসা, সান্‌কি। সিকেয় ঝোলানো তেল চট্‌চটে ভ্যাপ্সা গন্ধ কাঁথা, মাদুর। চালে গোঁজা হাতপাখা আর ছোট্ট একটা রঙচঙে ঘোড়া। মিলের এক কেরানীবাবুর একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে এটা এসেছিল শ্মশানে। পরম যত্নে এই রঙীন অশ্বটি তুলে রেখে দিয়েছে মহাবীর। মাঝে মাঝে এটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে সে। বাচ্চা ছেলের মত। তখন দু' চোখ দিয়ে হুহু করে জল বেরিয়ে আসে। বুকে জড়িয়ে ধরে খেল্‌নাটা। এখনো সেই শিশুর মুখ স্পষ্ট মনে আছে তার। মনে আছে দুটো চোখ।

কুঁড়ের সামনে পোড়া, আধপোড়া কাঠের স্তূপ, দলাপাকান কাপড়-চোপড়, কাঁথা বালিশ, চট-চাটাই। কাপড়ে বাঁধা কি একটা জিনিস —তার ওপর ভন-ভন করে মাছি এসে বসে। মাছির মেলা লেগে যায় যেন ওখানে।

কয়েকটা হুঁকো ছড়ানো এখানে ওখানে। কোনটায় নল্‌চে নেই। কোনটার আছে। জীবনের এক বিরাট সত্যকে সামনে এনে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন। মালিকের হাতে থাকাকালীন অবস্থায় মজাসে টান মারা, ধোঁয়া ছাড়া, ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দের ছন্দ সৃষ্টি কত কিনা হয়েছে তাদের নিয়ে। আজ মালিক নেই। তাই তারা পরিত্যক্ত। মূল্যহীন তাদের জীবন।

মানুষের জীবনের এক প্রতিচ্ছবি যেন এর মধ্যে দেখা যায়।

শ্মশানের কিছু দূরে গ্রামের খালটা এসে মিশেছে নদীর সঙ্গে। প্রস্থে খাল তো নয় এটা। নদীর মত। খালের মোহানা থেকে শ্মাশান পর্যন্ত দীর্ঘ জঙ্গল। হরকোচ, সেঁকুল, কেয়া, আশশেওড়া, বঁইচি, তেকাঁঠাল থেকে শুরু করে বাটাম, কালকালুন্দে, শেওড়া,

পানশিউলী সব রকম গাছই আছে এখানে। প্রান্তসীমায় উলুবন আর চারা খেজুর গাছের ঝোপ।

তাছাড়া কোথাও কোথাও ভাঁটগাছ আর বনযুঁইয়ের ঝাড়। নদীর ধার ঘেঁসে সরু ধরনের বাঁশের ঝাড়। কেউ ছোঁয় না এই বাঁশ।

বল হরি—হরি-বোল হরি—

কাজ শুরু হয়ে যায় মহাবীরের। যন্ত্রের মত পিঠের ওপর ডান হাতের মুঠিতে বাম হাতের কব্জিটা শক্ত করে ধরে মড়ার পাশে এসে দাঁড়ায় মহাবীর। খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে অনেক কিছু দেখার চেষ্টা করে সে। কত রকমের কথাবার্তা—ফিসফাস আওয়াজ—চোখের সংকেত দেখে সে। মৃতদেহ তাড়াতাড়ি নিশ্চিহ্ন করে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা দেখা যায় কোন কোন সময়। আক্ষেপও শোনা যায় কখনো কখনো।

ই শালা নিয়তি ছাড়া আর কি? নাহলে কি ই বয়েসে এমনি অবস্থায় মরে কেউ?

সত্যি উপীনখুড়ো—মরার জন্যেই যেন গেরামে এসে হাজির হল বেচারী।

নিজের জরমভূমি ছোঁয়ার জন্যে জান্‌টা যেন আনচান কত্তেছিল ভাই—

আনচান কত্তেই হবে—এসতেই হবে—

এসতেই হবে—হিড়-হিড় করে টেনে আনবে নিয়তি—

অমন ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিসনি রেমো—সব জিনিসের মানে একটা ইয়ে থাকে—সেই ইয়ে—

তুই আর ইয়ে ইয়ে করিসনি—

ভাঙব হাঁড়ি হাটের মাঝে—দেখবি—দেখবি—

থাক্ থাক্ ছিমন্তদা—তুমিও কি ছেলেমানুষ হয়ে গেলে—? 'জ্ঞানমান' হয়ে—। কণ্ঠে ভরাটি আওয়াজ। আর আওয়াজের মধ্যেও একটা ভার আছে। যাকে অবহেলা করা যায় না আদৌ। শ্রীমন্ত চুপ হয়ে যায়।

চুল্লি ঠিক করা। কাঠ সাজানো। শবদেহ স্থাপন। তার আগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ধরনের কাজকর্ম। মায় পিণ্ডদান পর্যন্ত।

মহাবীর এই সময়টা পরিত্যক্ত জিনিসপত্র সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। দেখতে দেখতে মৃতের একান্ত আপনজনের আগুনের পরশ পেয়ে চিতা সানন্দে জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে। শ্মশানযাত্রীরা আশে-পাশে গিয়ে বসে। মহাবীর তোবড়ানো গ্লাসটা হাতে নিয়ে পা ঘষে ঘষে এদের সামনে আসার চেষ্টা করে। মুখ ফুটে বলতে হয় না তাকে।

আয়-আয় মহাবীর—

ঢালো ওর গেলাসে—

ঢালতে ঢালতে সবাই প্রায় কেমন যেন বেহুঁশ হয়ে যায়। তবু বলে ঢালো।

এ্যাই তুদের মা মরে যাবার সময় কি হয়েছিল মনে আছে তো? টেনে টেনে বলে শ্রীমন্ত বায়েন।

বাবা সেটা আর মনে থাকবেনে। গুচ্ছের মদ গিলে মুখ-আঁধারি অন্ধকারে শালা সুরে মোড়ল গড়িয়ে পড়ে গেল ঘোষেদের পুকুরে। কেউ ঠাওর কত্তে পাল্লে নে। শেষ অব্দি ভেসে উঠতে তাকেও নিয়ে আসতে হলো এই 'শান্তির-সুমুদ্দুরে'। এত্তো শান্তি আর কোথাও নেই ভাই। যত তাড়াতাড়ি এখানে আসা যায় ততই মঙ্গল।

সবার চোখের দৃষ্টি, চিন্তা ভাবনা, সব কেমন যেন একরকম হয়ে যায়। কাউকে আলাদা করা যায় না এই অবস্থায়। মহাবীর খুঁতিয়ে-খুঁতিয়ে দেখে সবার মুখ।

গ্লাসের অবশিষ্টটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে চওড়া বুকে হাত বুলিয়ে বলে, কলিজে ঠাণ্ডা হোল বাবা।

বুক ঠাণ্ডা হোল কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা হোল কই? সমস্ত মানুষ শান্তির সুমুদ্দুর শ্মশানে পালিয়ে আসতে চায়। তাহলে শালা কিছু কি নেই এই তুনিয়ায়! বেঁচে কোন লাভ নেই? কেমন যেন হয়ে

যায় মহাবীর। বুকে হাত বুলোতে থাকে। মাঝে মাঝে গোঁফ পাকায়। পাশের চিম্‌নীঅলা মিলখানার দিকে তাকায়। জীবনের যদি দাম নেই, বেঁচে যদি লাভ নেই তবে ওরা শক্ত ইট কাঠ পাথর দিয়ে দালান-কোঠা বানাচ্ছে কেন? দিনরাত পরিশ্রম করে কারখানা তৈরি করছে কেন? রাতদিন পাগলের মত কাজ করছে চোখের সামনে। 'বাঁশি-টেনে' লোক ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ সবই বা কেন? শাস্তির সুমুদ্দুর এই শ্মশান, এটা ওদের মুখের কথা নয়। ওদের বাদ দিয়ে যারা হাড় হাভাতে তাদের কথা এটা। হো হো করে হাসে মহাবীর। মা-বাবা বিস্তিয়া নানি চলে যাবার পর সে গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছে এই কথাটা। নিজের অবস্থানটা বেশ ভাল করে চিহ্নিত করে ফেলেছে। নতুন চিন্তায় যেন দিগ্বিজয় করে ফিরছে সে। তেজী টাট্টু চড়ে। দীর্ঘ পথে ছুটে আসার চাঞ্চল্য ফুটে ওঠে তার সর্ব শরীরে। মুখে ছড়ায় ফুলের হাসি।

আকাশের দিকে তাকায় মহাবীর। রোজকার মত আজো তারা উঠেছে আকাশ ভর্তি হয়ে। নদীর জলে আজো তার ছায়া। বাতাসের বন্যায় আজো মাঝে মাঝে ভেসে আসছে বনফুলের উগ্রগন্ধ। মহাবীর রোজকার মত দাঁড়িয়ে থাকে নদীচরের শ্মশানে। কিছুটা দূরে জ্বলে নিশিকান্ত সাধুর ধুনি। পাশে ত্রিশূল পোঁতা। মোটা সিঁদুর মাখানো ত্রিশূল। তার সামনে বসে আছে চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে সাধুজী। তিনিও নিজের কাজে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে কল্‌কের ধোঁয়া ওড়ে। ধ্বনি ওঠে, ব্যোম্ শঙ্কর—। শ্মশানযাত্রীরা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে চিতার দিকে। যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাক না কেন। সবাই কাজে ব্যস্ত। পাশে মিলখানার ব্যস্ততার আওয়াজ।

এই কাজের মধ্যেই ঝরে পড়ে কোথায় নৈরাশ্য। কোথাও অফুরন্ত উৎসাহ। এমন কেন হয়?

জ্বলন্ত চিতার মধ্যে বেঁকে-চুরে বীভৎস হয়ে যায় মৃতদেহ।

বাঁশের দণ্ড দিয়ে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটান যায়। মাথা ভাঙে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে। ধীরে ধীরে দেহের অস্তিত্ব ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে।

মহাবীর আড় চোখে তাকায় শ্রীমন্তর দিকে। লোকটাকে অন্য সবার থেকে আলাদা করা যায় প্রথম দর্শনেই। বেশ ভাল মানুষ বলে মনে হয়। কিন্তু বড় ভীতু ভীতু মুখখানা। আজকের দুনিয়ায় চলার মত নয়। মহাবীর আজ যেন প্রত্নতাত্ত্বিকের মত তাকায়। এভাবে দেখার প্রয়োজনটা কি, তা সে হয়তো সঠিকভাবে জানে না। তবু তার মনে হয় এইভাবেই দেখতে হবে। নাহলে দেখা সম্পূর্ণ হয় না। ভেতর থেকে কিসের একটা টান স্পষ্ট সে অনুভব করে। একদৃষ্টে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মনে হয় অস্পষ্ট অক্ষর পড়ার চেষ্টা করছে সে যেন। এক সময় মহাবীরের মনে হয়, লোকটা যেন তার কত আপন। খুব কাছের মানুষ। শ্মশান জীবনে এমনটি এর আগে আর কোনদিন হয় না তার।

আজ বেশ ভাল কিছু হাতে আসে মহাবীরের। এই পাওয়ার মধ্যে কোন আনন্দ নেই। বরং একটা বেদনা সারা বুকটায় মোচড় দেয় নির্মম ভাবে। বিকট একটা হিংস্র জানোয়ার নখ দাঁত মেলে বার হয়ে আসতে চায় যেন বুকের ভেতর থেকে, শয়তানের টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে দিতে চায়। এই অবস্থাটা আঁচের মত গন গন করে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। পর মুহূর্তে সব কিছু কোথায় হারিয়ে যায়। অনন্ত অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলে যায় জ্বলন্ত এক গ্রহ। ক্ষণিকের আলোর রোশনাই দেখিয়ে। তারপর আবার সেই সীমাহীন অন্ধকার।

বনঝোপের দিকে মহাবীরের চোখ পড়ে। ছোট্ট সাদা রঙের একটা ফুল। পায়ের নির্মম আঘাতে আঘাতে বিপর্যস্ত। বড় ব্যথা পায় মহাবীর। ফুলটা কুড়িয়ে নেয়। পরম যত্নে। গন্ধও আছে ফুলটার। আজ সে ভাবতে বসে, এমনি ধরনের কত ফুল ধুলোয়

লুটিয়ে পড়ছে। পায়ে পায়ে পিষ্ট হয়ে তার সৌন্দর্যের ডালা মানুষের দরবারে উপস্থিত করতে পারছে না। তার মিষ্টি গন্ধের কোন মূল্য নির্ধারিত করতে পারছে না লক্ষ কোটি জনতার দরবারে।

বড় কষ্ট হয় মহাবীরের এই ধরনের অপমৃত্যুর জন্য।

॥ ৬ ॥

শ্মশান থেকে ফেরার পথে শ্রীমন্ত 'বিবির জাঙালে'র হাজার-ঝুরি-বার-হওয়া বটগাছটার নিচে দিয়ে যাবার সময় কেমন যেন পা মেপে মেপে চলে। এদিক ওদিকে তাকায়। চারদিকে উজ্জ্বল বাতি জ্বালানো। বড় বড আড়ত দোকানে মাল ওঠা-নামার কলরব। গাড়ির গরুগুলো পথের ধারে লাইন দিয়ে বাঁধা। সবার সামনে ছড়ানো খোলা আঁটি খড়। কেউ তা খাচ্ছে। কেউ শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে। ভাবছে পথশ্রম আর চাবুক খাওয়ার কথা। সবুজ ঘাস আর গাছগাছালির পাশ দিয়ে ক্যাঁচকোঁচ করে রাত দিন হাঁটবে—তবু ওদের জীবনে সবুজ কিছু জুটবে না। মাঝে মাঝে কয়েকগাছা শুক্‌নো খড তাও সব সময় জোটে না। শুধু হাঁটো। এগিয়ে চলো।

ঝুরি নামা বট গাছটার নিচে বিঘে পঁচিশ-তিরিশ জমির ওপর গঞ্জ। তিন দিক থেকে গভীর খালগুলো এসে মিশেছে এখানে। একদিকে নদী। এছাড়া দুটো চওড়া মেটে রাস্তা দূর গ্রাম পেরিয়ে শহর পর্যন্ত পৌঁচেছে। তাই খড়, পাতা, আর ঢেউখেলানো টিন দিয়ে এই বিরাট চত্বরে গড়ে উঠেছে ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র।

শ্রীমন্তর মনে হয়, গরুর গাড়ির চাবুক খাওয়া, মুখে গ্যাজা-ওঠা গরুগুলোর থেকেও তার জীবন নিচু স্তরের। আজকাল তার পথে বার হওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। চালের আড়তের সামনে তক্তপোষের ওপর মোটা গদিতে বসে আছেন শ্রীদাম চক্রবর্তী। ওর

চোখ তীরের ফলার মত বিঁধে যায় যেন। মুখের দিকে তাকালে, কেউ পা তুলতে সাহস করে না। আটকে যায়।

কাটারি নাক। জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। নধর ভুঁড়ি। সুন্দর রঙ। মোটা উপবীত ধারী শ্রীদাম চক্রবর্তীর কথা ধারাল। ঝাঁঝাল আর বাঁকা। কথায় কথায় নাড়িভুঁড়ি টেনে বার করে আনার ক্ষমতা ধরে সে। শ্রীমন্ত জানে, আজ সে শ্মশান যাত্রীদের সঙ্গে। তাই কিছু করার ক্ষমতা চক্রবর্তী ঠাকুরের নেই। তাছাড়া আর একটা কারণও আছে। যার জন্য অন্তত আজকের জন্য তার মুখটা বন্ধ থাকবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি সে মুখ খুলবেই। আসার পথে পাঁচকড়ি বলছিল, সে নাকি নেশার খেয়ালে একবার বলে ফেলেছিল - হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙবে। একথা সুধীর শ্রীদামকে বলবেই। আর তার ফল ভাল হবে না। তাছাড়া এ ব্যাপারে কলকাঠি যা নাড়ার তাতো নেড়েছে শ্রীদাম চক্রবর্তী। বলেছে, আঁধার থাকতে থাকতে আগে লাশ পুড়িয়ে ফেল, তারপর যা হবার হবে।

বিপদটা এখনই ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। তবু মনে হয় এত আলো যেন শ্রীমন্তর ঘোরতর শত্রুতা করছে। সব দিক থেকে বিপদ যেন হৈ হৈ করতে করতে ছুটে আসছে। বুক কাঁপে। এর থেকে অন্ধকার—জমাট বাঁধা অন্ধকার ঢের ভাল।

এই শালাদের প্যাঁচের রাজ্য থেকে বিদায় নিতে পারলে তবে মুক্তি। এখানে এরা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে অর্থ, ধূর্তবুদ্ধি আর নানা ধরনের ছলচাতুরী দিয়ে। পরিষ্কার মন নিয়ে কেউ পথ হাঁটে না।

গঞ্জের বা আড়তের ভেতরে বাইরে যারা বসে তারা সবাইতো অন্ধকার ভালবাসে। অমাবস্যার অন্ধকারে বাদুড় চামচিকে ওড়ার মধ্যে তারা মিষ্টি ছন্দ খুঁজে পায়। বট গাছের অজস্র ডালের মধ্যে বাতাস বয়ে যায়। পাতা নড়ে। চারদিকে দোকান আড়তের ঘেরা সুবিস্তৃত মাঠখানা খুবই রহস্যময় বলে মনে হয়। শ্রীদামের ভাষায়

আলো জ্বালিয়ে রেখেছে তাই এত উজ্জ্বল। না হলে এ রাজ্য কু-কাফ অন্ধকারে ডুবে থাকবে। চারপাশে সারাক্ষণ ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দ ওঠে। হ্যা— হ্যা— হ্যা —এই কথার সঙ্গে চোখের বিশেষ ভঙ্গি। হাতের মুদ্রা। ভুঁড়ির ওঠানামা—সবই নজরে ঠেকার মত। বিশেষ করে চোখের দৃষ্টি।

একখানা হাতপাখা হাতে নেয় শ্রীদাম। চটি টানতে টানতে পশ্চিম মুখো হয়। এই রাস্তাটা নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে। গরুর-গাড়ীর 'লীক্‌' পড়া চওড়া মাটির রাস্তা। ধারে চওড়া খাল। খালের জলের ওপর নারকেল, খেজুর, খেলকদম গাছের ঘন ছায়া। এই জলপথকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত এই গ্রামখানা।

শ্রীদাম চলার গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দু'এক বার পাখা টানে। মন তার চলে যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কালে। তখনো নাকি তাদের বসতি ছিল এখানে। এমন এক কিংবদন্তী আছে। মনের মধ্যে পাক খায় চিন্তার ঘুর্ণি। ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের এ তল্লাট মাগুরা, ঘড় পরগনা ছিল নদীয়ার মহারাজাদের অধীনে। রাজদত্ত পদবী 'চক্রবর্তী'। এমনি আসে না এটা। এর জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে তার পূর্ব-পুরুষদের।

আজো অস্তিত্ব বজায় রাখার লড়াই প্রতি মুহূর্তে চালিয়ে যেতে হচ্ছে চক্রবর্তী মশাইকে। চলার পথে ঝাঁটার মুড়োর মত কাঁচা পাকা শক্ত গোঁফের ওপর একবার হাত বুলিয়ে নেন তিনি। আলপিনের মত গোঁফের খোঁচা তার হাতের তালুতে ফুটে ফুটে যায়। এতেই বড় আরাম। চলার পথেও এই ধরনের কাঁটার হুল প্রতি পদক্ষেপে।

অসময়ে আজ একবার বাড়ীতে আসেন চক্রবর্তী মশাই। প্রায় কুড়ি বিঘা জমির ওপর বাস্তু। কয়েকখানা বড় বড় দীঘিতে বাড়ীখানা ঘেরা। পরিখা ঘেরা বলা যেতে পারে। বেশ হিসাব পরিকল্পনা করেই বাড়ীগুলো তৈরি হয়েছিল এককালে। মণ্ডল বাবুদের "জল-টুঙ্গীর-বাগান" আর চক্রবর্তীদের "বর্গী-তাড়ান-বাস্তু" এলাকার

তক্ত.

মানুষের কথায় কথায় ফেরে, প্রবাদ বাক্যের মত। ঠাকুর-দালান, নাট-মন্দির, দারোয়ান-সিপাহীদের দেউড়ি পার হয়ে, বিরাট একটা ফটক। তুটো ঝিলের মাঝখানে। চক্রবর্তী-বাড়িতে ঢোকার সিংহ-দ্বার। মোটা কাঠের ওপর গুল-পেরেকের-মাথার সারি এক বিশেষ ধরনের আভিজাত্যের জন্ম দেয়। উঁচু চওড়া এই কপাটের মাথায় তুই সিংহমূর্তির উপস্থিতি। বৈঠকখানা ঘরে পুরাতন আমলের আসবাবের সঙ্গে 'মহারানীর' ছবি।

অন্দরমহলের ভেতরের কড়াকড়ি আজ আর নেই, তবু কর্তার উপস্থিতিতে অন্যান্য মেয়েদের 'ঠাট' বজায় রাখতে হয়।

শ্রীদাম বিঘা চারেকের বাঁধান উঠোনের ওপব পা দিয়েই ডাকতে শুরু করেন—সন্ধ্যা ও মা সন্ধ্যা, তোর মাকে একবার ডেকে দে--

উঠোনের ওপর তখন বিভিন্ন রঙের একপাল পায়রা ঘুরে বেড়ায় বকম্ বকম্ ডাক ডেকে ডেকে। দাস-দাসীরা এদিকে ওদিকে ছোটা-ছুটি করে। তু' চারটে বেড়াল ভাঁড়ারের সামনে পা চাটে। বাড়ির পূর্ব দিকের বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালে একপাল হলুদ পাখি ডাকে, 'গৃহস্থের বৌয়ের খোকা হোক -'

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় প্রজা পিটিয়ে যখন খাজনা আদায়ের ধুম পড়ে। মানুষ না খেয়ে মরে। তখন নাকি এই বংশ বেশ কিছু অর্থ রোজগার করে। নিজেদের সমৃদ্ধির জন্য ওরা 'ভবানন্দ মজুমদারের' পথে চলার লোক। সারা দক্ষিণ বাংলা যখন একসুরে কথা বলেছে, স্বাধীনচেতা প্রতাপাদিত্যের সমর্থনে, সেই সময়ে প্রতাপাদিত্যকে দমন করার কাজে জাহাঙ্গীর পাঠায় মানসিংহকে। ভবানন্দ মানসিংহকে সাহায্য করে আর নিজের আখের গুছিয়ে নেয়। চক্রবর্তীরাও সেই সময় নিজেদের আখের গুছিয়েছে।

পরে, পঞ্চাশের তুর্ভিক্ষ। এর অনেক—অনেক পরের কথা। এক মুঠো খাবারের অভাবে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছে মানুষ। তখন হাজার হাজার মণ চাল পাচার হয়েছে 'শালতি' পথে। বিবির

বাজারের চত্বরে রাতের অন্ধকারে ফিস্‌ফিস্‌ আওয়াজ। মানুষের পিঠে চালের বস্তার ওঠা নামা। টাকার থলি হাতে মানুষের সন্ত্রস্ত পদক্ষেপ।

দিনের আলো ফুটলে আর এক দৃশ্য। মাটির বাসন হাতে এক ঝোড়া রুক্ষচুল মাথায়, ট্যানা-পরা, হাড়-জিরজিরে মানুষের ক্ষীণ আর্তনাদ, নাকি সুরে আর্তি, মা-ফ্যান দে মা—একটু ফ্যান। রাস্তা ঘাটে শেয়াল-কুকুর-শকুনের দাপাদাপি। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। মানুষের সৃষ্ট নির্লজ্জ অরাজকতা।

শ্রীদাম চক্রবর্তীর আগের পুরুষ ছিলেন ব্যবসায়ীদের মধ্যমণি। লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর বিনিময়ে তাঁর 'সাঁজাই-বাক্স' ভরে ওঠে। দিনে দিনে সঞ্চয়ের পরিমাণ পাহাড়-প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সুউচ্চ শিখর দেশের চারপাশে সতর্ক পাহারা দিয়ে বেড়ায় শ্রীদাম চক্রবর্তী। লোকে অবশ্য ঠাট্টা করে অন্য কথা বলে, 'যখের মত পাহারা দেয়'? এতে কিছু মনে করে না সে। একটি কথা সে মাঝে মাঝে উচ্চারণ করে, দুধ আর ভাত শুধুই আসে না পাতে। কাল্‌সিটে দাগ পদাঘাত থাকে সাথে। জিজ্ঞাসা কোরো তাদের, যারা ভাতের ওপর মাছের ব্যবস্থা করতে পেরেছে।

বন্যার মত আসা অর্থে, পুরাতন বাস্তু ভিটের ওপর আজ আধুনিক ধরনের 'মানসানের' উঁকিঝুঁকি। জীবনযাত্রা—কথাবার্তা—হাবভাবে আধুনিকতার সুস্পষ্ট ছাপ। শ্রীদামের আগের পুরুষেই একজন কৃতী ডাক্তার বিদেশ থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এসে, দেশের মাটিতে সাধারণ মানুষের যথেষ্ট উপকারে লাগে। লেখাপড়া শেখার রেওয়াজটাও এই সময় থেকে বিশেষ ভাবে দেখা যায়। এর পাশাপাশি অবশ্য রক্ষণশীলতার পাথরটাও জমাট-বেঁধে থাকে। তাই চক্রবর্তী পরিবারে চলে সহ-অবস্থানের জীবন। চলে মিশ্র রীতিনীতি।

শ্রীদামের পরিবার রক্ষণশীলতার ধারাকেই কামড়ে আঁকড়ে ধরে

আছে। শ্রীদাম ফতুয়াখানা গায়ে কদাচিৎ আটকায়। উদোম থাকতেই ভালবাসে। ওর স্ত্রী রসিকতা করে বলেন, চক্ষু লজ্জা বলে বস্তুটা না থাকলে তুমি বোধ হয় পুরোপুরি 'উদোম' হয়েই থাকতে।

হ্যাঁ—এ্যাঁ—এ্যাঁ যা বলেছো মন্দা—। ঢাকাঢুকির ধার ধারিনি আমি। খোলাখুলি সব জিনিস করে বেড়াই। এতে কোন রকমের চক্ষুলজ্জা-টজ্জা নেই আমার।—টাকার দরকার নাও। গয়না রাখ। দোবো আধা-টাকা। কড়ার থাকবে। কড়ারের দিন শেষ—সব ফাঁকা। টাকা লাগবে নাও—রাখ জমি। মেয়াদ থাকবে। মেয়াদ শেষ। জমি আমার। শর্তে রাজি? এসো। রাজি নয় পাশ কাটাও। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এ্যাঁ—

স্ত্রী রসিয়ে রসিয়ে বলে, আমার কড়ারই বলো আর মেয়াদই বলো কতদিন মশাই?

ওই যতদিন রূপ-যৌবন আছে ততদিন।

তার পর?

ব্যাস। হ্যাঁ—হ্যাঁ—এ্যাঁ—

বিবির বাজারের লোহার গরাদ সাঁটা উঁচু থামঅলা শ্রীদামের দোকানখানা অনেক ভাগে ভাগ করা। কিছুটা মুদিখানা। কিছুটায় থাকে কাপড় চোপড়। কিছুটা বন্দকী লেনদেনের গদী। পিছনে অন্ধকারের মাল রাখার জায়গা। এছাড়া বিরাট বিরাট চালের আর নারকেলের গুদাম ঘর। ওখানে সাপের মাথার মানিক আঁধারে জ্বলে।

এই তল্লাটের কৃষক, ক্ষেতমজুর, মৎসজীবী মানুষ দায়-বিপদে পড়লেই বলে, যাই ছিদাম মুদির কাছে, নাহলে তো উপায় নেই। শুধু দায়-বিপদ কেন, প্রাত্যহিক জীবন যাদের জোড়াতালি দিয়ে চলে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে তাদের ছিদাম-মুদির কাছে আসতেই হয়। থালা, ঘটি, বালা, মাকড়ি, তোড়া, বটফল নিয়ে শ্রীদামের গদির কাছে বসে সবাই। নিজ হাতে মেপে-কষে, নাড়াচাড়া করে তবে দেবার-

টাকা ঠিক করে দেয় শ্রীদাম। রোকায় লিখে দেয় কত টাকা দিতে হবে। বড় খাতায় উঠে যায় তাঁর নির্দেশ। জিনিসপত্রের ওপর আঠা দিয়ে নাম ইত্যাদির শ্লিপ সাঁটা হয়। অন্ধকার ঘরে চলে যায় মাল। তারপর টাকা আসে।

বৎসরে একবার গুদাম-সাফাই হয় অর্থাৎ মেয়াদের শেষ অব্দি যারা টাকাকড়ি যোগাড় করতে পারে না, বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তাদের মাল।

বিবির জাঙালের রাস্তা দিয়ে হেলে ত্বলে পিতলকাঁসা তামার জিনিসপত্র নিয়ে চলে গরুর গাড়ি। সামনের সদর রাস্তা পর্যন্ত। পথের দুপাশে অজস্র মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বুক চাপড়ায়।

জমির মেয়াদ শেষ হয়। চক্রবর্তীর খাস দখলে আসে জমি। না হয় তিনগুন চারগুন দামে বিক্রি হয়ে যায়। এখানেও দীর্ঘশ্বাসের পালা।

মানুষের দীর্ঘশ্বাস কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে ওঠে। বও দেখে চিমনীর ধোঁয়াকে বোঝা যায় কিন্তু দেখা যায় না সমবেত মানুষের দীর্ঘশ্বাসের কুণ্ডলীকে।

বিবির নামে তৈরি জাঙাল, নাম—বিবির জাঙাল। কিন্তু কে এই বিবি? নাম জানতে খুব বেশী দূরে যাবার দরকার নেই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তনের কিছু পরের কথা। রায়নগরের ঘাটে পালের নৌকো বাঁধা। একটা নয়। একাধিক. রায়নগরের ঘাটে নীলকর সাহেবদের কুঠি। ঝাউ আর দেওদারু গাছের সারি। গাছে গাছে বাঁধা নানা রঙের ঘোড়া। চওড়া বিবির জাঙাল-রাস্তা। পাশাপাশি পাঁচটা ঘোড়া ছুটতে পারবে অক্লেশে। রাস্তাটা গিয়ে মিশে যায় একটা বিরাট বাগানে। নাম হোম সাহেবের বাগান। হোমের নাম অনুসারেই এই বাগানের নামকরণ হয়।

এর আগে ১৭৫৭ সালের কথা। এই পথ দিয়ে নৌসেনাধ্যক্ষ ওয়াটসন সৈন্য নিয়ে কোলকাতার দিকে যায়। ডায়মণ্ডহারবার,

ফলতা, বজবজের ওপর দিয়ে। জানুয়ারী মাসে। এছাড়া এরপরে স্থানীয় ইতিহাসে মারপিট, অত্যাচার, কৃষক-নিগ্রহ ইত্যাদি থাকলেও শেষের দিকে হোমসাহেবের মনের কোণায় কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে ভীষণ দুর্বলতা। কিংবা হয়তো আসল মানুষটা বর্মের মাঝ থেকে বেরিয়ে এসেছে। চক্রবর্তী বাড়ির অতীব রূপসী মেয়ে কাঞ্চনকে একদিন ঘাটের পথে দেখতে পায় হোমসাহেব। সেদিন মাঠ পেরিয়ে চক্রবর্তী বাড়ির খিড়কীর ধার দিয়ে আসছিল তার ঘোড়া। রূপ দেখে ঘোড়া থেমে যায় কিছুক্ষণের জন্য। তারপর আবার ছুটে চলে।

ভাগীরথী-তীরে কুঠিতে এসে হোমসাহেব জিজ্ঞাসা করেন মোসাহেবদের, ও বাড়ির কে এমন সুন্দরী আছে?

জবাব আসে গোকুলের কাছ থেকে, ও আর কেউ নয় সায়েব, ও নিশ্চয় পোড়ারমুখী কাঞ্চন। পরে সাহেবকে বুঝিয়ে বলে বিধবা মেয়ে কাঞ্চনের কথা।

কাঞ্চনের বিয়ে হয়েছিল কুলীন-ঘরে এক আশী বছরের বুড়োর সঙ্গে। বছর না ঘুরতেই তার জান-কাবার। সেই থেকে মেয়েটা বিধবা।

ওর আর বিয়ে হবে না?

না সাহেব। হিন্দুদের হোতে নেই।

কেন?

এক স্বামী মারা গেলে—আর স্বামী হয় না।

সে তো বুড়ো ছিল?

তা হলেও।

ফোড়ন কাটে নটবর, কাঞ্চন স্বামীর বাড়ি থাকলে, এক চিতেয় তুলে দফা সেরে দিত। অমন রূপের হাট আর বসাতে হোত না।

হ্যাঁ। দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হোম সাহেব।

এর কিছুদিন পরেই কাঞ্চন চলে আসে কুঠিবাড়িতে। কি ভাবে? সে বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে এটা শোনা গেছে, হোম

সাহেব কাঞ্চনের উপর কোন দিন জোর খাটায় না। হাসতে হাসতে কাঞ্চনকে নাকি বলতো, এমন গোলাপ আমি জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেবো না। তুমি সব বুঝে, সব জেনে, যেদিন মত দেবে সেদিন আমি তোমায় নোবো, না হলে ছেড়ে দোবো—আটকে রাখবো না।

এখন তোমার শক্ত খাঁচায় আটকা পড়ে গেছি সাহেব। পালাবার পথ নেই। বাইরে গেলে, আর আমায় কেউ নেবে না। তাই তুমি ছেড়ে দিলেও আমার পাখনায় ওড়বার ক্ষমতা আর নেই। এ সব জেনেই আমায় উপহাস করছো তুমি।

উপহাস---? না—না। আমি তোমায় উপহাস করতে পারি না। কারণ আমি তোমায় ভালবাসতে চাই। প্রাণ ভরে ভালবাসতে চাই। পৃথিবীতে যা কিছু সুন্দর তাকেই যে মন ভালবাসতে চায়। তাই আমিও—

ভালবাসতে চাও?

হ্যাঁ। আমার মনের আনন্দ দিয়ে তোমার মনের মাঝে হাসি ফুটিয়ে তুলে তোমায় ভালবাসতে চাই। বিশ্বাস করো, চাপ দিয়ে, জবরদস্তি করে- সে ভালবাসা দুনিয়ায় পাওয়া যায় না।

কাঞ্চন তাকায় হোম সাহেবের দিকে।

হোম বলে, দেশ ছেড়ে এখানে এসে হাতে যে ছড়ি নিয়েছি তাতো রুটি-রুজি রোজগারের জন্যে। মনিবের হুকুম তামিল করার জন্যে। মনটা এতে মাঝে মাঝে কেঁদে কেঁদে ওঠে। বিশ্বাস করো রুটিরুজির চাপে সবার মনই কিন্তু চাপা পড়ে যায় না।

বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে কাঞ্চন। বলে, তুমি এমন বাংলা শিখলে কোথা থেকে সাহেব।

তোমারি বাংলায় বসে শিখেছি। কোলকাতায় কলেজ হয়েছে। শুধু অফিসার আর জজ-মাজিষ্ট্রেটই তৈরি হচ্ছে না সেখানে আমাদের মতো ঠ্যাঙাড়ে পার্টিও তৈরি হচ্ছে। মানুষ ঠেঙিয়ে রস নিংড়ে নেবার জন্যে তাদেরও তো ভাষাটা শেখাতে হচ্ছে।

কথা শেষ হয় না। কাঞ্চন বলে, তোমরা ঠ্যাঙাড়ে, চোর, ডাকাত, ছ্যাঁচড়া, জন্তু-জানোয়ারেরও অধম না হলে আমার মত অসহায় মেয়েকে অমন করে ধরে আনতে না।

আমরা খারাপ —একথা মানবো না আমি। আমি খারাপ হতে পারি। তুমি দেখতে পাবে কিনা জানি না কাঞ্চন কিন্তু আগামী দিনে দেখবে আমাদের মধ্যেও অনেক ভাল মানুষ আছে। আসলে মানুষ মানুষ তো মানুষই —। অন্য কিছু নয়।···তোমার দেশের মানুষও সব ভাল নয়। তাদের একদল অর্থের লোভে তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। তোমার সম্পত্তির লোভে একদল তোমাকে অনেক দিন আগে থেকে বিপদে ঠেলে দিতে চেয়েছে তা তুমি জান। সম্পত্তির লোভে এদেশে অনেক জায়গায় মেয়েদের পুড়িয়ে মারা হয়।

সেইভাবে চলে গেলেই বাঁচতুম —

ওভাবে বাঁচা বাঁচা নয় কাঞ্চন। যারা তোমার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছে তাদের ওপর তলোয়ার চালিয়ে বাঁচো।

যতদিন স্বেচ্ছায় না ধরা দিয়েছে, ততদিন কাঞ্চনের ধারে কাছে যায় না হোম সাহেব। দূর থেকে শুধু বলেছে, 'তুমি কাঞ্চন নয়—তুমি গোলাপ।'

শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন বলেছে, শয়তান নয় একজন মানুষের কাছে ধরা দিয়ে আজ আমি খুশি। আমি কেমন যেন হারিয়ে গেছি। আগে ঘরে বাইরে শয়তানের ভয়ে ভয়ে আমার দিন কাটত—এখন আমি নিশ্চিন্ত। এখন কাঞ্চন আবিষ্কার করে মানুষের বাইরেকার খোলসটা নেহাৎ বাইরের একটা আবরণ: ভিতরে থাকে সমৃদ্ধশালী মন। আসল মানুষ।

সেই কাঞ্চন বিবির নামে রাস্তার নাম বিবির-জাঙাল। মাটি জোগাতে খাল চওড়া হয়ে গেছে। নদীর সাথে যুক্ত হয়ে জোয়ার ভাঁটার অংশীদার। শালতি চলে খালের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত।

এই খালের ধারে আগেকার বিবির হাট, এখনকার বিবির বাজার। বিবির নামে তৈরী করে যান হোম সাহেব। সুবিস্তৃত খোলা মেলা পরিবেশে। বটগাছটি বহু প্রাচীন। সাহেব বসেন এর ছায়ায়। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

কাঞ্চন বাবার কাছে কিছু শিখেছিল; শেষের দিকে যে শিক্ষাগুলো পেয়েছিল সেগুলিই যে জীবন সঙ্গী হবে তা কোনদিন ভাবতেও পারেনি। বাবা হিমাদ্রি শেখর সাদা দাড়ি-গোঁফ, বলিষ্ঠ দৃষ্টি সম্পন্ন বৃদ্ধ বলতেন, এ জগৎ ব্রহ্মময়। ব্রহ্মের আশীর্বাদে জীব-জগৎ প্রাণ চঞ্চল—লীলাময়। পরম ব্রহ্মের অংশ সবার মধ্যে। তাই কেউ ছোট—কেউ বড় নেই এই জগৎ সংসারে। কাউকে ছোট করে দেখার অর্থ—স্বয়ং ব্রহ্মাকে ছোট করে দেখা। সে স্পর্দ্ধা যেন মানুষের না হয়। তাহলে পতন অনিবার্য।

কাঞ্চন প্রথমের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ছোট করে দেখতো না হোমকে। হোম সাহেব কাঞ্চনের মর্যাদা রক্ষা করে একাদশীর দিনে ব্রাহ্মণ দিয়ে ফল মিষ্টি পর্যন্ত আনিয়ে দিত। কাঞ্চনের পরিচর্যার জন্য ছিল উপযুক্ত লোকজন। যদিচ বাজারে রটে গিয়েছিল ফিরিঙ্গিতে গিলে নিয়েছে কাঞ্চনকে।

শেষ পর্যন্ত কাঞ্চন আর দূরে থাকতে চায় না। হোম সাহেবের মধ্যে এক জ্বলন্ত পুরুষকে দেখতে পায়। যে পুরুষকে শ্রদ্ধা করা যায়। একদিন তার মুখ দিয়ে বার হয়ে আসে, ছুঁচোর কেত্তনের মধ্যে জান হাঁই-পাঁই করছিল—এখন বিরাট জগৎ—বিরাট আকাশ দেখতে পাচ্ছি।

কথা শুনে হাসে হোম সাহেব।

কাঞ্চন বলে যায়, এই বিরাট আকাশের নিচে ছোট কেউ নেই। শুধু ক্ষুদ্র স্বার্থের দাসত্ব করতে গিয়ে আমরা নীচ ক্ষুদ্র হয়ে যাই। সেই একাদশী থেকে কাঞ্চন আর বাইরে থেকে ফল মিষ্টি আনতে দেয় না। এতদিন যাকে শৃঙ্খল বলে মনে হতো—তাকে মনে করে মুক্তির পথ।

কিছুদিন পরে গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করে আসে তারা।

এখন পাল্কি চড়ে রাস্তায় বার হয় মাঝে মধ্যে। জমি-জমা কিনে বিরাট চৌহদ্দি নিয়ে বাড়ি তৈরি করে। কাঞ্চন বিবি পাল্কি চড়ে জমি জমার বিরোধ মেটাতে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায়। সাহেব এতে খুশি। ছোট খামার বাড়ি। বিকালে একসঙ্গে বসে গল্প করে। একটি ছেলে আর একটি মেয়েও আসে তাদের জীবনে।

চক্রান্তকারীর দল স্তব্ধ হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এর মধ্যেও স্তাবকতা যাদের পেশা কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করতে আসে। কাঞ্চন দৃপ্ত কণ্ঠে বলে, যাও গোবর জল খাও গে। জাত চলে গেছে। না। আর বেশী সময় নয়। প্রায়শ্চিত্তের অনেক কড়ি গুনতে হবে।

শেষ পর্যন্ত কাঞ্চনের প্রতিষ্ঠা এই অঞ্চলে প্রতিদিনকার আলোচ্য সূচী হয়ে ওঠে। পাল্কি চেপে কালী মন্দিরে পূজো দিতে আসে কাঞ্চন। সঙ্গে আসে সাহেব। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে দেখা যায় কাঞ্চনকে। অনেক লোকজন উৎসব-অনুষ্ঠানে আসে শুধুমাত্র এদের দেখার জন্যে। লাল পাড় শাড়ি পরা কাঞ্চন শেষ পর্যন্ত হোম সাহেবকেও ধূতি আর হাফ-পাঞ্জাবী রপ্ত করিয়েছিল। শুধু তাই নয় ভালবাসার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে হোমসাহেব শেষ অব্দি নাকি হিন্দুধর্ম পর্যন্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু হিন্দুরা তা মেনে নেয় না।

কাঞ্চন জীবনের শেষ পর্যায়ে গরীব গ্রামবাসীদের উদার হাতে সাহায্য দেওয়া শুরু করে। ছেলে মেয়ে দু'জনেই তখন কোলকাতায় চাকরি করে। মাকে সম্মান করে দেবীর মত। হোম সাহেব বলেন, ভাগীরথীর তীরেই তিনি দেহ রাখবেন। তাকে পোড়ানোই হোক আর কবরই দেওয়া হোক তা এখানেই হবে। তার ইচ্ছা লিখিত ভাবেই পাওয়া যায়।

হোমের মৃত্যুর পর ছেলেমেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করে, বাবার সৎকার ব্যাপারে।

মা বলে, কবর হবে। ওর অনেক আত্মীয়স্বজন এসেছেন। তাঁদের মর্যাদা দিতে হবে। আমি মলেও ওর পাশে কবর দিস। চোখের জলের মধ্যে, কথাগুলির উৎস সবাই দেখতে পায়। এক পবিত্র স্রোতস্বিনী থেকে যেন তা উপচে পড়ে।

বিবির হাটের এককোণে, ছোট্ট বাগানখানায় কবর দেওয়া হয় হোম সাহেবের। প্রতিদিন যেখানে অজস্র গোলাপ পাপড়ি আর কাঞ্চন ফুল ঝরে পড়ে। হোম সাহেবের ইচ্ছায় ছোট্ট একটি গীতিকবিতার মত এই স্থানটি গড়ে উঠেছিল তিলে তিলে হৃদয়ের রস সিঞ্চনে। আজো তা সাধারণ মানুষের কাছে 'সাহেব-পোতা' ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রীদাম চক্রবর্তীর পূর্বপুরুষেরা সম্পত্তির লোভে জেনে শুনেই কাঞ্চনকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল ঘুর্ণিঝড়ে। সেই আবর্ত থেকে বার হয়ে আসে কাঞ্চন। রক্তের কণায় কণায় যে সংস্কার এতদিন শক্তির মহাস্তম্ভ সৃষ্টির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল, উদার এক আদর্শবাদ সেই সংস্কারের বাধাকে ভেঙে চুরমার করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত এলাকার ঘরোয়া জীবনের সুখ দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে যায় কাঞ্চন। সে আজকাল অবাধে বলে যায় জ্ঞাতিদের কুকীর্তির কথা। তার বাবা নিরীহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে হেনস্থা করার জন্য চক্রান্ত যে কি জঘন্য হতে পারে, তা বর্ণনা করে সবার কাছে। হাসতে হাসতে বলে, আমার রূপটা কাল হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়েছে তলোয়ার। বুদ্ধির একটু এদিক ওদিক হলেই শেষ হয়ে যেতে হতো। মানুষকে ছোট ভাবিনি। তাই বেঁচে গেছি।

শ্রীদাম বাড়ির ভেতর গোপনে টুকিটাকি কি সব সেরে বিবির জাঙাল ধরে এগিয়ে চলে বিবির হাটের দিকে। পুরাতন দিনের প্রায় সব কথাই তার জানা। আজো কাঞ্চনের বংশের ছেলেমেয়েরা হোম সাহেব আর কাঞ্চনের মৃত্যুদিনে সাহেবপোতায় আসে। ফুলের

তোড়া দিয়ে যায় শ্রদ্ধাভরে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায় শ্রীদাম।

॥ ৭ ॥

শ্রীমন্ত হুঁকোয় কয়েকটা টান দিয়ে সুখটান দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় হাঁকাহাঁকি শুরু হয়ে যায় বাড়ির সামনে।

ছিমন্ত আছো —ছিমন্ত—

কে— ?

দপ্পণ—দপ্পণ রায় ডাকচি—

সুখটান আর দেওয়া হল না। বাইরে বার হয়ে আসে শ্রীমন্ত।

খড়ের ছাওয়া হুমড়ি-খাওয়া ঘরখানার সামনে একটা ক্ষতবিক্ষত মাথা-ফাঁকা দেয়াল। আগামী বর্ষাতেই শুয়ে পড়ার মত অবস্থা। গত বর্ষায় কিছুটা ধসেছে। দেয়ালের খাড়া অংশ জুড়ে 'ম্যালোয়ারি' আর 'তেলাকুচো' লতা হরদম জন্মেছে। আগড়-বিহীন দরজায় একটা ছেঁড়া চট টাঙানো। চট সরিয়ে বাইরে আসে শ্রীমন্ত। আসার সময় হাতে নিয়ে আসে ছোট্ট একটা চৌকি আর একটা আসন। চৌকি পেতে তাতে আসন বিছিয়ে দিয়ে বেশ কয়েক বার ধুলো ঝাড়ার চেষ্টা করে বলে, বসতে আজ্ঞা হোক।

না না বসতে নয়, কালক্ষেপ করতে নয়, সোজা কথায় বলি, দিনটা জানতে এলুম, কবে দিচ্ছ

এই দিচ্চি—

কবে ?

কবে··· ?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—কবে ? দৃঢ়তার সঙ্গে বলে দর্পণ রায়।

আর মাস পাঁচেক যদি দয়া করে সময় দেন—

না না। আবদার অনুরোধ এখানে নেই—। এখানে আইন।

চুলচেরা হিসেব। একটু এদিক-ওদিক হবার জো নেই। আজ সন্দেবেলা দেখা কোরো ছিদামবাবুর সঙ্গে—

যদি দয়া করে—

দয়া কত্তে হয় উনি করবেন। খোদ কত্তা। আমি কে? কোন্ হরিদাস পাল। আমি ছোটখাট একটা দপ্পণ মাত্তর। তোমার চেহারাটা যা দেখচি হুবহু মানে অবিকল কত্তাবাবুর কাচে পাঠিয়ে দুবো মাত্তর। এই কত্তেই আমার চাকরি—

অন্নপূর্ণা আর তার পিছনে পদ্ম ঘাড় হেঁট করে শুনে যায় কথাগুলো। এর ফল যে কি হতে পারে তা তারা জানে। বাবাঃ! টাকার জন্যে নিজের বংশের মেয়েকে যারা ফিরিঙ্গির হাতে বেচে দেয় তাদের মধ্যে আবার দয়ামায়া বলে কিছু আছে নাকি?···তবে বাপের বেটি ছিল কাঞ্চন বামনী। মুখে মেরেছিল আধোয়া ঝাঁটা। ঠিক করেছিল। 'ভগবান তুমি থানে থাকলে কানে শুন, চোখে দেখ—' আবাগীর ব্যাটা আমাদের সব্বোনাশ করতে উঠে পড়ে নেগেচে। শেষের কথাগুলো জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করে অন্নপূর্ণা।

তোর মাগের গলা বুজি। বা—বা—বাঃ—এমন মধু-মাখা কণ্ঠ না হলে আর কার হবে। যাচ্ছি—। বাবুকে বোলব্যাখুন সব কথা গুছিয়ে। তারপর তিনি কোন ফুলে-চন্দনে মা অন্নপুণ্যোর পূজো কত্তে চান করবেন এখন। কথার শেষে বিশেষ একটা ভঙ্গি করে দর্পণ।

শ্রীমন্ত একবার বাড়ির দিকে তাকায়—একবার কাতর স্বরে অনুরোধ জানায় দর্পণকে। দর্পণ সমানে চিৎকার করতে থাকে। যাচ্চি সবই বলবো—

মাথায় পাকা আধ-পাকা বাবরি চুল। নরম দু-চোখের চাউনি নিয়ে বার বার শুধু হাত জোড় করে শ্রীমন্ত। এমন কত জোড়হাত, কাতর প্রার্থনা, চোখের জল, দীর্ঘশ্বাস দেখেছে দর্পণ। দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেছে, কিন্তু এসব মনের মধ্যে এতটুকু আঁচড় কাটে নি।

কসাইয়ের হাত নির্বিবাদে যেমন আপন কাজ করে যায়, যন্ত্রের মত সেও তেমনি আপন কাজ চালিয়ে যায়। সে অবশ্য শ্রীদাম চক্রবর্তীর যন্ত্র। মালিকের হুকুম তামিল করতে করতে মালিক আর কর্মচারীর মন কখন একাকার হয়ে গেছে। সে হদিশ রাখে না দর্পণ।

শ্রীমন্তর বাড়ির সামনে থেকে পাড়া কাঁপাতে কাঁপাতে এগিয়ে চলে দর্পণ। বাবাঃ—সে কি কিছু কম জানে। আসল জানা তার হয়ে গেছে অনেক আগেই, যা পারো শক্ত মুঠোয় ধরো। দড়িদড়া দিয়ে বাঁধো। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসো আপন আয়ত্বের মধ্যে। তবেই তো মা লক্ষ্মী পা ফেলে ফেলে সদর দরজার প্রবেশ পথ দিয়ে —অন্দর মহলে লোহার সিন্দুকে এসে ঢুকবেন। বাঁধা পড়ে যাবেন। হা—হা—হা—

মনে পড়ে লীগ আমলের দুর্ভিক্ষের কথা। চাল নেই কিন্তু চাল আছে। একসের চালের দাম একটাকা হিসাবে দাও, তাহলে আছে। আগে টাকা দিয়ে যাও। গামছা রেখে যাও। রেখে যাও বস্তা। মাল যাবে রাতের অন্ধকারে পেঁচা-ডাকা ঘুটঘুটে অন্ধকারে। আহাঃ! ঐ সময় ব্যবসা না চললে কি লক্ষ্মীশ্রী বাড়ে।

রেশন দোকানের শুরু হলো। টিনের কৌটো দিয়ে চাল-মাপা। কায়দা করে কত কম দেওয়া যায়, তার প্রতিযোগিতা চলে দর্পণের সঙ্গে তিনজন কর্মচারীর মধ্যে। শেষ পর্যন্ত 'সাবাস' আখ্যাটা জুটে যায় দর্পণের ভাগ্যে। তাই গোল গোল ডাবরা-চোখো, গাঁট্রাগুঁট্টি দর্পণ বয়সের ভারে আজো ন্যুব্জ নয়। রীতিমতো জোয়ান। চুল একটাও পাকে নি। পুরু-ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে তার বাক্যি শোনালে মৃত দেহও কবর থেকে উঠে আসবে।

এই সময়ে দর্পণের আরো একটা উপস্থিত বুদ্ধিকে তারিফ করেছিল শ্রীদাম। সকাল থেকে দলে দলে ছুটে আসে মানুষ নামধারী একদল জীব। বিবিরহাটের বিরাট-চত্বরে বটের-ছায়ায় সানকি-ডিস-মগ-সরা হাতে বসে থাকে। মাথায় একরাশ রুক্ষ

চুলের বোঝা। উকুন গিজ-গিজ করে। নাকি-সুরে কথা বেরোয় সবার মুখ দিয়ে। পথের ধুলোয় একটুকরো শস্যকণা পড়ে থাকলে খুঁটে খায়। কাজে-কর্মে আবর্জনা ভরা আস্তাকুড়ে এঁটো-পাতা পড়লে কুকুরের সঙ্গে লড়াই চলে। লড়াই চলে অপেক্ষাকৃত সবলে দুর্বলে। হাড় জিরজিরে মানুষগুলোর দুচোখ দিয়ে তখন ক্ষুধার দগ্‌দগে আগুন বেরিয়ে আসে। খাবার পাবার জিদে বাঁশের খেঁটে, ইটের টুক্‌রো, যা সাম্‌নে পায়—তা দিয়েই প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করে। ফ্যাকাশে শরীরেও ক্ষীণ রক্তের রেখা দেখা দেয়। তবু স্তব্ধ হয় না ক্ষুধার লড়াই। বাবু সাহেবরা ওপরে ওপরে চোখ বুলিয়ে বলে, ছ্যাখো—ছ্যাখো—মানুষ জানোয়ারের সামিল হয়ে গেছে—

লঙ্গরখানায় সকাল থেকে কড়া কড়া খিচুড়ী তৈরি হয়। নামেই খিচুড়ী। অল্প কিছু দানাশস্য সামান্য ডাল অথবা কলাই আর গাদা-গাদা গাছ-পাতা একসঙ্গে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করা মাত্র। বিবর্ণ—তরল। এই বস্তু পাবার জন্য কাড়াকাড়ি। ধ্বস্তাধ্বস্তি। মারামারি। রক্তারক্তি। তখন থেকেই লাইন বা কিউ শব্দগুলির ব্যাপক প্রচলন শুরু হলো। কার্ড তৈরি হলো। কার্ডে সই মারো। ডাবু তোল। বেশীর ভাগ লোকজন খাবার পেয়েই ঠোঁট ঠেকায়। তরল খাদ্যই যেন অমৃত। খাবার আগে পাবার জন্যে হিন্দু মুসলমানের সান্‌কির লড়াই। কে আগে পাবে।

বুকের ওপর মোটা শুভ্র উপবীত দুলিয়ে শ্রীদাম বলে, হায় হায় —জাত কুল সব গেল—

যারা জাত গড়েছিল তারাই ভাঙছে বাবু। আমাদের করার কি আছে বলুন?···কোটরের মধ্য থেকে তীরের ফলার মত দৃষ্টি এসে শ্রীদামকে বিদ্ধ করে যেন। এর সামনে বেশীক্ষণ স্থির থাকা আদৌ সম্ভব নয়।

বোঁচা সাঁত বেশ কথা বলে তো! স্বগতোক্তি করে শ্রীদাম।

চোখের এই ধরনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তন্ন তন্ন করে দুনিয়ার সব কিছু

খুঁজে বেড়ায়। বুকের মধ্যে বাঁখারির-খাঁচার মধ্যে যে যন্ত্রটা ধুকধুক করে এই ঘোর ছুর্দিনেও বাঁচার আশ্বাস দেয়। অনাবিষ্কৃত একটি পথের সন্ধানে মরিয়া হয়ে হাঁটে একপাল মানুষ। তাদের কোমরের ট্যানা কোনা রকমে মান-সম্ভ্রম বাঁচিয়ে রাখে। যাদের কাপড়ের টুকরোটুকু পর্যন্ত নেই, উলঙ্গ সেই মানুষগুলো লুকিয়ে থাকে কুঁড়ের মধ্যে। ক্ষুধার যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্তে তাদের জীবন-প্রদীপের ওপর নিষ্ঠুর ফুৎকার দিয়ে যায়। হাপিত্যেশ হয়ে থাকে তারা, যদি প্রিয়জনের হৃদয়ে এতটুকু নবন পদার্থ থাকে।

শ্রীদাম খড়ম পায়ে লাইনের ধার দিয়ে ঘুরে আবার বোঁচা সাঁতের সামনাসামনি হয়। বোঁচা বলে, কিছু বস্তর-টস্তরের ব্যবস্থা হচ্ছে নাকি ? শুনলুম যেন—

কথাটা শোনামাত্র শ্রীদামের মনে হয় বুকটায় কে যেন সজোরে কয়েক ঘা হাতুড়ি পেটায়। নিষ্ঠুরভাবে।

কথাটা রাষ্ট্র হয়ে পড়লো কি ভাবে ? ছু'দিন আগে এক সাহেব আসে বিবির হাটে। তার মেমসাহেবকে নিয়ে। হোম সাহেবের সমাধিতে অর্থাৎ 'সাহেব-পোতায়' অনেকগুলি দামীদামী ফুলের তোড়া রাখে। মাঝে মাঝে সাহেবরা আসে এখানে। বিশেষ করে হোম সাহেবের আত্মীয়স্বজন। সমাধির ওপর মাল্যদান ইত্যাদি কাজ সেরে আবার চলে যায়।

সেদিন কিন্তু সাহেব-মেম সমাধিতে মালা দেবার কাজ সেরে অন্যান্য দিনের মত গাড়ির কাছে চলে যায় না। কিছুক্ষণ দাঁড়ায় লঙ্গরখানার কাছে। খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে সব দেখে। কি সব বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে। কেমন একটা বিষণ্ণ ভাব দেখা যায় তাদের চোখে মুখে। তারা হৃতসর্বস্ব মানুষদের বেশ কয়েকখানা ছবি তুলে নেয়। শেষ পর্যন্ত ছু'জনে হেঁটে যায়, শ্রীদাম চক্রবর্তীর দোকানের সামনে। সাহেব বলে, এখানে এই খাওয়া-দাওয়া দেখার কর্তা কে ?

কেন ? আমি আছি সাহেব।

আপনার নাম ?

শ্রীদাম চক্রবর্তী—

ওঃ—হিমাদ্রি শেখর চক্রাবের্টি বলে—সাহেব মেম-সাহেবের দিকে তাকায়। মেম সাহেব ধীরে ধীরে আরো একটু আড়ষ্ঠ স্বরে উচ্চারণ করে, চক্রাবের্টি—ইয়েস। সাহেবের মুখে এমন বাংলা উচ্চারণ শ্রীদাম এর আগে কোনদিন শোনে না। তাই সে রীতিমত বিস্মিত হয়ে যায়। দীর্ঘ সময় সাহেব-মেমের সামনে দাঁড়িয়ে ঘেমেও যায়। পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, আসুন···বসুন—

নো-নো ক্যালক্যাটায় ফিরটে হবে। অনেক কাজ আছে। বলে হন্ হন্ করে সাহেব গাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ড্রাইভারকে নিয়ে আবার ফিরে আসে। শ্রীদামের দিকে তাকিয়ে বলে—মিঃ চক্রবর্তী পরশু এই লোক কিছু কাপড়-জামা-প্যান্ট আনবে। আপনাকে ডিয়ে যাবে। আপনি সেগুলি এই গরীব লোকেদের মধ্যে বিলি করে ডেবেন। এই কাজটুকু করে ডেবেন তো ?

হাঁ।

আচ্ছা নমস্কার। সাহেব-মেম দু'জনে শ্রীদামকে নমস্কার করে গাড়ির দিকে চলে যায়।

সেই কাপড় যথারীতি ট্রাক বোঝাই হয়ে আসে। শ্রীদাম বিশ্বাস করতে পারে না এত গাঁট কাপড-চোপড় এসে হাজির হয়ে যাবে। ড্রাইভার এসে খবর দেওয়ার সাথে সাথে কাপড়-চোপড়ের গাঁট উঠতে থাকে আড়তে। রাত্রিতে শ্রীদাম একবার দেখে নেয় গাঁট খুলে খুলে। না সব কাপড়-চোপড়ই বেশ ভাল। এবার শুধু বিলি করার পালা।

শ্রীদাম দর্পণের সঙ্গে বসে। এই বসার অর্থ কি দর্পণ আগে থেকেই বুঝে নেয়। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীদামের সারা মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে দর্পণ বলে, এটা নিয়ে আর ভাবা-ভাবির কি আছে। বেমালুম চেপে যান।

মানে।

একটাও বিলি করার দরকার নেই।

তা কি করে হবে দর্পণ—

কেন ?

ড্রাইভার তো আসবে।

আসুক না। মাল-টাল খাইয়ে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা। ব্যাস্।

যদি না খায়।

সাহেবের ড্রাইভার মাল খায় নে । হাসালেন আপনি।

এক টুকরো কাপড়ের অভাবে মানুষ যখন সৃষ্টির আদিম মানুষদের সমগোত্রীয় হয়ে জীবন-যাপন করছে তখন এই ধরনের নির্লজ্জ লোভ চক্রবর্তী পরিবারের উন্নতির সোপান সৃষ্টির পরিকল্পনায় সাহায্য করে।

কাপড় দেবার দিন সাহেব-মেম দু'জনেই এসে হাজির। বড় বিমর্ষ তাদের মুখ। আরো রটে যায় এরা হোম সাহেবের সাধারণ আত্মীয় নয়। নাতির ছেলে। শ্রীদামের বুকের রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে। তার ঠাকুর্দাই তো কাঞ্চনের বাবার সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। পরে সেটা তার সর্বনাশ না হয়ে, তার ঠাকুর্দার পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। বিবিজান মুখে ফুলঝুরি ঝরিয়ে সব কিছু ফাঁস করে দেয়—আর দরাজ হাতে দানছত্র খুলে বসে। সে সময় কি কম দুর্যোগ গেছে তার ঠাকুর্দার। বাবার কাছে শ্রীদাম এসব কাহিনী শুনেছে। এ তো সেদিনের কথা—কিন্তু আজ তার সব পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যেতে বসেছে যে।

সাহেব এসেই বলেন, কখন কাপড় বিলি হবে ?

একটু ঢোক গিলে শ্রীদাম বলে, এই যে এখুনি। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে শ্রীদাম একবার তাকায় দর্পণের দিকে। দর্পণ বলে, ঠিক আছে। দর্পণ ঠিক আছে বলতে শ্রীদাম যেন হাতে স্বর্গ পায়। তার অগাধ বিশ্বাস আছে দর্পণ নামধারী ব্যক্তিটির ওপর। অনেক খবরই সে

রাখে—কিন্তু ফাঁস করতে জানে না। নিমক হারাম নয়। নিমকের দাম কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দেয়।

আলকাতরার মত অন্ধকার রাতে গাঙ-ডাকাতি হয়ে যায়। দুনিয়ার কোন মানুষ কাকপক্ষী জানে না কোথায় কার গোলায় উঠবে মাল। দর্পণ জানে। ওষুধ-পত্র হালদার ডাক্তারের পেছনেব বড় গোডাউনে। চাল-ডাল শ্রীদাম চক্রবর্তীর ঘরে। অন্যকিছু মাল থাকলে বিবির হাটেই আসবে। তবে অন্য দোকানে। দীর্ঘদিন এসব কারবার তদ্বির করে চালিয়ে আসছে দর্পণ—তার মুখদর্পণে তার ছাপও আছে। কূটকৌশলে সে অদ্বিতীয়। শ্রীদাম চক্রবর্তী, বীরেন হালদার, ফটিক ঘোষ সেখানে কাঠের পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। আসল কলকব্জা চালায় দর্পণ। সেই দর্পণ সম্মতি জানালে শ্রীদামের আর বলার কি থাকতে পারে।

বটগাছের নিচে জলদি সামিয়ানা টাঙানো হয়ে যায়। টেবিল চেয়ার পড়ে। দর্পণ সাহেব মেমসাহেবকে গাড়ি থেকে সেখানে ডেকে আনে। ইতিমধ্যে প্রায় দশ বারোজন নাপিত বসে যায় জলের বাটি আর ক্ষুর নিয়ে। দর্পণ চেঁচায়। মাথা সাফ করে নাও। সাফ করেই সাহেবের সামনে এসো—কাপড় পাবে।

সাহেবকে গিয়ে বোঝায় মাথাগুলো বড় নোংরা হয়ে গেছে। খুব ভারিও হয়ে গেছে। ওটা সাফ করুক আর নতুন কাপড় পরুক।

সাহেব বলেন, কেন? এতো সব ঝামেলা?

ঝামেলা নয় সাহেব—হিসাবেরও সুবিধা।

কি রকম? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সাহেব।

একজন নেড়া মানে, একটা কাপড় চলে গেল। নেড়া আর কাপড় নিতে ফিরে আসবে না। চোখা হিসাব হয়ে যাবে। একজনের হাতে দুটো কাপড় চলে যাবে না এতে।

বোঁচা দাঁত হাড়সার মানুষদের দঙ্গল থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—কার্ড তো আছে--কার্ড—

বোঁচার কথা ঠেলা শক্ত। যুক্তি অকাট্য। তাই এ কথা শুনেও শোনে না দর্পণ।

এইসব কথা শুনে আর অবস্থা দেখে সাহেব কি যেন আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। শেষ পর্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, চালান দর্পণবাবু, আপনার ছক্‌টাই কাজে লাগান —

দুই পাটি দাঁতের অধিকাংশ বার করে লম্বা একটা সালাম ঠুকে দর্পণ চলে যায়। তার মনের কথাও যে তার মুখের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হতে পারে তাতো জানে না দর্পণ? জানলেও করার কিছু নেই। এই ভাবে চলায় অভ্যস্ত সে। জীবনের চাকাটাকে রাতারাতি তো আর অন্য ভাবে ঘোরানো যায় না। তাই দর্পণের মুখ-দর্পণে উদ্ভাসিত হয় তার কুৎসিত বাসনা-পুঞ্জ। এতে অবশ্য সে লজ্জা পায় না। লাভটা নিয়ে কথা!

প্রতিদিন নির্লজ্জভাবে পথ-পরিক্রমা কোনোদিন তাকে ভাবতে শেখায়নি আত্মসম্মান বা আত্মমর্যাদা জিনিসটা কি? এ বিষয়ে ভাবার জন্য এক মুহূর্তের জন্য হোঁচট-ঠোকর পর্যন্ত খায় না সে। মসৃণ পথে চলাহাঁটা করেছে। কোন কিছুই বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

আজ তাই তার-দেওয়া ছকটা সাহেব মেনে নেওয়ায় তার জীবনের মূল প্রবাহ অপ্রতিহত গতিতে চলতে থাকে। নিজের চালাকির প্রসংশায় নিজেই পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে এতদিনের রপ্ত-করা কৌশল-মাফিক অতিমাত্রায় সংযত হয়ে পথ হাঁটে সে। অতি ধীরে। মাঝে মাঝে মুচকি হাসে। তার ভাবটা বোধ হয়—এই ধরনের, কিস্তিমাৎ করে ছেড়েছি। এতদিন কবিরাজী করে এলুম, মকরধ্বজ কাকে বলে চিনি নি বাবা।

শ্রীদাম চক্রবর্তী বলে, ঠিক অছে ভাই—ঠিক আছে। যোগ্য ইনাম পাবে। ভাল কাজের ভাল দাম আছে দুনিয়ায়। আজকের দুনিয়ায় ভাল কাজের ভাল দাম আছে কিনা বলা অবশ্য বেশ শক্ত। অন্ততপক্ষে হাতে হাতে ভাল কাজের ফল তো মেলেই না। কিন্তু

দর্পণ জানে তার দাম মিলবেই। তার পাওনা না পাবার কথা সে ভাবতেই পারে না।

পরামাণিক পাড়ার অনেকেই ক্ষুর-কাঁচি জলের-বাটি নিয়ে বসে গেছে। নগত পয়সা কিছু কামিয়ে নেয়। বোঁচা সাঁত সমানে চেঁচাতে থাকে দূর থেকে, ই শালা চালাকি। শয়তানি।

অনেকের মুখে অনেক রকম কথা শুরু হয়ে যায়। মহা হৈ-চৈ।

কিছুক্ষণ থাকাব পর সাহেব-মেম বিমর্ষ মনে চলে যায়। মুচকি হাসে দর্পণ। দোকানের ভেতর থেকে একবার তীর্যক দৃষ্টিতে তাকায় শ্রীদাম।

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হয়। এতদিনের মন্ত্রপূতঃ 'পাশার' ঘুঁটিতে হাব হয় নাকি? ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি করে কাজ চালানোয় ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে আসে। বেশ কিছু কাপড়-জামা বাঁচিয়ে রাতের অন্ধকারে পাচার হয়ে যায়।

পরের দিন আবাব লোকজন এসে ভিড় করে বিরাট বট গাছটাব তলায়। বটবৃক্ষ অনেক মানুষকে ছায়ার আশ্রয় দিতে পারে মাত্র। আজ অসংখ্য পাতাব ইসারায় সে যেন জমায়েত লোকজনকে বলে দিতে চায়, অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাও তো আমার মত ডাল থেকে ঝুরি নামাও। সে ঝুরি পরে হয়ে যাক এক একটা কাণ্ড-স্তম্ভ বিশেষ। তোমাকে মাথায় করে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ছিন্নমূল জীবনের কোন দাম নেই।

যা হবার কাল হয়ে গেছে—আজ আর কাপড় নেই—হটো—হটো—। ঘোষক-দারোয়ানের অনুনাসিক স্বর, বিকৃত মুখখানার সঙ্গে একাকার হয়ে এক উৎকট অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বোঁচা সাঁত হো হো করে হাসে। বলে, এ আমি জানতুম।

সাহেব-মেম জানতেন শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা হবে। পরের দিন তিনি লোকজনসহ কাপড়-চোপড় নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আসেন। কারো সঙ্গে কোন কথা না বলেই শুরু করেন কাপড় দেয়া। প্রকাশ্যে

ঘোষণা করেন, কাঞ্চন দেবীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আছে। তাই এই দুর্দিনে সামান্য কটা লজ্জা ঢাকার জন্য কাপড়-চোপড় দিয়ে গেলেন। আগের ঘটনার কোন উল্লেখ পর্যন্ত করলেন না।

গুম হয়ে যায় শ্রীদাম চক্রবর্তী। শুধু একটি মাত্র কথা উচ্চারিত হয় তার মুখ দিয়ে—সাহেব একেই বলে। খেল দেখিয়ে দিলে।

দর্পণ জবাবে শুধু বলে, হুম্।

এর পরে আরো কাহিনী পাওয়া যায়। দর্পণের যোগ-সাজসে শ্রীদাম চক্রবর্তী লঙ্গরখানার মাল-মসলা সরাতে থাকে। শুধু মাল-মসলা সরিয়ে ক্ষান্ত হয় না। তার সর্বগ্রাসী লোভ গরীবের ক্ষুধার শেষ টুক্‌রো অন্নটুকুও আত্মসাৎ করতে চায়। বোঁচা দাঁত তা ধরে ফেলে লোকজন নিয়ে। চক্রবর্তী বাড়িতে যারা মজুর খাটছে তাদের টিফিন যাচ্ছে লঙ্গরখানা থেকে। ব্যাস, ধ্বস্তাধ্বস্তি। হৈ হুল্লোড়। চেঁচামেচি। শ্রীদাম চক্রবর্তীর কামিজ ছিঁড়ে ফাল ফাল হয়ে যায়। চটি জুতো কোথায় ছিটকে পড়ে।

পথ চলতে চলতে এখন বোঁচা দাঁতদের পা অনেকটা ঠিক-ঠিক ভাবে পড়ে। বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি পায়। তারা এখন এক-হয়ে প্রতিবাদ করতে চায়। মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করতে পারে না।

এই ধরনের মানুষ শ্রীদাম চক্রবর্তী আর তার সাকরেদ দর্পণ রায়। সেই স্বনামধন্য দর্পণ শ্রীমন্তর বাড়ী এসে তাগিদ দিয়ে যায়। আজো সমানে সে আপন কাজ চালিয়ে যায়। বিনা বাধায়।

পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের সময় থেকে দিনকাল অনেক পাল্টেছে। রাস্তা-ঘাটে পড়ে-থাকা মৃতদেহের স্তূপ ধীরে ধীরে সাফ হয়। আকাশে ঘন ঘন উড়োজাহাজ ওড়ে। বোমা পড়ে। যুদ্ধের আতঙ্ক ছড়ায় গ্রামে গ্রামে। বাঁচার তাগিদে মাটি খুঁড়ে গর্ত তৈরি হয়। তৈরি হয় ট্রেঞ্চ। মিলের কোয়ার্টারের সামনে মোটা কংক্রিটের অর্ধবৃত্তাকার জমান আস্তানা।

বিপদ সংকেতের কাটা-বাঁশি বাজে। শুনলে বুক ধড়ফড় করে।

কিছু পরে আবার বাজে বিপদ কেটে যাবার বাঁশি। কাটা-বাঁশি শুনলে যাও নিরাপদ স্থানে—গর্তে বা ধনী লোকদের মজবুত করে তৈরি-করা আস্তানায়। বিপদ মুক্তির সংকেত পেয়ে আবার ফিরে এসো জনজীবনে।

এই সময়ে লক্ষ্মী প্রাণভরে আশীর্বাদ করেছেন। তার বাহন কালপেঁচা রাতের অন্ধকারে নির্ভীক পদক্ষেপে ডাগর ডাগর চোখ মেলে ঘুরে বেড়িয়েছে। উল্লাসে মাঝে মাঝে তার মঙ্গল-সংগীত বেরিয়ে আসে দরাজ গলা থেকে। অশ্রাব্য হলেও তা শুনেও অনেকে কেয়াবাত কেয়াবাত করেছে।

কত কথা জনপদে ছড়িয়ে পড়ে। রেশন কার্ড, কণ্ট্রোল, কিউ, মিলিটারি, ব্লাক-আউট, ইত্যাদি।

শ্রীদাম চক্রবর্তীর সিন্দুকের পর সিন্দুক ভরে ওঠে। নাম ডাক হয়। কামিজ ছেঁড়ার কথা চাপা পড়ে যায় প্রভাব প্রতিপত্তিতে। তা ছাড়া তিনি নির্বাচিত হন ইউনিয়ান বোর্ডের সদস্য। সবাই সমীহ করে তাকে। তাই দোকানে ক্রেতা ছাড়াও একদল লোক আসে—বাবুর এতটুকু সময়ের জন্য অপেক্ষা করে। বাবুর ফুরসত হলেই তারা হাত জোড় করে দাঁড়ায়। পায়ের ধূলো নেয়। আপন আপন আর্জি পেশ করে।

এই সব আজ একেবারে রুক্ষ আলুনী নয়। শ্রীদামের ব্যবসা-রাজ্যের পরিধি বিস্তৃত করে এরা। দর্পণ বলে, এটা হোল আপনার সাম্রাজ্য বিস্তের। রাজমুকুটের জৌলুষ বাড়ে এতে।

একদিন সন্ধ্যায় শ্রীমন্ত বায়েন আসে। এ অঞ্চলে একডাকে তাকে প্রায় সবাই চেনে। কারণ আছে। শ্রীমন্ত ভাল ঢোল বাজাতে পারে। মুচির ছেলে। চামড়ার কাজের ওপর তার তেমন ইচ্ছা নেই ছেলেবেলা থেকেই। কিন্তু ঢোলে কাঠি লাগানো কাজে যথেষ্ট সুনাম আছে। বাবরি চুলের ছিমছাম মানুষটি যখন বুকে ঢোলখানা জড়িয়ে নানা অঙ্গভঙ্গি সহকারে মাটি থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে,

তখন কার না ভাল লাগে। তার ওপর সুন্দর বাজনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তার বাজনা পাগল করে দেয় মানুষকে। এছাড়াও আছে গান। একদিন এক কাণ্ড ঘটে যায়। শ্রীমন্তের অন্য এক প্রতিভা সবার সামনে ঝলমলিয়ে ওঠে। সেদিন তার ভাগ্যে জোটে ধুতি-উড়ুনী। নগত টাকা। হাতে তুলে দেন স্বয়ং উপেনবাবু। এই এলাকার একজন সমঝদার জমিদার।

॥ ৮ ॥

ঘটনাটা দীর্ঘদিন সবার মুখে মুখে এ তল্লাটে ঘোরা-ফেরা করে। দুর্গাপূজোর পর সে'বছর উপেন বাবুর সখ হয় তরজাগান গাওয়াবেন। গানের বিষয় পুরাণ বা অন্য কোন স্থান থেকে তিনি নির্ধারণ করে দেবেন, আগে থেকেই। সেই মত দুজন তরজাঅলার ওপর দায়িত্ব পড়ে। বজারের সেরা তরজা গাইয়ে রঙ্গলাল আর নটবরের ওপর। এলাকায় একটা হৈ হৈ ব্যাপার ঘটতে চলেছে। পথে-ঘাটে ঐ আলোচনা। গ্রাম ঝেঁটিয়ে মানুষ আসবে তরজা শুনতে।

নির্দিষ্ট দিন এসে দরজায় দাঁড়ায়। বিকালে ভাগীরথীর চরে এসে নৌকো থামে। উৎসুক কিছু যুবক আর মধ্যবয়স্ক মানুষ নেমে যায় নদীর চরে। অনেকে তরজার গাহকদের চেনে। শ্যামসুন্দর বলে, কই নটবর কই ?

রঙ্গলাল বলে, আসে নি। খুব জ্বর তার।

জুড়ী যোগাড় করোনি ?

পুজোর বাজার। কেউ খালি নেই।

হেঁট মাথায় সবাই তীরে এসে দাঁড়ায়। হেঁট মাথাতেই পথ হাঁটে। কারো মুখে কোন কথা নেই। হেঁট মাথাতেই তারা উপেন বাবুর সামনে এসে দাঁড়ায়। রঙ্গলাল হাতজোড় করে বলে সব কথা। একটা কথার জবাব দেয় না উপেনবাবু। তার সৌম্যকান্তি সুন্দর নধর

দেহ ভেদ করে কোন রুক্ষতা যেন আজ কোনক্রমেই বেরিয়ে আসতে চায় না।

এমন সময় হাত জোড় করে দূরত্ব বাঁচিয়ে আর একজনকে দেখা যায়। উপেনবাবুর দৃষ্টি শ্রীমন্তের দিকে যেতেই সে বলে, যদি অনুমতি দেন বলি।

বলো। উপেন বাবুর নির্বিকার কণ্ঠ।

আমি গাইবো। পালা ধরেই—

তুমি? বিস্ময়ে ফেটে পড়েন উপেনবাবু।

হ্যাঁ বাবু—আপনি আশীর্বাদ করুন।

রঙ্গলাল পর্যন্ত শিউরে শিউরে ওঠে। বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে আর যা হোক ফোচ্‌কেমি তো করা যায় না। সেই জিনিস করছে না তো লোকটা।

শ্রীমন্ত চোখ-মুখের ভাষা যথাসম্ভব সংযত করে সমস্ত মানুষজনকে আরো স্তম্ভিত করে দেয় তার পরবর্তী উক্তিতে—কোন্ পুরাণ থেকে গাইতে হবে হুজুর?

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ থেকে, ধীরে ধীরে বলেন উপেনবাবু।

তাহলে নিশ্চয় ব্রহ্মার সঙ্গে নারদের স্ত্রী বিষয়ের কথা নিয়ে? ঠিক ধরেছ। হাল্কা পাখির মত খল খল করে হেসে ওঠেন উপেনবাবু গম্ভীর এই মানুষটিকে কেউ এতোখানি সহজ সুরে কথা বলতে দেখে না কোনদিন। বিশেষ করে যাদের কাছে চিরটাকাল তিনি যমদণ্ড হাতে নিয়ে কথা বলতে অভ্যস্ত।

আজ সহজ সুরের কথাবার্তার সঙ্গে চেঁচামেচি করতে থাকেন তিনি। বলেন, নায়েববাবু—কি কি লাগে ওকে দিয়ে দিন। সন্ধ্যায় গানের আসরে পরার জন্য ধুতি, উড়ুনী না থাকলে যোগাড় করে দিন। ওর বাড়ির জন্যে আজ বড় সিধের ব্যবস্থা করে দিন। ভাল করে খেয়ে-দেয়ে যেন আসে। শ্রীমন্ত আজ আমার মান বাঁচাবে।

গোমস্তাবাবু দু'হাত ঘষতে ঘষতে বলেন, ও কি পারবে হুজুর?

পারবে না মানে—আলবৎ পারবে—তোমার মত আমতা আমতা করে কথা বললো ওকি? তুমি তো দেখলে? সোজাসুজি বিশ্বাস নিয়েই জোরের সঙ্গে ও কথা বললো, তাছাড়া আমার সামনে আজে-বাজে কথা বলার ক্ষমতা আছে ওর?

সে অবিশ্যি—অবিশ্যি—ঠিক কথা, বলে লেজ গুটিয়ে নেন ম্যানেজার বাবু।

শরতের সন্ধ্যায় মায়াময় হয়ে ওঠে দেবীর সামনে বিরাট মণ্ডপ-খানা। ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় শুভ্র থামগুলোর সারিতে জড়ানো সরকার বাবুদের আভিজাত্য। নির্বাচিত সময়ে উঁচু বিছানায় তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেন উপেনবাবু। তার মুখের দিকে তাকানো যায় না। দেবীর মুখের জৌলুস ছাপিয়ে তার মুখের জৌলুস ঝলসে ঝলসে ওঠে যেন। সবার চোখ তার দিকে। আজ কিন্তু আরো একদিকে অনেকের চোখ নিবদ্ধ। শুভ্রবস্ত্র শুভ্র-উত্তরীয় জড়ানো ছিমছিমে চেহারা বাবরি-চুল উন্নত কপালের নিচে তুটো ডাগর চোখ শ্রীমন্তর দিকে উপেনবাবুও তন্ময় হয়ে তাকান। ঢোলের আওয়াজের সঙ্গে কথার ফুলঝুরি! হাউইয়ের মত শ্রীমন্ত ঊর্ধ্বলোকে উঠে যায় আবার নিচে নেমে আসে। সবাই বিস্ময়ে লক্ষ্য করে শ্রীমন্ত তরজাঅলা নয়—শ্রীমন্ত কবি।

উপেনবাবু বিস্ময়ে লক্ষ্য করেন শ্রীমন্ত পুরাণের কয়েকটি লাইন হুবহু গেয়ে যায়:

বিদ্যাদাতা মন্ত্রদাতা এই তুইজন।
পিতা হতে শ্রেষ্ঠ হন শাস্ত্রের বচন॥

আবার গায়:

গন্ধর্ব কুলেতে জন্ম করিয়া গ্রহণ।
কত কষ্ট পাইয়াছ জান পদ্মাসন॥

শেষে উপেনবাবুর দিকে তাকিয়ে পুরাণের মসলা দিয়েই গায়:

(আপনার) পুত্র যদি নীচু পথে করয়ে গমন।

হিত উপদেশ তারে করুন অর্পণ ॥
তিন রূপ নারী আছে এ ভব সংসারে।
সাধ্বী, ভোগ্যা আর কুলটা তিন নাম ধরে ॥

সতী নারী কামবশে পতিসেবা করে। ভোগ্যা নারী বস্ত্র অলঙ্কার লাভের জন্য আর কুলটা কপটভাবে পতিসেবা করে। গান রীতি-মত তুঙ্গে ওঠে। শেষের দিকে ঢোলের বাজনার নৈপুণ্য দেখায় শ্রীমন্ত। বাজনা বন্ধ হলে অন্দর মহল থেকে অনুরোধ আসে—আর একবার বাজাতে হবে। আনত শরীরে সভাকে নমস্কার জানিয়ে আবার বাজাতে শুরু করে শ্রীমন্ত।

ভাল বিদায় হয় শ্রীমন্তর। প্রতিবছরই জমিদারবাড়িতে তার বাজনা-গান বাঁধা। শ্রীমন্তর শিল্পী-মনের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় জমিদারবাবুর এই উদারতায়। প্রতি বছর নতুন বিষয় নিয়ে নতুন ঢঙে গান তৈরি করে আর নিজের মিষ্টি গলায় তা পরিবেশন করে। তার নাম এ তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর আগে উপেনবাবু শ্রীমন্তকে ডাকান। গোমস্তা মারফৎ বলেন খালের ধারের বিঘে পাঁচেক জমি উপেনবাবু তাকে দেবেন।—নামমাত্র খাজনায়। সেলামী মাপ। এই উপহার তার গুণের জন্যে। সেই সময় জমিটা শ্রীমন্ত অন্নপূর্ণার নামে করিয়ে রাখে। উপেনবাবু এই প্রস্তাব শুনে খুশি হয়ে বলেন—ভাল—ভাল--খুব ভাল. কাজটা তাড়াতাড়ি করে দাও হে তোমরা—অন্নপূর্ণার নামেই করে দাও।

সবাই উপেনবাবুর জীবনের একটা নতুন দিক্ দেখতে পায়। বাংলা দেশের জমিদার। তার রক্তচোষা দিকটার আড়ালে শিল্প-প্রেমী একটা দিক প্রকাশ পায়। দেশী-বিদেশী প্রকাশকদের কাছে তিনি নিজে চিঠি-পত্র পাঠাতেন। ভি, পি করে বই পত্র-পত্রিকা আনতেন। এ ব্যাপারে অন্য কারো হাত দেবার অধিকার ছিল না।

উপেনবাবুর মৃত্যুর পর তার জমিদার জীবনের পাশে আর একটি

দিক উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। উপেনবাবু শিল্প-সাহিত্য রসিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তার লোক-জীবন লোক-সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে লেখাও ছাপা হয়েছে। এই সমস্ত লেখা ঘাঁটতে ঘাঁটতে শ্রীমন্তর নামও পাওয়া যায় একটি লেখায়। উপেনবাবু তার কবিতার অনেকগুলো অংশ তুলে দিয়ে বলেছেন: শ্রীমন্ত বায়েন স্বভাব শিল্পী।

শ্রীমন্ত এই কথা জীবনের শেষ পর্যায়ে জানতে পেরে দু-হাত একত্র করে শ্রদ্ধা জানায়। তার দু-চোখ দিয়ে দরদর ধারায় জল ঝরে পড়ে।

খালের পাড়ের জমির খাজনার রসিদে নিম্ন মর্মে লেখা থাকে: অন্নপূর্ণা বায়েন। জওজে শ্রীমন্ত বায়েন। খাজনা পাঁচ আনা হিসাবে পাঁচ বিঘা জমির একুনে এক টাকা ন'আনা, শিক্ষাকর এক আনা ছ' পাই সেস এক আনা, সর্বসাকুল্যে মোট এক টাকা এগার আনা ছ' পাই, মাত্র! পাঁচ বিঘা জমির মোট খাজনা। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর চেক কেটে আনতো শ্রীমন্ত। সেরেস্তায় নায়েব গোমস্তারা বলতো, ওর কাছে আমাদের আর কিছু পিত্যেশ নেই। উনি কর্ত্তার হাত ছুঁয়ে আছেন। পাইক বরকন্দাজদের অবস্থাও ছিল তাই।

বিরাট গোঁফওয়ালা পশ্চিমা-দারোয়ান রামপিরিত সিং বলতো—ইতো বাবা বাবুকা খাস-আদমী। সাব্বাস! মুসরামে ভাগ লেনে বালে—

আজ সেই শ্রীমন্তর জীবনে একি দুর্বিপাক নেমে আসে! কথায় বলে, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই! উপেনবাবু ওপরে চলে গেছেন। নায়েব গোমস্তারা এখন প্রত্যেকে সম্রাট। উপেনবাবুর সাম্রাজ্যের মধ্যে এত সার-পদার্থ লুকিয়েছিল আগে তা বোঝার উপায় ছিল না। শেষ পর্যন্ত লোকের সামনে যেটুকু পড়ে, সেতো করুণ অন্তিম দশা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাভাব। নাটমন্দির মেরামত অভাবে ভেঙে যায়। সামনের দেউড়ি ধ্বসে পড়ে। সারা জমিদারীকেই গ্রাস করে অর্থাভাব। উপেনবাবু শেষদিন পর্যন্ত

বিশ্বাস করতেন না কোন সন্তানকে। কেন? বোঝা খুব শক্ত ছিল। সেটা তাঁর মানসিক ব্যাপার। কিন্তু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না, ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এত মূল্যবান রত্ন লুকিয়ে ছিল!

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নায়েব গোমস্তাদের ফতুয়া-বেনিয়ানগুলো কি করে উপেনবাবুর মৃত্যুর পরেই চক্‌চকে কামিজ-পাঞ্জাবিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই ওঠে বড় বড় বাড়ি। একমাত্র চক্ষুলজ্জাতেই সব কাজ যেন স্থগিত ছিল এতদিন। সেটুকুর অবসানে মুক্তি পেয়ে যায় সবাই। বেনামে ডাকা জমিগুলো সরাসরি দখলে আসে গোমস্তাবাবুদের। শ্রীমন্ত বায়েন বোবার মত সব দেখে—আর উপহাস কুড়োয়।

সেদিন ভাঙাচোরা জমিদারী সেরেস্তায় চামচিকে-ভরা ঘরে জাজিম ফরাসগুলো ঝেড়ে-মুছে একবার দয়া-করে গোমস্তাবাবু শ্রীহরি ঘোষ এসে বসেন। বাইবের প্রচারে কোন ঢাকাঢাকি নেই। উপেনবাবুর জমিদারীর আয় চোরা-পথে বেশির ভাগ চলে গেছে নায়েব গোমস্তা বা ওই শ্রেণীর কর্মচারীদের ঘরে, ভাগাভাগি হয়ে। কিন্তু সামনাসামনি উপেনবাবুর ছেলেরা তো কিছু বলতে পারবে না। আর হিসাব নিকাশটাও ঠিকমত বোঝে না। প্রকৃতির দিক থেকেও তারা ভিন্ন ধরনের।

শ্রীহরি বলেন, ভাল করে বুঝে নিতে হবে তো সব। যা করার তো তিনি করে গেছেন। মুখ বুজে সব সহ্য করতে হয়েছে। হুকুম হলো শ্রীমন্ত বায়েনকে জমি দাও—। সেলামী বাদ। বৎসর বৎসর হিসেবআনা-পার্বনী বাদ।...হুজুরের হুকুম—বাদ।

উপেনবাবুর প্রায় সমস্ত ছেলেরাই আজ সেরেস্তায় উপস্থিত। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়। শেষ পর্যন্ত বড়ছেলে অরুণাংশু জবাব দেয়—শ্রীহরিকাকু বাবার কিংবা আপনার কোন কাজের সমালোচনা করতে তো আমরা এখানে আসিনি। আমরা এসেছি মোটামুটিভাবে আমাদেব মতো করে সব কিছু ধীরে ধীরে

বুঝে নিতে।

সেটাও যেমন নিতে হবে তেমনি—

সেটাই নেবো, অন্যকিছু জানতে চাইবো না। আমাদের পিতৃদেব আমাদের সম্পর্কে যে-নীতি নিয়ে গেছেন, তা আমাদের ভালোর জন্যই। শ্রীমন্তর কথা তুললেন, সেটা ছিল বাবার অন্তরের কথা। তিনি সাহিত্যপ্রেমী, তাই উপযুক্ত কাজই করে গেছেন। আর অ.মাদের কথা বল্‌ছেন, কোলকাতার বাড়ির সঙ্গে প্রত্যেকের নামে ভাল টাকা রেখে গেছেন তিনি। যাতে কোন জটিলতা ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা কিছু নেই। 'অন্তিম ইচ্ছা'-নামে সীল করা যে পত্রটি তিনি মায়ের হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল, 'আগামী দিনে এই ধরনের জমিদারী আর থাকছে না। আমি তা দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি। আমাব পুত্রগণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি যাতে লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার পথ খুঁজে পায় তারা। যদি পারে খুবই ভাল। না পারলে যে অর্থ রেখে গেলাম তা দিয়ে নিজ নিজ রুচি অনুসারে ব্যবসায়-বাণিজ্যাদি করে যেন, জমিদারীর ওপর নির্ভর না করে। তাহলে নির্ভয়ে কথা বলতে শিখবে। তাতেই জয় হবে।—তাই এই ভাঙাচোরা অবস্থা দেখে দয়া বা করুণা করার কারো কিছু নেই। যা ভাঙবার তা ভাঙতে দিন কিন্তু জান্‌তে দিন আমাদের কোথায় কি আছে।

শ্রীহরির চোখ দুটো কপালে ওঠে।

অরুণাংশু বলে, জায়গাটা একটু গোলমেলে বলেই বাবা আমাদের এখান থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিলেন। ভালই করেছিলেন। তাই আপনাদের চোখে যেটা আমাদের ওপর অবিশ্বাস করা— আমাদের চোখে সেটা সযত্নে দূরে সরিয়ে রাখা।

শ্রীহরি ঘেমে ওঠে ধীরে ধীরে।

অরুণাংশু বলে, আবারও আপনাকে জানাচ্ছি আমরা যেমন ভাবে বুঝতে পারবো সেইভাবে সমস্ত হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিন। যারা

ভারতের স্বাধীনতা চাচ্ছে--ঠিকই চাচ্ছে। পাশাপাশি যারা বিনা ক্ষতি পূরণে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ চাচ্ছে তারাও ঠিক চাচ্ছে। ভূতে খাবার থেকে, দেশের গরীব মানুষরা খাক, এটা আমরা চাই। আমরা সমস্ত ভাইরাই চাই। অবশ্য আমাদের একমত হতে একটু সময় লেগেছে।

এবার ঘামে প্রায় নেয়ে যায় শ্রীহরি। তার আগেকার উদ্ধত ভঙ্গি ভেঙে খান খান হয়ে যায়। দূর থেকে তা দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠে শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্ত আপন মনে বোঝার চেষ্টা করে। ছার-সংসারে সবার চোখে উপেনবাবু ছিলেন জমিদার। কিন্তু খাঁটি জহুরী ছিলেন তিনি। ছেলেগুলোকেও তৈরি করেছিলেন নিজের মনের মত করে। গ্রামের লোক ভেবেছিল পাত্তা দেয়না ছেলেদের। আসলে এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশটাতে তিনি আস্‌তে দেন নি তাদের। সযত্নে একটি ছক তৈরি করে রেখে দিয়েছিলেন। অতি সরল ছক সেটি।

উপেনবাবুর ছকটা নিয়ে ছেলেরা এসে দাঁড়ায় শ্রীহরির সামনে। সবাই একসুরে কথা বলে। কুঁকড়ে যায় শ্রীহরি।

এরপর এক নতুন ধারায় চলে জমিদারী। ছেলেরা কর্তার নামে তৈরি করে হাসপাতাল। গ্রামেও তৈরি হয় একখানা হাল ফ্যাসানের চক্‌মিলান বাড়ি। বড় বড় কয়েকটা রাস্তা।

ভারতের কোথায় কোথায় যেন কাপড়ের কলের আর ওষুধের ফ্যাক্‌টরীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তারা তাদের পিতৃদত্ত অর্থে। সেটা পিতার আশীর্বাদের মতই। এছাড়া তাদের চেতনায় 'ভারত' নামক একটি বস্তু দানা বাঁধে। মুক্ত ভারতবর্ষের প্রাঙ্গণে তাদের স্বাধীন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠুক, এটাই ছিল তাদের স্বপ্ন। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে, স্বাধীন ভারতের পতাকা পতপত করে উড়ুক—এটাই ছিল তাদের একমাত্র আশা।

দুর্গাপূজার সময় সমস্ত ভাইরা গ্রামে আসে। বেশ কয়েকদিন হৈ চৈ চলে। প্রতি বছরই ডাক পড়ে শ্রীমন্ত বায়েনের। শ্রীমন্ত

এখন বাঁশের লাঠি নয়—রসের লাঠি।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতারা পাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় বসেন। চিন্তা-ভাবনা করেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার। মাষ্টারদার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী অনুরূপ সেন পাশের হাই স্কুলের মাষ্টার। স্কুলের শেষে তিনি বেরিয়ে পড়েন অন্ত্যজ পল্লীতে। যারা ছিল এতদিন অবহেলিত, পদদলিত তাদের না ওঠাতে পারলে, কাজের কাজ কিছুই হবে না। গান্ধী মহারাজের হরিজনদের নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার অনেক আগে এসব ঘটে। শ্রীচৈতন্যের, চণ্ডালও দ্বিজের থেকে শ্রেষ্ঠ হয়, যদি তিনি হরিভক্তি-পরায়ণ হন, কিংবা শ্রীরামচন্দ্রের গুহক চণ্ডালকে বুকে নেওয়ার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন তিনি। ব্যক্তি-জীবনে মিশে যান সবার সঙ্গে। তাদের মধ্যে একজন হয়ে বোঝাতে সক্ষম হন, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আদৌ যদি থাকে, তবে তিনি সর্বভূতে বিরাজমান। সমস্ত মানুষের মধ্যেই আছেন তিনি। তাহলে মানুষকে ছোট করার অর্থ, ঈশ্বরকেই ছোট করা। একি হতে পারে কোনদিন! প্রতিবেশী বা ছাত্রদের অসুখবিসুখ হলে অনুরূপ সেন তার অতি আপনজন। তাই অল্পদিনের মধ্যে মাষ্টারমশাই সবার প্রিয়জন হয়ে যান। সবার ভেতরের কথা তার জানা। এই পৃথিবীতে সবাই একটা কিছু করে যেতে এসেছে যা মানব-কল্যাণে লাগে। ওটা বাদ দিয়ে যাকিছু করা হয় সবই তো ছোট আমির জন্যে।

পেছনের সারির মানুষগুলো মুখে কথা পায়। বসতবাটিটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে শেখে। গ্রামখানাকে সুন্দর করে সাজাতে শেখে। আরো শেখে, তাদের সমস্ত দুঃখের মূলে কে, তাকে চিনতে।

শ্রীমন্তদের পাড়ার মেয়েপুরুষদের বিদ্যেবুদ্ধি বাড়ে। একটা মানুষ কেমন করে এই ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে, সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে কিছুলোক। বিশেষ করে ঠিকেদার অমর

সিংহ। পদবীতে সিংহ থাকলেও সিংহ তিনি কোনকালে হতে পারলেন না, এই জ্বালায় শিয়ালের মত উঁকি-ঝুঁকি মেরে কাজ হাঁসিল করার চেষ্টা শুরু করেন। এতেও যদি কিছু হয়। তাছাড়া গ্রামের 'ছোটলোক' প্রজারা চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে এটা রীতিমত অসহ্য। তাই সূত্র খুঁজতে লেগে যান। ফলও পান হাতে-হাতে। আলমনগরের আশ্রমে অনুরূপ মাষ্টার আর কিছু জোয়ান রাতের অন্ধকারে স্বদেশী দলের কাজকর্ম করেন। ব্যাস। কাজ তার হাঁসিল। খবরটা পৌঁছে দেন থানায়।

অমর সিংহের বিশেষ দূত আলমনগরের আশ্রম থেকে খবর নিয়ে চোরের মত বেরিয়ে যায়। শ্রীমন্তর চোখে পড়ে যায় সেটা। বাড়ি এসে দু'টো খাবার মুখে দিয়ে ইস্কুলের মেসবাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখে অনেক পুলিশ দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ এই ছোট্ট সময়টুকুর মধ্যে কাজ হাঁসিল হয়ে গেছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে। পাড়ার লোক যাতে যাতায়াত করতে না পারে। সে ব্যবস্থা খুবই পাকা। শ্রীমন্তর মত দু-একজন পুলিশের সামনে আটকে যায়। শ্রীমন্ত কপাল ঠুকতে থাকে।

ভোর হয়ে আসে। ক্রমে আকাশের রঙ আরো স্পষ্ট হয়। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে পড়ে হাজার হাজায় মানুষ। নারীপুরুষ দু-হাত জোড় করে দাঁড়ায়। চোখে তাদের জল। হরিজন-পল্লীতে ছড়িয়ে পড়ে আপনজন হারানোর ব্যথা। দীর্ঘশ্বাস।

শ্রীমন্ত কাঁদে। অপন মনে বলে, আগে পোড়া পেটে যদি দুটো না দিতে যেতুম তাহলে হয়তো সরিয়ে দিতে পারতুম মাষ্টার মশায়কে। অমন মানুষ হয় না। পাড়ায় পাড়ায় কয়েকদিন কারো হাঁড়ি বসে না।

এর প্রায় বছর দুই পরে খবর আসে, মাষ্টার মশায় মাসখানেক আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। সেখানে তিনি ম্যালেরিয়া রোগে ভুগতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই তাকে বদলী

করা হয় ম্যালেরিয়া রোগের ডিপো জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে। এখানে এই উৎকট রোগের ওপর আর একটি রোগ দেখা দেয় আমাশয়। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্ষয়রাতি ওষুধ এই রোগ সারানোব ক্ষেত্রে প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। ভগ্ন-কুঁড়ের পাশের পচা-ডোবার বিষাক্ত জল তাকে পান করতে হয়।

এছাড়া, এখানে মাষ্টার মহাশয়কে ঘরের সমস্ত কাজকর্মই করতে হতো। তিনি রান্না-বান্না করতে বড় একটা পারতেন না। তাই - নুনে-পোড়া বা ঝালে মুখে তোলার অযোগ্য অন্ন-ব্যঞ্জন অনেকদিন ফেলে দিতে বাধ্য হতেন। বৃষ্টিতে ভিজে যেত বিছানা। ছাতা মাথায় বসে থাকতেন বর্ষার সময়। জঙ্গলের সাপ ছুটে আসতো যখন তখন। একটু অসতর্ক হলেই শেষ করে দেবে। এমন এক পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে অতি দ্রুতগতিতে তিনি মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেন। তার সমস্ত শরীরখানা কঙ্কালসার হয়ে যায়। ওঠা-বসাও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে তাঁর পক্ষে। দেশকে ভালবাসার উপযুক্ত পুরস্কার তিলে তিলে তিনি লাভ করতে থাকেন। মৃত্যু প্রায় ঘনিয়ে আসে। তখন অন্তিম ইচ্ছা পূরণ স্বরূপ তার দেহখানি বয়ে আনা হয় কাশীতে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীমন্ত মাথায় হাত দিয়ে ভাবে। তামাম ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে তাঁরা শিকল-ভাঙার পরিকল্পনা গ্রহণ করতেন। কত বিপ্লবী লুকিয়ে এসে একসঙ্গে মিলিত হয়ে সেই আকাশ-ছোঁয়া পরিকল্পনার আনন্দে ডগমগ করে উঠতেন। বেরিয়ে যেতেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, কত ধরনের ছদ্মবেশ গ্রহণ করতেন। তাদেরই একজন মাষ্টার মশায়, মাইলের পর মাইল হাঁটতেন ছাত্রদের আর গ্রামবাসীদের নিয়ে। কোথা জয়রামপুরের মেলায় ভিড় হবে প্রচুর, সেখানে জলসত্র খুলে তৃষ্ণার্ত মানুষের সেবা করা। বন্যায় দেশ ভেসে গেছে। সেখানকার মানুষদের সাহায্য করাব জন্য নিজে গান বেঁধেছেন, তাতে সুর দিয়েছেন। সেই গান দল বেঁধে গাইতে গাইতে

ভিক্ষে করেছেন। ওরই মাঝখানে হুঁশিয়ার যুবক বেছে নিয়ে বিপ্লবী চেতনায় করছেন উদ্বুদ্ধ। সেই মানুষটার চলে-যাওয়া মানে যে কি বিরাট শূন্যতা তা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। শ্রীমন্ত যতটুকু পারে ভাবে আর গুমরে গুমরে কাঁদে।

শ্রীমন্তর চোখের সামনে এর পাশাপাশি ভেসে ওঠে দেশকে ভালবাসা আরও কিছু পরিচিত মানুষ। উপেনবাবুর ছেলেরা। তারা বলেন, পরদেশীকে সরিয়ে দিয়ে আমরা পুঁজি খাটাব। দেশের মানুষের দুঃখ দূর হবে।···তারাও ইংরেজ হটাতে চায়। তারাও স্বদেশী।

কত ধরণের মানুষ চোখের সামনে দেখতে দেখতে চলে শ্রীমন্ত। সমস্ত মানুষগুলি সম্পর্কে যদি বিচার-বিবেচনা করতে হয় তবে মাপ কাঠি আছে একটিই। সেটা হলো—হৃদয় বা 'দীল্'। মানুষকে ভালবাসার জন্য সেটা কতটা প্রসারিত হয় তা দেখে নিতে হয়।

আজ দর্পণ চলে যাবার পর অনেক কথাই মনে আসে। আরো অনেক কথা ভিড় করে আসে মাষ্টার মশায় ধরা-পড়ার পর প্রভাস, অজয়, সৌরেন, কানাই, শরৎরা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ করতো। তারপর একে একে ধরা পড়ে সবাই বিভিন্ন ধরনের আন্দোলনে।

॥ ৯ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেমে যায়। ইংরেজের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। এই অবস্থাতেই বৈঠক সুরু হয়ে যায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে। ইংরেজ ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়। ক্ষমতার বেশকিছু অংশ নিজের হাতে রেখেই। গণ-আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ছে, গণ-আন্দোলনের নেতারাই হয়ে যাবেন প্রথম শ্রেণীর দেশনেতা। পাশে একটা দেশে পরিষ্কার দেখা গেছে এই ছবিটা।

ভাল ভাবে বুঝতে পারে তারা। এখুনি একটা হেস্তনেস্ত করতে না পারলে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য। তাই সংকটময় মুহূর্তে একজনকে গদীতে বসিয়ে আর সামনে-রেখে নিজেদের ভবিষ্যৎ অনেক দূর পর্যন্ত তারা স্পষ্ট দেখতে পায়।

ভারত স্বাধীন হয়। অনেকের কাছে এ ঘটনা অনেকটা ভিন্ন স্বাদের। রক্তের বিনিময়ে দেশ হাতে-পাওয়ার মধ্যে যে মূল্য দেওয়ার জন্য মন প্রস্তুত থাকে এখানে সেস্থান জুড়ে থাকে এক শূন্যতা। মানসিক এই ভারসাম্যহীন অবস্থায় এক রক্তাক্ত উৎপাত এসে জুটে যায়। আর যা অনিবার্য ছিল বলা চলে। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। দেশ ভাগ। কার স্বার্থে এই সব জঘন্য পৈশাচিক উল্লাস? সাধারণ মানুষ কি চেয়েছিল এই সব? যেসব দেশনেতা একই বিন্দুতে অবস্থান করতেন তারা রাতারাতি ভোল পাল্টাতে আরম্ভ করেন।

ভোল-পাল্টান রীতি কয়েক বছরের মধ্যে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। নেতাদের সামনে থেকে আরাধ্য বস্তুটি দূরে সরে যায়। এগিয়ে আসে নতুন কিছু। শ্রীমন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে যায় উপেনবাবুর বাড়ি। ওর ছেলেরা খুব ভালবাসে তাকে। অরুণাংশু আর হিমাংশু সেদিন অনেকক্ষণ আটকে রাখে তাকে। বলে, আমার বাবা অনেক দূর পর্যন্ত দেখতে পেতেন। জমিদারী থাকবে না, থাকতে পারে না। বাবা সেকথা বার বার আমাদের বলে গেছেন। বলে গেছেন, এর জন্যে এতটুকু মায়া কোরো না। তবে একথাও বলে গেছেন তিনি, যারা গদীতে বসবে হয়ত তারা ক্ষতিপূরণ দেবে তোমাদের। সেই অর্থে ব্যবসা-বাণিজ্য ভাল ভাবেই করতে পারবে। কিছুদিনের মধ্যে সমস্ত ভাই বোম্বাই চলে যায় কি একটা ব্যবসা নিয়ে।

গ্রামের অনেকদূর পর্যন্ত গভীরে-শিকড়-ছড়িয়ে-বসে-আছে শ্রীদাম চক্রবর্তী। রাজ্যের রাজনীতি তার মূলধনের আজ এক বিশেষ পরি-

পূরক। শ্রীদামের বয়স বেড়েছে কিন্তু বোঝা যায় না। মেয়েরা বড় হয়েছে। ছেলেরা ব্যবসা বুঝেছে। দর্পণ আপন জায়গায় ঠিক আছে। বয়স তাকেও বেশি কাবু করতে পারে নি। আজো সে ছু-কথা শুনিয়ে দিয়ে চলে যায় মনিবের গদীতে।

তার সমস্ত কথা হজম করে শ্রীদাম বলে, তার পরে বাবা দর্পণ—কতদূর এগোল কাজ—

সব বলে এসেছি—

মাগীটার নামে তো জমি—?

হ্যাঁ। কি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা তার।

ভয় পেলি নাকি? রহস্যের হাসি হেসে বলে শ্রীদাম।

দর্পণ বলে, ভয় আছে আমার একটি জায়গায় প্রভু। আর কোন স্থানে নেই—। জীবন, যৌবন—

থাক্ থাক্—। অত সব বলতে হবে না তোমাকে। কাজ করে যাও। ফল পাবে। হ্যাঁ—ফল পাবে। গীতার মা ফলেষু নয়—বুঝেছ হে—

হ্যাঁ বুঝেছি—

বুঝেছ—? এক ধরনের বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শ্রীদাম বলে, ভাল, ভাল। বুঝতে পারলেই ভাল।

সকালে বিছানা থেকে উঠতে একটু দেরি হয় পদ্মর। গত রাত্রিতে ঘুম আসতে একটু দেরি হয় তার। মা অন্নপূর্ণা। সাদা-ফ্যাকাশে চেহারা। চোখের কোণে গর্ত। আজকাল কথার মধ্যে নাকি-সুর এসে গেছে। শতছিন্ন একখানি কাপড় কোন রকমে অঙ্গে জড়িয়ে শ্রীমন্তর ঘর করে সে কিন্তু এমন দিন ছিল না তার। মা গল্প করে। বাড়িতে, ইংরেজ আমলে কত স্বদেশী নেতা এসে রাত কাটাতো। সেইসব নেতা আজি নাকি বড় বড় কিসব হয়ে গেছে। অন্নপূর্ণা বেশির ভাগ বলে অনুরূপ সেনের কথা। মাষ্টার মশায় মা ছাড়া কথা বলতেন না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কথা বলে

যেতেন। তিনি বার বার বলতেন, 'মানুষ যদি নিজের শক্তিকে চিনতে না শেখে তবে তার মুক্তি নেই।'

অন্নপূর্ণা বলে, নিজেদের শক্তিকে আবর্জনার মত মানুষ ছড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। দিনরাত ছাইপাঁশ খেয়ে নিজেদের চিন্তাবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে। কি হবে এদের দিয়ে। যত অকাজ-কুকাজ করে বেড়াবে এই সমস্ত মানুষ।

মাষ্টার মশায় চলে যাবার পর কালের ব্যবধান এমন কি হয়েছে? তাতেই অনেকে তার কথাবার্তা ভুলে গেছে। ভুলে যায় নি অন্নপূর্ণা। তাই তাকে ব্যঙ্গ করে অনেকে বলে, 'অন্নি বামনী'। এতে অন্নপূর্ণার মনের প্রতিক্রিয়া বোঝা না গেলেও বোঝা যায় পদ্মর মনোভাব।

পাড়ার পাঁচি পিসি একবার বলেছিল কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত জবাব দিয়েছিল পদ্ম, ভাল ব্যাপারটা কি শুধুমাত্র বামুনদেরই একার। আমাদের মধ্যে থাকতে নেই। থাকলেই বামনী বলে উপহাস কত্তে হবে।

যে যতোই চেঁচাক গো মা আমাদের ছোট মনিষ্যি করে গড়েচে ভগমান আমরা যত চেষ্টাই করি ছিদাম চক্কোবত্তিদের ধারে কাচেও যেতে পারবুনি। ই-জন্মের জন্যে বিধির যা লেখার তা লেখা হয়ে গেছে। ---একটানে কথাগুলো বলে যায় পাঁচি।

পদ্ম প্রতিবাদ করতে যায়। অন্নপূর্ণা বাধা দেয়। বলে, পাড়ার সমস্ত মানুষ যখন একসুরে কথা বলে, তখন আমাদের মেনে নেওয়াই ভাল। দেশের সবলোকের সঙ্গে বিরোধ করে বাঁচবো কাকে নিয়ে?

তুমি না একদিন বলেছিলে—সত্যকে সম্বল করে প্রয়োজন হলে একাই পথ চলতে হবে। এই দুনিয়ায় সত্য—

হ্যাঁ। বলেছিলুম। কথাটা আমার নয় মা। একজনের কাছ থেকে পাওয়া। তিনি চলে গেলেন—। তাঁর কথার কেউ দাম দিল না—কেঁদে ফেলে অন্নপূর্ণা। দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকায়। ধরা গলায় বলে, তিনি বলতেন—সবার সঙ্গে দেশের সঙ্গে

এক হয়ে বড় আমির কথা চিন্তা করতে। আমি আজ 'ছোট আমি'র কথা ভাবতে ভাবতে খুব ছোট্ট হয়ে গেছি মা। খুব ছোট্ট হয়ে গেছি। সেইজন্যে তো বলি, কেউ দাম দিল না বলে আমরাও কি দাম দোবো না মা। বলো? কথা কটি বলে পদ্ম।

পাথরের প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে থাকে অন্নপূর্ণা। তার দু চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে অঝোর ধারায়।

পাঁচি অহেতুক ঘোমটাটা সজোরে টেনে বলে, যাত্রা-আখড়াই কর তোরা বাবু। ভালর জন্যেই আমি বলছিনু। দেশের লোকের মুখে দিনরাত গুজগুজুনি শুনে আগেভাগে তোদের সাবধান করে দিচ্ছিনু। নেহাত তোর বাবা খুড়তুতো ভাই। নিজের ভাই ছিলুনি বলে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিনু—কেউ কিছু বল্লে নাগে তাই।

পদ্ম লাফিয়ে ছুটে যায় পাঁচির কাছে। তার বিদ্যুৎ গতি স্তব্ধ করে দিয়ে বলে, রাগ করে পালালে হবেনে পিসি—এসো—। বসতে হবে দু-দণ্ড। কথা আছে তোমার সঙ্গে। পদ্মর উচ্ছল-চঞ্চল প্রাণস্পর্শী ব্যবহারে কেমন যেন পাঁচির মাথাটা গোলমাল হয়ে যায়।

কি কথা আর বলবো মা। কিছু বললেই তোদের রাগ। —জোর জোর জবাব। আমরাও তো মানুষ গা মা। তোরা যদি মানুষ বলে গন্যি না করিস—কি আর করবো মা। যেখিনে নেই মান– সেখিনে কি সেদে মান। না না। সে কুন্নুদিন হবেনে মা।

পদ্ম পাঁচিকে সারাটা উঠোন টেনে টেনে আনে। দাওয়ায় খেজুর চাটাই পেতে বসতে দেয়। অন্নপূর্ণা টলতে টলতে পা সামলে খুব কষ্টে উঠে আসে দাওয়ায়। চাটাইয়ে তিনজনেই বসে। এবার পাঁচি আসল কথা বলার জন্য ধড়ফড় করতে থাকে। এমনিতে তার সম্পর্কে রটনা আছে পাড়ায়, তার পেটে কোনকথা এক মুহূর্ত চাপা থাকে না। বার হবার জন্যে আঁড়-পাঁড় করে। অনেক সময় গভীর রাতেও তাকে ছুটতে দেখা যায়।

পাঁচি এবার তার পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলার পদ্ধতি প্রয়োগে ঝাঁপি খুলতে থাকে। পাঁচি বলে, শিবে, লোকে, ভীমে, পরাশরে সব এক হয়েচে। তোদের জমি তারা গেরাস করবেই। ছিদাম চক্কোত্তি ওদের অঢেল টাকা দিয়েচে তাড়ি-মদ খেতে। —এরপর মুখটা অন্নপূর্ণার কানের কাছে এনে ফিসফিসিয়ে বলে, মেয়েটার দিকে কুনজর পড়েচে ছোঁড়াদের। কখন কি করে ফেলে। একটু সামলে থাকিস বোন।

ভারত স্বাধীন হয়েছে। মালক্ষ্মী যাদের ঘরে ঢোকার ঢুকেছেন। ঘর আলো করে বসে আছেন। জমাট-বাঁধা অন্ধকারের রাজ্যে নামমাত্র ফিকে আলো এসেও পৌঁছোয় নি। পাড়াটার দিকে নজর দিলেই চোখে পড়বে, কারো ঘরের চালে খড় বা পাতা কিছু নেই। গত বর্ষাতেও ছিল না। যতটুকু ছিল প্রথম বর্ষণের তোড়ে পচে, গলে শেষ হয়ে গেছে। পররর্তী সময়ে চালে খড় বা পাতা তোলার জন্যে যে সামর্থের প্রয়োজন তা নেই এই দরিদ্র নিরন্ন ক্ষেতমজুর, জনমজুর সম্প্রদায়ের। প্রয়োজন অনুভব করে এরা কিন্তু সামর্থের অভাবে নিরাশ স্থিরদৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে থাকে। সারাদিন খালে-বিলে মাছ ধরে, কাঠ ভাঙে, শাক-পাতা জোগাড় করে মেয়েপুরুষ কোন রকমে উনুন ধরায়। চেঁচামেচি করে। যাদের এক-আধ-বিঘে আছে তারাও ধান তোলার দু-এক মাস পরে এদের সামিল হয়ে যায়। তাই পরণের বস্ত্র মানে এক টুকরো বিবর্ণ ট্যানা বা গামছা। মেয়েদের কাপড়ে লজ্জা ঢাকে না। রুক্ষ মাথার চুল। ছিটে-বেড়া বা সরু পাটের কাঠির দেয়ালের ছোট্ট মাথা গোঁজার জায়গা। মাথার চাল প্রায় ফাঁকা।

বর্ষা কাছাকাছি এসে গেছে। দু-চারখানা তালপাতা বা কয়েক আঁটি খড় বসিয়ে দিয়ে কিছুটা রক্ষা পাবার চেষ্টা। কিন্তু তা হয় বৃথা। আকাশের জল যখন ঝরে—চোখের জল তখন নামবেই। আর আগাম-দাদন নেবার দরুণ বর্ষায় মাঠে নেমে আধা রোজে আধ-পেটা

খেয়ে কাজ করতে হবেই।

এদের থেকে একটু শাঁসেজলে ছিল শ্রীমন্তরা। তাই ঘরের অবস্থা ভাল থাকলেও পাঁচিল নেই। তাই সবার সঙ্গে তার ঘরখানাও হাট হয়ে আছে। যদিও ভাঙা পাঁচিলগুলোর অস্তিত্ব কিছুটা এখনো বিরাজমান।

ভীমে, লোকে, শিবে, পরাশরে এ পাড়ার ত্রাস। এদেরই ঘরের ছেলে এরা। কিন্তু কাজ করে শ্রীদাম চক্রবর্তীর আঙুলের দিকে লক্ষ্য করে। শ্রীদান সরাসরি এদের নির্দেশ দেয় না। তাড়ি-মদের পয়সাও দেয় না। দেয় সব দর্পণ। কিন্তু ওরা হাড়ে হাড়ে অনুভব করে এসব আসে কোথা থেকে। তাই শ্রীদাম যখন পথ দিয়ে যায়, তখন এরা জোড়হাত করে প্রণাম জানায়। আর শ্রীদামের কল্যাণে এদের তেল চক্‌চকে বাবরি চুলের মাঝখানে লম্বা সিঁথি। হাঁটুর ওপরে ঝুলে থাকলেও আস্ত একটা ধুতি পরা। গায়ে ফতুয়া অথবা বেনিয়ান। মুখে রাজা-উজির মারার গল্প সব সময়। যে তল্লাট দিয়ে এরা হাঁটে, সে জায়গায় মানুষের ভয়ে বুক কাঁপে।

তাই অন্নপূর্ণার ফ্যাকাশে শরীরখানায় ঘন ঘন কাঁপুনি আসে। বুকটাকে ছু-হাত দিয়ে সে জোরে চেপে রাখে। তাতেও বেশ জোর কাঁপুনি আরম্ভ হয়। ঘাম দেয়। পদ্ম তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে হাতপাখা এনে কোলের ওপর মায়ের মাথাটা টেনে নেয়। বাতাস করতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। অনেকটা সময় কেটে যায়। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকায় অন্নপূর্ণা।

পাঁচি বলে, একটু জল খাবি বৌ। জল—

জল এনে অন্নপূর্ণার মুখে চোখে দেয় পদ্ম।

শোয়া অবস্থাতেই বলে অন্নপূর্ণা, শকুনের চোখ যখন পড়েছে, তখন আর রক্ষে নেই। আমার তো অবস্থা দেখচো। যেকোন সময় শেষ হয়ে যাবো। তোমরা একটু দেখো। এই শয়তানেরা বিন্দেটাকে বার করে নিয়ে চলে গেল। সোনার পিতিমে মেয়ে

কমলীটাকে নিয়ে চলে গেল। সবই তো দেখনু চোখের সামনে—

পাঁচি কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। ভাবটা এমন—এও তো অনিবার্য। একে রোখা যাবে কি করে!

এমন সময় মায়ের মাথাটা ধীরে ধীরে চাটাইয়ের ওপর নামিয়ে দিয়ে পদ্ম বলে, তোমরা বলবে যেহেতু বরাবর এই ধরনের কাণ্ড-কারখানা হয়ে আসছে আর কেউ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে না অতএব চলতে থাকবে এ জিনিস। এই তো?

কেউ কোন কথা বলে না। এখানের সমস্ত বাতাসটা যেন মুহূর্তের মধ্যে জমাট বেঁধে যায়। কেউ নিঃশ্বাস নিতে পারে না। একটা অসহ্য যন্ত্রনায় ছটপট করতে থাকে সবাই। কোন কথা বলতে পারে না।

পদ্ম নিজের আঁচলের প্রান্তভাগ বাম হাতের বুড়ো আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলে, জানি কোন কথা তোমরা বলতে পারবে না আজ। কিন্তু এই শকুনদের ডানাগুলোকে টুকরো টুকরো করে কাটার জন্যে যদি কোনদিন এতটুকু অস্ত্রও হাতে পাই --সেদিন তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কোরো।

পাঁচির সমস্ত বুক আন্দোলিত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

অন্নপূর্ণা বলে, মা পদ্ম বারবার হাত দিয়ে বুকখানা চেপে রাখতে হচ্ছে। দুর্বল হাতে আর পেরে উঠছি না। বাঁশের আলনায় একটা বড় ন্যাকড়া আছে। ওটা দিয়ে কষে বেঁধে দেনা মা। বুকের ভেতরে বড় কষ্ট।

আজকের সকালটা বড় ভাল লাগে পদ্মর। ঘুম ভাঙতেই জানলার ফাঁকে আতা গাছে কয়েকটা শালিক কিচির-মিচির করতে থাকে। দুটো কাঠবিড়ালী পাশাপাশি বসে কি যেন শলা-পরামর্শ করে। ওদিকটায় নজরটা একটু রাখে পদ্ম। রোদ্দুরের অজস্র

বর্ষণে গাছের পাতার রঙে এক অপূর্ব লাবণ্য। সবকিছু মিলিয়ে এক জীবন্ত ছবি।

অন্নপূর্ণা ডাকে, পদ্ম—পদ্ম কোথা গেলিরে—

যাই মা—

তাড়াতাড়ি উঠে আয়। তোর বাবা কোথা থেকে কি সব এনেছে।

বাবা কিছু আনলে তার ওপর অসম্ভব লোভ পদ্মর। বিছানা ছেড়েই কাপড় সামলাতে সামলাতে সে ছুট দেয়। অন্নপূর্ণা হাসি মুখে বলে, যা মুখে-হাতে জল দিয়ে আয়।

শ্রীমন্তও বলে—হ্যারে বেটি মুখ-হাত ধুয়ে আয়। কাল একটা আসরে বাজাতে গিয়ে দেখি গায়েন নেই। অমনি সবাই ধরে বসলো—কি হবে ছিমন্ত-দা। আসরটা রাখো। রাখনু আসর। গানে গানে গম গম হয়ে উঠলো সারা রাত। পেরাইজের পর পেরাইজ। শেষরাতে শালা নায়েককে খুঁজে পাইনি। এক আলের ধারে লেংটা-মত্ত হয়ে চিৎপাত দিয়ে সে তখন বেহুঁস। চাগিয়ে তোলা গেলুনি। —আর যারা ছিল—দিল পাঁচটা টাকা।

পাঁচ টাকার ওপরেই একটা গান :

পাঁচের প্যাঁচে ফেলে বাবু বিদায় দিও না।
'আস্তাটা' মোর ফাঁকা রেকো
(যেন) কাঁটা দিও না॥
আসচে বছর আসবো আবার,
নাচবো গাইবো গান।
আসর দেবার আগে মালিক
রেকো মনের টান॥

ব্যাস। ওতেই কিস্তি মাৎ। পেরাইজ-টেরাইজ গুনে মোট সাতাশ টাকার মত। আকের গুড় এনিচি। আজ গুড়পিঠে হবে। তোর মন্দির-পাড় কাপড়ের সখ ছিল এনিচি। তোর মায়ের জন্যেও

একখানা। আনন্দে উঠোনের ওপর খঞ্জন পাখির মত নৃত্য করে বেড়ায় শ্রীমন্ত। গুন গুন করে গায়:

করে দোবো মিষ্টি মুখ।
আর আমার কিসের দুখ॥

চঞ্চল আত্মভোলা মানুষটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পদ্ম। দেওয়ার আনন্দ-সুখ উপচে পড়ছে যেন তার সর্বাঙ্গে। এই রূপ বার বার দেখেও যেন সাধ মেটে না। এক সময় বলে ওঠে, বাবা সারা রাত্রি জাগরণ। চান-টান করে একটু ঠাণ্ডা হও না। যাও, ঘাটে যাও। আমি দুটো মুড়িতে জল দিই।

শ্রীমন্ত বাবরি চুলে তেল ঘষতে ঘষতে চলে যায় পুকুরের দিকে। গত রাতের ঘটনা—যেন একটা স্বপ্ন। এমন অসংখ্য ছবি তার মনের মধ্যে ধরা আছে। এ্যালবামে স্তরে স্তরে সাজান যেন। প্রথম ছবি উপেনবাবুর। এরপর একটি একটি করে ঘটে গেছে কত ঘটনা।

খাবার পর পান চিবুতে চিবুতে একটা বিড়ি ধরায় শ্রীমন্ত। নিজেকে কেমন যেন সম্রাট সম্রাট মনে হয় তার। বিড়ির ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে তাকিয়ে থাকে দাবার কুলুঙ্গীতে রাখা ঢোল-কাঁশিটার দিকে। এরাই তাকে সম্মান দিয়েছে। রুজিরুটি দিয়ে যাচ্ছে। ঢোল-কাঁশির সঙ্গে বাঁশির আওয়াজ আজকাল জমজমাট করে দেয় পরিবেশকে। নিধিরাম বাঁশি বাজায় তার সঙ্গে, যেমন বাঁশি বাজায় রামগোপাল। রামগোপাল ঠাকুর যাত্রাদলে মাঝে মাঝে বরাত পায়। এ ছাড়াও তার দলে আসতে চাইছে। বেহালা বাজিয়ে রজনী বৈরাগী রাজী হয়েছে তার দলে আসতে। মোট কথা আর বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে একটা দল খুলে, আধুনিক তরজাদল করতে চায় শ্রীমন্ত বায়েন। হিসাবও ঠিক হয়ে যায়। আট আনা গায়েন। আট আনা পাবে সব বাজনাদার মিলে। বেহালা চার আনা। বাঁশি তিন আনা। কাঁশি এক আনা।

কাঁশির ভাগে খুব কম পড়ে যায়। তখন সবাই ঠিক করে,

প্রতি-আসরে গায়েন আট আনা আর বাজনাদার দু'জনে মিলে বাড়তি আট আনা মোট একটাকা কাঁশিওয়ালাকে দেবে। শ্রীমন্তকে বাড়ির সামনে পালাগান নিয়ে আখড়াই বসার ব্যবস্থা করতে হয়। শ্রীমন্তর গলার সঙ্গে মিলিয়ে কখনো বাঁশির কাজ – কখনো বেহালার কাজ চালিয়ে যেতে হয়। শেষ অব্দি কানা-বিশে হারমোনিয়াম নিয়ে দলে ভিড়ে যায়। দোয়ারকী জড় হয় প্রায় জনা দশেক। এছাড়া থাকে পেলেমোদার—ফাই-ফরমায়েস খাটার লোক।

মাঝে একদিন শ্রীদাম চক্রবর্তীর গদীতে গিয়ে শ্রীমন্ত বলে আসে, বৎসর খানেক সময় দিন চক্রবর্তী মশায়। আপনাব টাকা সুদে-আসলে আমি ফেরত দিয়ে যাবো।

সেদিন কয়েকটা আসরে গাওয়ার পর টাকাকড়ির থলি নিয়েই শ্রীমন্ত হাজির হয়ছিল। উদ্দেশ্যও জানিয়েছিল। কথা শুনে কপালে চোখ তুলেছিল দু'জনেই। বলেছিল চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ কত হয়েছে জান?

হিসেব করুন।

হিসেব করুন? বিস্ময়ে তাকায় দর্পণ।

হ্যাঁ।

গাওনাকি কত্তে কত্তে মেজাজও যে বেশ চড়েছে হে গায়েনের পো? বলে দর্পণ।

মেজাজ কোথায় দেখলেন হুজুর? বিনয়ের অবতারের মতই কথাগুলো বলে শ্রীমন্ত। শেষের দিকে এর সঙ্গে একটু হাসি মিশিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলে, আমার দেনা মানে আপনার পাওনা। হিসেব-নিকেশ করে নিয়ে নিন।

হুজুরের আদেশ মত খাতাপত্র কি হাতে নিয়ে বসে আছি? —ধমক দিয়ে বলে শ্রীদাম চক্রবর্তী। তার থেকেও ভারিক্কি চাল দেখিয়ে ব্যঙ্গ করে বলে দর্পণ, হ্যাঁ-হাঁ, সত্যিই তো গায়েন মশাই আসবেন। বায়েন থিকে একলাফে উনি গায়েনে উঠেছেন—

কত নাম যশ ওঁর। কত গন্যিমান্যি মানুষ উনি। স্বয়ং জমিদারবাবু ওনার গলায় উড়ুনী জড়িয়েছেন, তাই ওনার আগমন-বার্তা আমাদের পূর্বাহ্নেই পাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু কপাল-দোষে হয়ে ওঠেনি গায়েন মশাই, দোষ-ত্রিরুটি মাপ করবেন। বিনা খাতাপত্রে এখন আপনার জন্যে কি কত্তে পারি বলুন।

শ্রীমন্ত হঠাৎ কেমন যেন পাথরের মত শক্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, রসিয়ে রসিয়ে জুতো আর মারবেন নে দর্পণবাবু। গরীবের ঘরে জরমিচি বলে— এমনভাবে অপমান করে যাবেন? টাকা আপনাদের আছে। কি করে তা ধরে রাখতে হয় তার হিসেব আপনারা জানেন। সেই সঙ্গে ধার দিলে সুদে-আসলে কত হয়, সে হিসেবটা কত্তেও আপনারা বেশ ভালই জানেন। গতবারে তলব পাঠিয়ে ছিলেন, টাকা দিতে না পারায় 'চক্কবিদ্ধি' না কি করলেন। শেষ পর্যন্ত কত হয়েছে? জানিনি আজ আমি যা এনিচি, এই দিয়ে গেনুন। যদি বাকি থাকে—এটার ওপর যেন চক্কবিদ্ধি করবেন না। এই বলে রুপোর টাকাগুলো হুড়-হুড় করে গদীর ওপর ঢেলে দিয়ে শ্রীমন্ত হন্ হন্ করে চলে যায়।

অনেক ধরনের মানুষ দেখচো তো হে—এমন ধরন আবার খুঁজে পাওয়া দায়। চশমার কাঁচের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা দর্পণের ওপর রেখে বলে শ্রীদাম। দর্পণ বলে, একেই বলে 'একো বোকা' হুজুর। আখের বোঝা বয়ে মরবে, অথচ এক টুক্রো আখ মুখেও দেবে না। কথার শেষে হোহো করে হেসে ওঠে। তার সঙ্গে হাসিতে যোগ দেয় শ্রীদাম চক্রবর্তী আর এক অর্থপূর্ণ ভঙ্গীতে দর্পণের দিকে তাকায়। দর্পণও এর জবাব দেয় এক বিশেষ অথপূর্ণ ভঙ্গীতে।

॥ ১০ ॥

অন্নপূর্ণার রোগ সেরেছে। শরীরে রক্তের প্রবাহ এসেছে। এতে দেখা যায় প্রাণের চাঞ্চল্য। পদ্মর চাঞ্চল্য ভাষায় প্রকাশ করা প্রায়

অসম্ভব। বর্ষার ঢল নামা কোন পাহাড়ী নদী সে যেন। অসংখ্য ঘুর্ণি সৃষ্টি করে আপন মহিমায় এগিয়ে চলে সে। ভীমে, লোকে, শিবে পরাশরের দল নিজেদের আকর্ষণে এখন ঘুর-ঘুর করে এ পাড়ায়। শুধুমাত্র শ্রীদাম চক্রবর্তীর টাকায় তারা এখন আর এ পাড়ায় ঘোরে না। পদ্মর চলন চাউনী আর প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের বুকে আগুন ধরিয়ে দেয়। দর্পণ বলে, এখুন নয় ওরে লোকে—না বাবা, এখুন নয় —একটু রয়ে-সয়ে বাবা। এখন নাড়ার গোড়ায় বেজায় রস বাবা, টানলে সহজে উঠবে নে। শুকনো হোক—একটানেই ফস্—

দর্পণের কথা শুনে যায় সবাই। কিন্তু মনঃপূত হয় না কারো: সে ওদের চোখমুখ আর ভাবগতিক দেখলেই সহজে বোঝা যায়। দর্পণ বলে, তোদেরই বা দোষ কি? অমন ডগ্‌ডগে আঁচ—আপসে মেজাজ বিগ্‌ড়ে যায়—

তবু ধরে রাখতে হবে ওদের। কাঁচা ফোঁড়ায় ছুরি চালালে চল্‌বে না। অজস্র রক্তপাত হবে। চিৎকারে পাড়া মাৎ হয়ে যাবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। কাজ চাই বাবা। কাজ চাই। শ্রীদাম বেশ মেজাজ নিয়েই কথাগুলো বলে।

মুখে জাল্‌তি বেঁধে কাজ হয় না বাবু—

কেন? কয়েকটি রেখা দেখা দেয় শ্রীদামের কপালে। পরে রেখাগুলো ঢাকা পড়ে যায়। উঠে যায় সে ধীরে ধীরে। দর্পণ বসে থাকে।

লোকে বলে, তুমি তো জান বিন্দেকে বার করে আনন্থ পাড়া থিকে। কদ্দিন খুব আমোদ-ফুর্তি চললো—

ভীমে মাথায় হাত ঠেকিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে। বলে, কমলিকে যখন আনন্থ—মনে পড়ে? দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ান্থ। ভেতর থেকে সাড়া হোল—কে গা?

বলন্থ—এক গেলাস জল দাও—

আগেকার কথা মত, বিনোদিনী দাসী আগড় খুলে বলে,

কে গা বাছা ?

ব্যাস আমরা পটাপট ঢুকে যাই ঘরে। ধাক্কা মেরে বিনোদিনীকে সরিয়ে দিই। আগে থেকে কথাই ছিল। সে চেঁচাতে শুরু করে ডাক ছেড়ে—আমরা ইদিকে কমলীকে নিয়ে পগার পার। কমলী ক'দিন বাবুদের ভেগে-নেগে—এখন বাজারে বসেচে।

পরাশরে হাসে। বলে, বাবুরা শাঁস খায়—আমবা তার ছোবড়া চুষি।

আবার নাচা শুরু করে ভীমে। গাইতে থাকে :

ছোবড়া শুনো ছোবড়া নয়রে—
পাকা ফলের খোলা।
লাগলে জিবে 'জেবন সাথ্যক'
হিয়েয় নাগে দোলারে,—
হিয়েয় নাগে দোলা—॥

বাহবা—বাহবা—। শালা ছিমন্ত গায়েনের ছাগরেদ হয়ে গেছে রে—। শালা এক্কেবারে তরজা-

এতো ছিমন্তরই গান রে শালা—বলে পরাশরে। শিবে ছিপছিপে লম্বা। একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সমজদার হিসেবে তার নাম আছে এ-দলে। তবে একটু তোত্‌লা। কথার মধ্যে বেশ কয়েকবার আটকে যায়। আট্‌কে আট্‌কেই বলে সে, আজ শা—শ্যা ল্যা—ছি—ছি—ছি—মন্ত—গায়েনের কপালটা—কা—কা—কা—র না জা—জা—জা—জানে আগুন ধ-ধরায় রে—, বলনা শা—শা ল্যা—। বু—ক্যো—হাত রেখ্যেই বল না— ?

সত্যি ঈর্ষা করার মত কপাল আজ শ্রীমন্ত বায়েনের। আট পাট দেয়াল তুলে পাঁচিল সুন্দর করে ছাওয়া হয়েছে নতুন সোনালী খড়ে। সামনের আগড় নতুন বাঁশের বাঁখারী দিয়ে তৈরি। যা জলে পচে প্রায় লোহার মত শক্ত হয়ে এসেছে। সংস্কার করা দেয়াল নিকিয়ে-পুঁছে সাফ করা। উঠোন-দাওয়া সব ঝক-ঝক তক-তক

করে। যেন সব খলখল করে হাসে। আঙিনার টগর গাছে শুভ্র ফুলের সমারোহ। সব কিছু মিলে এক আনন্দময় পরিবেশ।

পদ্ম ঘুরে বেড়ায় উঠোনের এধার থেকে ওধারে। হাতের ঝাঁটা-খানা আবর্জনার টুকরো থাক্‌তে দেয় না। মা অন্নপূর্ণা আজ স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে ভরপুর। বুকে আজ আর তার কাপড় বাঁধতে হয় না। চিকিৎসা করে সুস্থ হয়েছে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবে এমন ঘর কোথায় খুঁজে পাবে। যেখানে পদ্ম এমনি মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারবে। এমন বরই বা কোথায় পাবে।

মা—মাগো—?

কি? বল না—

আজ তো তোমার পূজো আছে?

আছে তো।

আজ চণ্ডীতলায় আর একা যাবো না। তোমার সঙ্গে যাবো।

অন্নপূর্ণার মুখের হাসি ঝর্ণার মত ঝরে পড়ে। খুব সহজেই উত্তর দেয় সে—হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ—আমিও সঙ্গে যাবো। মনে মনে ভাবে, যা ছ্যাঁচড়া ছেলে ছোক্‌রাগুলো। আস্তাকুড়ের পচা আবর্জনা যেন। নিশ্চয় কোথায় কি ঘটেছে। তাই একা যেতে চায় না। আর মেয়ে কি কম মুখরা? জিভে যেন শানানো ছোরা ঝল্‌সাচ্ছে। যা হোক, সঙ্গে যাবে সে।

কাঁঠালপাতার গুচ্ছ, বেলপাতার গুচ্ছ, খোসা ছাড়ান যবের চাল, পানের খিলি, কলা, আর সব রকম ফলমূল দিয়ে পূজো। চণ্ডীতলায় ঠাকুর মশায় বসেন। আশপাশের পাড়া থেকে মেয়েরা পূজো নিয়ে আসে। পথে ছোকরার দল পাঁয়তাড়া কষে। হাসি-ঠাট্টা-মস্করার ফুলঝুরি জ্বলে। পদ্মদের সঙ্গে পাঁচি-পিসির দেখা হয়ে যায়। এদের অবস্থা দেখে পাঁচি বলে, মরণও হয়নে মুখপোড়াদের।

একটু জোরে বলোনা পিসি। —পাঁচির গলা জড়িয়ে ধরে বলে পদ্ম।

কেন ভয় নাকি? বলবোই তো—কেনরে মুখপোড়া হাড় হাবাতেরা—মা-মাসি দেখে হাঁটতে পারিস নি। সারা পথে হা হা হো হো কত্তিচিস—কিসের এতো ফুত্তি র‍্যা—

পিসি, ওরা তো অনেক আগেই চলে গেল। শুনবে কে?

তুই শুনবি।

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলে, থামো তো ঠাকুরঝি। ওর যেমন কথা।

বল্তো বোন—আমার নাকি সাহস নেই। আমি যেন কারো খেরে বসে আছি। পাঁচি দাসী অমন কাউকে ভয় করে কথা বলেনে। কারো মন জুগিয়েও কথা বলেনে। হক্ কথা বল্তে ভয় করে কখনো? তুই বল অন্ন—? তোর মেয়ের ব্যাপার নিয়ে কি তোলপাড়টা না হোল। তখন তোদের কানে তুলে ছিনু কথাটা। বাবারে কি সব্বনেশে কথা। এখুন সব চুপ চাপ—। আর কুন্নুদিন বলিচি তোদের?

অন্নপূর্ণা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, একটু আস্তে ঠাকুরঝি, হালদার পাড়ার বৌঝিরা আসচে। পাঁচি সেদিকে তাকিয়ে কি বল্‌তে গিয়েও চেপে যায়। জষ্ঠিমাসের একপ্রহর বেলা অতীত হয়েছে মাত্র। তাতেই প্রচণ্ড গরম। রাস্তার দু'পাশের নারকোল, সুপুরির সার ছত্রাকারে দণ্ডায়মান। আমবাগানে ছেলেমেয়ের দল হৈ চৈ করে আম কুড়োয়। মাঝে মাঝে দমকা বাতাসে ঝরে পড়ে মগ্‌ডালের পাকা আম। রাস্তা-পর্যন্ত-এগিয়ে-আসা একটা ডাল থেকে দুটো পাকা আম পড়ে যায়। পদ্ম আম দুটো কুড়িয়ে নেয়। তার পিছু পিছু এক পাল ছোট ছেলে ছুটে আসে—দিদি আমায়—দিদি আমায়—

সব চেয়ে ছোট বাচ্চাটার হাতে আম দিয়ে পদ্ম ভাবে, এমন ছোট্ট ছেলে। এমন খুশি খুশি ভাব। আম দুটো পেয়ে আনন্দে যেন উছ্‌লে ওঠে। ছেলেবেলায় দেবশিশুর গল্প শুনেছে পদ্ম। সেই দেবশিশুর মত লাগে ছোট ছেলেমেয়েগুলোকে। কোন পাপের

চিহ্ন নেই ওদের চোখে মুখে। অথচ কয়েকটা বছর পার হবার পর—এই দেবতার-ভাব মুখ লুকোয়। চোখে মুখে দেখা দেয় শয়তানের জ্বলন্ত আদল। পদ্ম ভাবে, যে কারিগর এই সমস্ত গড়ছে বেশি বয়স পর্যন্ত এই সুন্দর ভাবটা ধরে রাখতে পারে না কেন? কোথায় অসুবিধা। কোথায় বাধা। এইটুকু যদি করতে পারে, তাহলে তো দুনিয়ার অনেক বিবাদ-বিসংবাদ দূর হয়ে যেতে পারে।

পদ্ম হঠাৎ পাগলের মত হেসে ওঠে। হাসি চাপতে, মুখে সশব্দে কাপড় চাপা দেয়। পাড়ায় প্রতিমা তৈরির সময়—কাঠামো তৈরি, একমেটে, দোমেটে, খড়ি দেওয়া ইত্যাদি পর্বের পর রং দেওয়া আর সর্ব শেষে খুব ধীরে-সুস্থে চোখ আঁকার পর্ব হতে দেখেছে সে। তার মনে হয় পরাশরে, শিবে, লোকেদের যে 'পোটো' তৈরি করেছে সে বড জোর দোমেটে পর্যন্ত শেষ করে ওদের ছেড়ে দিয়েছে। ভাল করে ঠিক ঠিক জায়গা মত রং পর্যন্ত দিতে পারে নি, এমন কি চোখ দুটোও ঠিক মত এঁকে দিতে পারে নি। যার জন্যে দুনিয়ার সব কিছু ঠিক মত দেখতে পায় না ওরা। দেখতে পেলে, যাতে নিজেদের সমূহ ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ ওরা করতো না। এমন কাজ করতো না, যাতে নিজেদের সমাজের ক্ষতিসাধন হতে পারে।

ও পোড়ার মুখী সব্বনেশে হাসি থামা। এর জন্যেই—, বলে বিশেষ এক ধরনের অর্থপূর্ণ মুখভঙ্গী করে পাঁচি।

চণ্ডীতলার কাছাকাছি এসে যায় সবাই। বহু মেয়ে এসে গেছে এর মধ্যে। বাঁধান চত্বরের পাশে গলায় আঁচল জড়িয়ে বসে তারা। শুধু পুজো দিলে তো হবে না। ব্রতকথা শুনতে হবে। শেষে প্রসাদ নিয়ে তবে বাড়ি যাবার পালা।

সবার চোখের সামনেই সুন্দর, স্বচ্ছল, সুখের সংসারের স্বপ্ন। স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান স্বামীর কামনা। হাসি লাগে পদ্মর। এই পোড়া সমাজে স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান স্বামী আসবে কোথা থেকে? সুখের সংসার! হাসি যেন থামতে চায় না।

বহুদিনের বাঁধান এই চত্বর। বহুদিন আগে থেকেই মানুষ ছুটে আসে এখানে। সোনার হরিণের পিছু পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু ধরতে পারেনা সেই মরীচিকাকে। সীতা চুরির কাহিনীর কথা আবার তার হাসির বেগ বাড়িয়ে দেয়।

মায়ের পাশে গিয়ে বসে পড়ে পদ্ম। রোগা লিকলিকে কালো বামুন ঠাকুর চণ্ডী দেবীর পূজোয় ব্যস্ত। ঠাকুর মশাইয়ের চোখ দুটো গোল। লাল হয়ে আছে। ওর সঙ্গে সম্পর্ক আছে মা চণ্ডীর। দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এদের। কিংবা এরা দেবতাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তাহলে পৃথিবীর মানুষের এত দুঃখ কেন? এই দুঃখ দূর করার জন্য এরা তো সরাসরি দেবদেবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতে পারে। দেবতাদের ভাণ্ডারে ধনরত্নের অভাব নেই। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে অন্নের অভাব নেই। তা এনে মানুষের দুঃখ দূর করে না কেন এরা?

পদ্মর চিন্তাভাবনার ছাপ তার মুখের ওপর স্পষ্ট। তন্ময় হয়ে গাছের ডালে একটা কাঠবিড়ালীর দিকে তাকিয়ে থাকে সে। কাঠ-বিড়ালীর চঞ্চল গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার চিন্তা ঘোরাফেরা করে। পাঁচি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অন্নপূর্ণার দিকে তাকায়। অন্নপূর্ণার দৃষ্টিতে নীরব সমর্থন খুঁজে পায় পাঁচি। সত্যিই এ এক অন্য ধরনের মেয়ে।

অন্নপূর্ণা গায়ে ঠেলা দিচ্ছে। বলে, ও পদ্ম—কি অত ভাবচিস মা?

না, এমন কিছু নয়। অতি সাধারণ কটা কথা।

কি?

যে সিঁড়িটাকে তোমরা এতোদিন স্বর্গের সিঁড়ি ভেবে এসেছো, আমার মনে হয় তা মোটেই স্বর্গের সিঁড়ি নয়। একটা মিথ্যা ভরসায় কোটী কোটী মানুষ শুধু হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে তার

দিকে। একটু চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত না করেই।

কি সব বলচিস মা হেঁয়ালির মত কথা।—পাঁচি বলে।

পদ্ম বলে, আসল কথাকে হেঁয়ালী বলা আর আসল লোককে শয়তান বলা মানুষদের এক ধরনের রেওয়াজ গো পিসি।

তুই চুপকর আভাগীর বেটী।

চুপ কচ্ছি। চুপ কল্লেই তো সব শান্ত

হ্যাঁ, চুপ কর মা। 'দেবতার থান'। এখেনে এসে উল্টো পাল্টা চিন্তা-ভাবনা করতে নেই। মন স্থির করে ঠাকুর-দেবতার কথা ভাবতে হয়।

হ্যাঁ চুপ করে বসচি মা।

॥ ১১ ॥

নদীর ওপারে দুটো বড পুকুরের ধারে সম্প্রতি দুই দেবতা এসেছেন। দু'জনকে স্বপ্নে নাকি বলেছেন, অজস্র মানুষের কল্যাণের জন্য তাদের আবির্ভাব ঘটছে। কলিকালের মানুষ। মনে তাদের আদৌ কোন দয়া মায়া-ভক্তি নেই। সেই মানুষদের মঙ্গলের জন্যে এসেছেন জাগ্রত দেবতা। নাম সাচাঁদ আর গোরাচাঁদ সকাল থেকে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে এখানে। মেলা বসে। মানুষের বহুদিনের অসুখ বিসুখ সব ভাল হয়ে যায়, গোরাচাঁদের কৃপায়। সাচাঁদের কল্যাণে।

পাঁকের মত জলে নেমে পুকুরের দল বেঁধে নেমে খোঁজে ওষুধ। গোরাচাঁদ নাকি স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছেন, সমস্ত রোগের ওষুধ এই পুকুরেই পাওয়া যাবে। তাই মানুষ হাতড়ায় কোথায় তার সেই অমোঘ ঔষধ। যাতে তার রোগ নিরাময় হবে।

মায়ের সঙ্গে পদ্ম যায় গোরাচাঁদ, সাচাঁদ দর্শনে। সব কিছু দেখে খুব হাসে। কয়েকজন পুরুষ মহিলা কিছু শিকড়-বাকড় হাতে

পেয়েই মাথায় ছোঁয়ায়। চিৎকার করে ওঠে, 'জয় বাবা গোরাচাঁদ'। 'জয় বাবা সাচাঁদ'।

অন্নপূর্ণার স্নান হয়ে যায়। ওষুধ পায়। বিরাট একটা চড়া-পুকুর থেকে একটুকরো শিকড় যোগাড় করা এমন কি অসুবিধার? পাড়ে এসে কাপড় ছাড়ে অন্নপূর্ণা। তার কাদামাখা কাপড়খানা একটা গামছায় বেঁধে নিয়ে আগে আগে হাঁটে পদ্ম। প্রায় মাইল খানেক পায়ে-হাঁটা ফাঁকা মেঠো পথ। কোথায় আলের ওপর দিয়ে, কোথায় 'আরিশ পড়া' পথে হেটে চলে মানুষ। দলে দলে। সবার মুখেই মহিমা কীর্তন।

বাগুনহাড়িয়া গ্রামের কে যেন আজীবন ভুগছিল কঠিন হাঁপানিতে। এখানে এসেই বাস। সোনাপুরের মেয়ে পঙ্গু অথর্ব হয়ে গিয়েছিল। এখানে এসেই ভাল হয়ে গেছে। মাঠের আলে আলে বাবলার সারি। দু'চারটে তালগাছও চোখে পড়ে। রোদ্দুরের যাত্রীরা এরই নিচে মাঝে মাঝে ছায়া খোঁজে। মাথার ওপর শঙ্খচিলের দল ঘুরপাক খায়। সুতীক্ষ্ণ চিৎকারে জমাট-বাঁধা স্তব্ধতা ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। অদূরে নৌকো-ভাসা নদীর দিকে সবার চোখ। ওপারের সবুজ গাছগাছালি-ঢাকা গ্রামগুলি থেকে এসেছে ওরা। আবার ফিরে যাবে। কিন্তু কি হবে রোগ নিরাময়ের। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর'—চামর হাতে শুভ্র চুল দাড়িওয়ালা লোকটির গান স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পদ্ম আঁচল দিয়ে মুখের কপালের ঘাম মুছে ফেলে মায়ের মুখের দিকে তাকায়। বিশ্বাসের একটা শক্ত পাথরের ওপর যেন ঘাম জমেছে। বিন্দু বিন্দু ঘামের দানাগুলো মুছে ফেলার পর, আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেন বিশ্বাসের 'চাওড়গুলো'। বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে পদ্ম। এর উৎস কোথা, সে জানতে চায়!

হীরু প্রধানদের বাড়ির পাশে বিরাট জঙ্গলটার কথা মনে পড়ে তার। একদিন ঢুকেছিল সে ওই জঙ্গলে। আগে মানুষজন যেতো

না। ভূত-প্রেতের রাজ্য বলে জনশ্রুতি ছিল। পরে দেখা যায় এই কথা চালু করে রাজবংশী পাড়ার একদল লোক লুকিয়ে দিব্যি কাঠ ভেঙে নিয়ে যায়। নারকোল পাড়ে, পিঁপড়ের ডিম ভাঙে। বড় মৌচাক হলে তাদের দৃষ্টি এড়ায় না। সেই বনের মাঝামাঝি একটা দীঘি। খুব বড়। ছোট্ট ছোট্ট ইট দিয়ে ঘাট বাঁধা। ঘাটে লোকজন বসার দু-পাশে উঁচু 'আলসে'। আশে পাশে গেলে ছুটে আসে একপাল মশা। শালিক পাখির মত। চারপাশের গাছগুলো এক ফোঁটা আলো আসতে দেয় না। এর আশপাশের জায়গা দুর্গন্ধ পচা পাঁকে ভরা। শরীরের কোনো জায়গায় লাগলে মনে হবে 'বিছুটি' লেগেছে।

বিরাট দীঘি। বাঁধানো ঘাট। লোকজন বসার জায়গা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন অন্ধকারে পড়ে থাকে। পরে অবশ্য চক্রবর্তী বাবুদের চোখ পড়তেই মানুষ জন লেগে যায়। গাছপালা সাফ হয়। জল ছেঁচে শুকিয়ে দু-ছাড় মাটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্যাস। অন্ধকার জঙ্গলের রাজত্বের শেষ। শুরু হয়ে যায় খোলা মেলা মানুষ জীবনের রাজত্ব। রাজবংশীদের রাজত্বের অবসান ঘটে। মানুষের মুখে মুখে শুধু ফেরে এককালের কথা, জঙ্গলের মধ্যে তৈই পেল্লাই পুকুর। পেরথম বষার ভাবি জল নামলেই চৌকি, কোঁচ নিয়ে পুকুরের চার পাশে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো তারা। মাথা নেড়ে নেড়ে উঠে আসতো, ইয়া ইয়া অজস্র কৈ, মাগুর, শোল—

পদ্মর মনে হয় মানুষের মনেও এখন এমনি অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। তার মা কিংবা সে এ থেকে মুক্ত নয়। এখানে, তাদের মনে আলো কি ভাবে আসবে? কে বন-জঙ্গল সাফ করবে? কে করবে পুরাতন পাঁকের সংস্কার?

অন্নপূর্ণা মেলা-পার্বনে ঘুরে বেড়ায়। পদ্মকে সাথী করে নেয়। এতেই তার শান্তি।

হীরাপুরের মা মনসা সবার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। মেয়েকে নিয়ে

অন্নপূর্ণা আসে 'মনসার থানে'। সারাদিন এখানে কাটিয়ে, করনীয় সবকিছু করে তবে বাড়ি ফেরে।

খেয়া নৌকোর পাশে প্রচুর মানুষজন। কাপড়ে-চোপড়ে যাদের একটু কেতাদোরস্ত মনে হয়, তারাও নির্বিবাদে ছুটে আসে বৌঝিদের নিয়ে। পদ্ম কপালে হাত রাখে। তার মা আর তাকে ঘিরে যে চিন্তা এতক্ষণ আবর্তিত হচ্ছিল, সেখানে অনেক মানুষের পদধ্বনি শোনা যায়। দেশ জোড়া মানুষ আজ, রাজবংশীদের ঘিরে রাখা, জঙ্গলেভরা পচা পুকুরটা'র আশে পাশে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বাড়ি ফেরার নাম হলে সবাই কেমন যেন ছটফটিয়ে ওঠে। নৌকোয় হুড়মুড় করে সবাই উঠতে চায়। মাঝি বার বার হুঁশিয়ারী দেয়, বেশি লোক নিতে পারবুনি আমি। জলের টানটা দারুণ বেয়াড়া চলেচে। আমার কথা শোন।

কে কার কথা শোনে।

পদ্ম বলে, মা নেমে যাবে ?

এর পরেরটাতেও তো একেই অবস্থা হবে মা। লোক তো আর কম নেই।

আর কোন কথা বলে না পদ্ম।

জলে ঝপাস ঝপাস দাঁড় টেনে কিছুদূর নদীর ধার দিয়েই নৌকো এগিয়ে যায়। মোটামুটি হিসাব করে নিয়ে মাঝি বলে —এতক্ষণ ধার দিয়ে এলে বাবু—কোন অসুবিধে ছিলুনি। পাড়ি দেবার সময় বলে দিচ্ছি, সব চুপচাপ বসে থাক্‌বে। একটু নড়াচড়া করবেনে। নৌকো যতই নাচুক—ইদিক উদিক করুক চুপচাপ বসে থাক্‌বে তোমরা। মোটে সরাসরি করবেনে। আঠা লাগার মত চেপে বসে থাক্‌বে। মালিকের ইচ্ছেয় আমি ঠিক করে নুবো। আর বলি কি ইদিকেও সন্দে হয়ে এলো। মানুষজন বাড়ি ফিরবে তো।

পদ্ম তাকিয়ে থাকে মাঝির দিকে। শিরাওঠা পেশী বহুল দুটো হাতে হাল ধরা। চোখের দৃষ্টিতে এতটুকু ভয় নেই। মুখের পেশীতে চোখের দৃষ্টির ভাষা যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

এগিয়ে চলে নৌকো। পদ্ম তাকিয়ে থাকে মাঝ গাঙের 'বয়া'-টার দিকে। একখানা জাহাজ ছুটে আসছে সমুদ্রের দিক থেকে। বুড়ুলের বাঁকের কাছে দেখতে পাওয়া যায় ওটাকে। সেদিকে তাকিয়ে মাঝির দৃপ্ত চোখে পড়ে বিপন্নতার ছাপ। কয়ে 'ঝিঁকে' মেরে সাহস সঞ্চয় করে নিজের মধ্যে। চিৎকার করে—সাবাস জোয়ান-জোরসে টান—

দাঁড়ি দুটো জোরে জোরে দাঁড় টানতে থাকে।

নৌকোর মুখটা ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে নেয় মাঝি, ঢেউ কাটাবার জন্যে। সাহস করে এত যাত্রী নিয়ে ওপার-মুখী হতে পারে না। কলের জাহাজ দ্রুতগতিতে এসে বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

মাঝির মাথায় দ্রুত গতিতে চিন্তার পর চিন্তা ছুটে আসে। অনেক অনেক রকম ভাবনা।

জাহাজখানা গমগম্ করতে করতে কোলকাতার দিকে চলে যায়। উঁচু উঁচু ঢেউ ছুটে আসে।

একটুও নড়বেনি মা-জননীরা। একটুও না।—বলে শক্ত হাতে হাল আঁকড়ে ধরে মাঝি। নৌকো আড় হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে একটা কলরোল ওঠে।

বোসো—বোসো মা—বোসো—সব্বোনাশ করুনি—করুনি—চুপ করে বোসো—। কিন্তু কেউ সে কথায় কান দেয় না।

এর পরেই নদীবক্ষের এই সমবেত চিৎকার খণ্ড বিখণ্ড হয়ে স্রোতের ওপর ভাসতে থাকে।

আশপাশে কোন নৌকো ডিঙি নেই। শুধু ওপারের খেয়া নৌকোটা এই দৃশ্য দেখে দ্রুত গতিতে ছুটে আসে।

আশপাশ থেকে জেলে নৌকো ছুটে চলে উদ্ধারের কাজে।

কিন্তু স্রোতের-মুখে-পড়া সজীব মানুষগুলি এক জায়গায় থাকে না। কে কোথায় ভেসে যায় তার কোন হদিশ পাওয়া যায় না।

পরে দেখা যায় একটা ছোট লঞ্চ কোলকাতার দিক থেকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। ঘটনা স্থল বরাবর এসে লঞ্চখানা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে। ভাসমান দু'একজনকে উঠিয়ে নেয়। দ্রুত গতিতে ছুটে যায় লঞ্চখানা।

॥ ১২ ॥

কেমন একটা অলস অলস ভাব আজ গ্রাস করে মহাবীরকে। চুপচাপ বসে থাকে আজব কুঁড়েঘরের সামনে। পুরাতন অনেক চিন্তাই আজ চোখের সামনে ভিড় করে আসে। ভারাক্রান্ত করে দেয় মন প্রাণ। সাধুবাবা রাতদিন বলে বেড়ায়, সারা দেশ জুড়ে যে দুঃখ-কষ্ট তাতো মানুষের নিজেদের পাপের ফল। পাপের ফল সব্বাইকে ভোগ করতে হবেই।

নিজের জীবনের ছোট্ট পরিধিতে এনে কথাগুলো ভাবে মহাবীর। পাপের জন্যে তার বাবার মৃত্যু। মায়ের মৃত্যু। তার সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট। এই শ্মশান-জীবন। এ সব কি এ জন্মের পাপ না হলেও আগের জন্মের পাপের ফল? তা কেমন করে সম্ভব?

এমন সময় শ্মশানে যাত্রী আসে।

মহাবীর উঠে দাঁড়ায়। নদীর বাঁধের দিকে তাকায়। তাকায় সুবিস্তৃত নদীর চরের দিকে।

কাজ এগিয়ে নিয়ে যায় 'শ্মশান যাত্রীরা'। তাদের মধ্যে কথাবার্তা সমানে চলতে থাকে। একজন বলে, মানুষ চেনা সত্যিই মুশকিল ভাই।

ঠিক বলিচিস। ওপরকার খোলোস দেখে মানুষ চেনা যায়নে রে ভাই।

যা বলিচিস। কে জানতো বল, 'সাধু-সন্নিসীরা' গেরুয়া পরে, ডাকাতি করে।

সত্যিই ভাই, ভাবতে খুবই কষ্ট হয়।

নিশিকান্ত সাধু ডাকাত যা তা কথা ?

হ্যাঁ ভাই। পুলিশ মামার-বাড়ি নিয়ে গেছে তাকে। বেদম মার মেরেচে। 'মাল-বামাল' পেলে কি সহজে ছাড়ে ?

মাল পেয়েছে ?

হ্যাগো— হ্যাঁ। তোমার পড়শির কাছেও অনেক মাল পেয়েছিল।

এ আবার কেমন ধরনের কথা! এও কি সম্ভব ? সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। নদীর ঘূর্ণিটা যেখানে শুধুই ঘুরছে সেদিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মহাবীর।

চিতার আগুনে নদীর জলের একাংশ বিশেষ ভাবে আলোকিত। তার পাশেই জমাট-বাঁধা অন্ধকার। আজ শ্মশান-যাত্রীদের কাছে ছুঁচুমুক খেতেও ইচ্ছা করে না মহাবীরের। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এক সময় তার মনে হয়, নদীর জলে কি একটা যেন ভেসে যাচ্ছে। উঠে যায় মহাবীর। ভাসমান বস্তুটির পিছু ধাওয়া করে। ভাটার নদী। নিচের দিয়ে বয়ে যায় খরস্রোত। কাঠের একখানা তক্তা ছাড়া আর কিছু ঠাওর করা যায় না। আর কিছু আছে নাকি ওটার সঙ্গে ? যা হোক। দেখা যাক—মহাবীর এগিয়ে যায় পিছু পিছু। এক সময় জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সে। কাঠের কাছাকাছি গিয়ে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আহত হয় মহাবীর। কাঠের ওপর মাথা রেখে এক নারীমূর্তি, দু'হাতের আঙুলগুলি দিয়ে শক্ত করে ধরে আছে কাঠখানা। বাঁচার সুতীব্র আকাঙ্খায়। প্রতিটি আঙুলে সেই তেজ পুরোপুরি সঞ্চারিত। কিন্তু বেঁচে আছে কি হতভাগী!

শ্মশানে অনেক মৃতদেহ দেখেছে মহাবীর। বিচলিত হয়নি

কোনদিন। কিন্তু এই ধরনের জীবনাকাঙ্খার প্রয়াস ?...আর ভাবতে পারেনা মহাবীর। ভাসমান অবস্থাতেই পক্ষশূন্য জটায়ুর মত যন্ত্রণায় ছটপট করতে থাকে সে।

আজ যন্ত্রণার মধ্যেও উপলব্ধির এক নতুন সুর বেজে ওঠে পাশা-পাশি। জীবন কি শ্রেয়ঃ! তাকে ধরে রাখার জন্য, মানুষের কি দুর্দমনীয় প্রচেষ্টা। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়?

তাড়াতাড়ি দেখতে হবে। প্রাণপাখিটা এখনো যদি থাকে। দেরি হয়ে গেল না তো?

প্রশস্ত এক চরভূমি। কাঠখানা ধীরে ধীরে সেখানে ভাসিয়ে আনে মহাবীর। চেতনাহীন দেহটাকে ধীরে ধীরে টেনে আনে শুষ্ক বালুকা রাশির ওপর। ভক্ত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। চিৎকার করে তীব্র কণ্ঠে। মহাবীর সংযত হয়ে বলে, চুপ রও, চুপ রও বেটা। নারীদেহের নাকের কাছে মুখখানা এনে পরখ করে। মুচ্‌কি হেসে আপন মনে বলে, ভগবানের দয়ায় এখনো বেঁচে আছে। দেখি, যদি চাঙ্গা করে তুলতে পারি।

ইঙ্গিতে ভক্তকে এখানে থাকতে বলে, উর্দ্ধশ্বাসে শ্মশানের দিকে ছুটে যায় মহাবীর। কাঠ, পাতা, আগুন, কাপড় সব কিছু এসে যায় নিমেষের মধ্যে। আগুন জ্বালে মৃতপ্রায় রোগিণীর পাশে। শুকনো কাপড়-চোপড়ের উত্তাপ দেহে যে ক্ষীণ আরামটুকু সৃষ্টি করে, তার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয় আগুনের উত্তাপ। বহুক্ষণ জলে থাকায় দেহের সর্বাঙ্গ কেমন যেন কুঁকড়ে গেছে। রঙ ফ্যাকাসে। এতটুকু রক্ত নেই যেন।

মৃত মানুষের শেষকৃত্যকে ঘিরে 'আজব আস্তানা'র ধারে যার কাজকর্ম সীমাবদ্ধ, আজ মানুষ বাঁচানোর কাজে তার নিপুণ কার্যক্রম চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না। এমন আন্তরিক সেবাযত্নের মধ্যে দিয়ে মহাবীরের হৃদয়ের সত্যকার রূপটি বিকশিত হয়ে ওঠে।

শ্মশানভূমিতে যন্ত্রের মত কাজ করে যায় মহাবীর। তার মধ্যে না থাকে আনন্দ না থাকে কোন সুখ। আজকের কাজের মধ্যে, অফুরন্ত আনন্দের ঝর্ণা যেন নেমে আসে। প্লাবনে ভাসিয়ে দেয় সব কিছু। যেন নতুন মানুষ হয়ে যায় মহাবীর। এত সুখ লুকিয়ে ছিল এই জীবনের মধ্যে, তা যেন বিশ্বাস করাই যায় না। মৃত্যুর দরজা থেকে কাউকে ফিরিয়ে এনে এত সুখ! এত আনন্দ!

মহাবীরের মনটা আজ প্রজাপতির পাখনার মতই নৃত্য করে ঘুরে বেড়ায়।

কয়েক ঘন্টার পর নিশ্চল দেহটির মধ্যে প্রাণের স্পন্দন দেখা দেয়। চোখ দুটো খুলে শয্যাশায়িনী বলে, এ আমি কোথায়? মা কোথা?

ব্যস্ত-সমস্ত মহাবীর বলে, কোনো ভয় নেই। নদী থেকে উঠিয়েছি। মা ভাল আছে। তোমার নাম কি?

পদ্ম। নাম বলার পর চোখ বুজোয় পদ্ম।

মহাবীর তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। হাঁ। সত্যই পদ্ম! চোখে-মুখে ভারি সুন্দর রূপ!

মৃত্যুর পাঞ্জার সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে বিবর্ণ রক্তহীন অবস্থার পরিবর্তন হয় ধীরে ধীরে। সারা শরীরের ওপর পলিমাটির হাল্কা আস্তরণ। যেন কোন নিপুণ শিল্পী অঙ্গরাগ সৃষ্টি করেছেন সযত্নে। মহাবীর মত্ত মৌমাছির মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। পদ্মর প্রাণের স্পন্দন মহাবীরের শরীরের শক্তিকে হাজার গুন বাড়িয়ে দেয়।

পাশ ফিরে শোয় পদ্ম। পাশে আগুন জ্বলে। ভক্ত লেজ গুটিয়ে হতভম্বের মত বসে থাকে। মাঝে মাঝে মনিবের মুখের দিকে তাকায়।

মহাবীর বিড়ি টানে একটার পর একটা। লক্ষ তার লেপটে থাকে পদ্মর মুখের ওপর। মাঝে মাঝে পদ্মর খুব কাছাকাছি এসে

জিজ্ঞাসা করে, কি দরকার?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পদ্ম বলে, না, কিছু চাই না। আকাশ-ভরা তারাদের দিকে একবার তাকিয়ে নেয় সে। আবার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। বলে, মা ভাল আছে তো?

হাঁ হাঁ, বহুৎ ভাল আছে।

পাশে জলন্ত আগুনে ডালপালা আর কাঠ পোড়ার শব্দের সঙ্গে নদীর আর্দ্র কল্লোল এক নতুন সুর সৃষ্টি করে।

কষ্ট হচ্ছে পদ্ম? মহাবীর জিজ্ঞাসা করে।

না। কষ্ট হবে কেন? তুমি আমার জীবনদান করলে। যত কষ্ট দুঃখ ছিল সব দূরে সরিয়ে দিলে। আর আমার কিসের কষ্ট। এবার মায়ের মুখটা দেখিয়ে দাও। সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে।

মহাবীরের চোখ দুটো পদ্মর আবেগ জড়ানো আবৃত্তির মত কথাগুলোর স্বাদ আস্বাদনের আবেগে থর থর করে কাঁপতে থাকে। তার সারা শরীরেও কাঁপন লাগে। জীবনের এমন উষ্ণ পরশ আগে সে কোনদিন পায় নি। তাই আনন্দে আদিম উদ্দামতায় নৃত্য করবে কিংবা চিৎকারে চিৎকারে সবার রাতের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে কিছু ঠিক করতে পারে না। কিন্তু একটা বিরাট বাধা এসে তার সামনে দাঁড়ায়। পদ্ম অসুস্থ। পদ্মর ক্ষতি হতে পারে। তাই মাঝে মাঝে চিৎকাররত ভক্তকেও চুপ করিয়ে দেয়। এ্যায়—চোপ্— চোপ্—

প্রকৃতির কি পরিহাস! বেশ কয়েক ঘণ্টা যে মানুষটা জল-স্রোতের ওপর জীবন যায় যায় অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে— জল যার জীবনকে গ্রাস করার জন্য লক্ষ লক্ষ জিহ্বা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে লেহন করেছে—ক্ষীণ কণ্ঠে সে কিনা এখন বলে, একটু জল দাও।

মহাবীর হাসে। বলে, জল খাবে?

হাঁ।

মহাবীর ছুটে চলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে জল আনে। তোবড়ানো গ্লাসটার দিকে বার বার তাকিয়ে পদ্মর মুখে জল ঢেলে দেয় মহাবীর। সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দিয়ে মা যে আনন্দ পায়, সেই অনির্বচনীয় আনন্দে তার মন ভরে ওঠে। একসময় সে বলেই ফেলে, ভাল গেলাস বাসন আমার নেই।

কথাটা পদ্মর কানে যায়। মহাবীরের দিকে চোখের তারা ছুটো স্থির নিবদ্ধ করে বলে সে, নাই থাকুক বাসন গেলাস, তাতে কি আসে যায়। তোমার যা আছে, তা আজ ক'জন মানুষের আছে? মৃত্যুর হাত থেকে নিজের লোকের মত আমায় বাঁচালে। সেবা যত্ন করছ। 'জান' দিয়ে দেখছ আমাকে, এর কি কোন দাম নেই? আমার হারিয়ে যাওয়া জীবনটাকে জল থেকে খুঁজে বার করে আনলে তুমি। আমার জীবনদান করলে।—ধীরে ধীরে বলা শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত পদ্মর গলার স্বর বেশ উঁচু গ্রামে উঠে যায়। উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকে পদ্ম।

মহাবীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, বন্ধ কর। বাত বিলকুল বন্ধ কর। শরীর খুব খারাপ। এখন বেশি –

নীরবে ছুই চক্ষু বন্ধ করে পদ্ম।

আকাশে একরাশ তারা। ওর মধ্যেও ছুটেছে জীবন-প্রবাহ। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা আমাদের ছোট্ট জীবনের মধ্যে। সব কিছুই এক সুনির্দিষ্ট গতিপথে বিশেষ পদ্ধতিতে অগ্রসরমান। যদি এতটুকু ভুল ডেকে আনে, বিপর্যয়। মহাপতন। একটা নিয়মের রাজত্ব চলেছে বিশ্বজগৎ জুড়ে। এর একটু এদিক ওদিক হলেই তার মাশুল দিতে হবে। এমনি একটা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে পদ্ম।

সকালে সূর্য ওঠার সাথে সাথে নদীর তীরে অজস্র মানুষ ছুটে আসে। সন্ধ্যা ঘনাঘনি যে নৌকোডুবি হয়, তার খবর কেউ কেউ পায় অনেক রাতে। কেউ কেউ শেষ রাতে। বাড়ির লোককে না পেয়ে

অনেকে সারারাত হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এপাড়া ওপাড়া করে বেড়ায়। নদীর ধারে ঘুরে আসে। শেষ পর্যন্ত সর্বনাশা খবরটা পেয়ে বুক-চাপড়ে আর্তনাদ করে।

নদীর তীরে লোকজন বলাবলি করে, জাহাজ থেকে প্রচুর কাঠ ফেলে দিয়েছে। 'জালি বোটে' কয়েকজন নদীতে নেমে আসে। তারা বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

চেঁচামেচিতে কেমন যেন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে পদ্ম। একটা স্রোতের হাত থেকে রেহাই পাবার পর আর একটা এসে যেন আক্রমণ চালায়। পাড়ার লোক এসেছে। নানা ধরনের প্রশ্ন করে সবাই। প্রশ্নের ধরন দেখে, অল্প ক্ষণের মধ্যে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায় পদ্ম। কয়েকঘণ্টার মধ্যে তার জীবনীশক্তি এতটা হ্রাস পেয়েছে, আগে সে আদৌ আন্দাজ করতে পারে নি। একবার বসার চেষ্টা করে বিফল হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার দু'চোখ জলে ভরে যায়। এমন সময় তার বাবা পাগলের মত এইতো আমার মা – এইতো আমার মা--বলে চিৎকার করতে করতে নেমে আসে চরভূমিতে। পদ্ম তার হাতের মুঠোর মধ্যে যেন একটা বিরাট শক্তি পেয়ে যায়।

শ্রীমন্ত বলে, তোর মাকে সাহেবরা হাসপাতালে দিয়েচে। জাল আড়ছিল দামু পাকড়ে নিজের চোখে দেখেচে। আর আমার কুন্নু ভাবনা নেই। পদ্মর বুকখানাও মায়ের সংবাদে কেমন যেন নেচে নেচে ওঠে। স্পষ্ট সে অনুভব করে, প্রকৃতির মধ্যে এতক্ষণ যে সুর বাজছিল তার পরিবর্তন হয়। শক্তি সাহস কোথা থেকে অজস্র ধারায় ছুটে আসে। পদ্ম শক্তি-সমুদ্রে অবগাহনের পর সমস্ত দুর্বলতাকে পদাঘাত করে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে যেন দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করতে চায়, আর আমি অসহায় নই, শক্তি সাহস আমারও আছে।

শ্রীমন্ত বলে, চল্ মা।

হাঁ বাবা।··পদ্ম কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দৃষ্টিতে ক্ষণকাল নীরবে

তাকায় মহাবীরের দিকে। ধীরে ধীরে পরক্ষণে বলে, উনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন।

ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। দীর্ঘ জীবন লাভ কর বাবা।

মানুষের ভীড় বাড়ে। মহাবীর ধীরে ধীরে পিছু হাঁটতে থাকে। তার জীবনে এক নূতন অভিজ্ঞতা আস্তে আস্তে দানা বাঁধে। কি অদ্ভুত এই পৃথিবীর জীবনধারা! একটু আগে তার যে কাজ স্বর্গীয় মহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে কালিমার আবিলতা। তাই সাবলীল প্রাণধারা মুহূর্তে যেন অন্তর্হিত হয়ে যায়। ছোটখাটো টিপ্পনী কানে আসে। এই সমস্ত টিপ্পনীতে মহাবীরের চোখে-মুখে অপরাধবোধের একটা পাতলা পরদা দোলা খেতে থাকে।

তুই থাম থাম, ও এমনি এমনি কাজটা করে ফেললো।

রামো—রাম।

পরোপকার! আহা—হা—চোখটা কোথায় ছিল বাছাধনের।

আরে বাবা মরা মানুষকে আগুন দিয়ে পিটে-পিটে পুড়িয়ে ফেলা যার কাজ, সে ছুটে এলো কিনা মানুষ বাঁচাতে। বিনা স্বার্থে?

সহ্য করতে পারে না মহাবীর। এক সময় ভীড় কাটিয়ে সরে যায়। এত অপমান! এই ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত? এ কাজে তার না আসাই বোধহয় উচিত ছিল। পরক্ষণে শ্রীমন্তর চলে যাবার সময়কার কথাটা তার কানে বাজে। মা গঙ্গার ওপর দিয়ে কত পচা মড়া, দুর্গন্ধ বিষ্ঠা ভেসে যায়। তাতে কি গঙ্গার পবিত্রতা নষ্ট হয় বাবা। যে যা বলে বলুক, তুমি মহাপুণ্যের কাজ করেছ বাবা। ঈশ্বর দিয়েছে জীবন। আর বিপদে-পড়া সেই জীবনকে তুমি রক্ষা করেছ। তাই তুমিও আমার কাছে ঈশ্বরের সমান।

মহাবীরকে সামনে পেয়ে একজন অট্টহাসি হেসে বলে, নাটক জমেছে গো দাদা—নাটক জমেছে—

নৌকো থেকে ছিটকে পড়েছিল। কিছুই হয়নি। সারারাত নদীর চরে--চোখে মুখে আর ভঙ্গিতে এক ধরনের কদর্য ইঙ্গিত সৃষ্টি করে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কথাগুলো বলে যায় একজন। হাঁ করে তা উপভোগ করে একঝাঁক মানুষ।

মহাবীর ভাবে 'মানুষের দুনিয়ায়' সব কিছু সম্ভব। সত্যকে এক ঝট্‌কায় মিথ্যা বানিয়ে দিতে পারে। আবার মিথ্যাকেও সত্য বলে চালিয়ে দিতে পারে নিশ্চয়। সত্য মিথ্যার অবস্থান সম্পর্কে এতদিন তার চিন্তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সত্য নিশ্চয় স্বর্গীয় পরিবেশে একটি সুউচ্চ আসনে সমাসীন। মিথ্যা থাকে অনেক নিচে, নরকের পরিবেশে। আজ তার সেই চিন্তা সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বুক-থেকে-পাঁজর-খসিয়ে-নেওয়া বেদনার সঙ্গে সে লক্ষ্য করে, চক্ষের পলক পড়তে না পড়তে সত্যের সেই সুমহান বেদী নরকের দুর্গন্ধ কালিমায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় যেন।

হায় ভগবান। হায় রামজী। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাবীর।

কত রকমের কথার মধ্যে দিয়ে অবসন্ন শরীরে পথ করে নিতে হয় পদ্মকে। এই মুহূর্তে তার মনে হয়, মরলেই ভাল হত। মৃত্যু! চমকে ওঠে পদ্ম। একটু আগে যার শীতল হাত তার সমস্ত শরীরকে বেষ্টন করেছিল। প্রতি মুহূর্তে আহ্বান জানাচ্ছিল, চরম শীতল পরিসমাপ্তির জন্য। না না। অকটোপাশের বাঁধন ছিন্ন হয়েছে। আরো এগিয়ে যেতে হবে। সমস্ত বাধা-বিপদের মধ্যেই পথ করে নিতে হবে। সমস্ত পরিবেশ পদ্মর হৃদয় মন্থন করতে থাকে যেন নির্দয় ভাবে। দু'চোখ জলে ভরে যায়। সেই জল সামলাতে সামলাতে দেখে, মহাবীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পদ্ম বলে, বাবা, ডাকো ওকে।

ডাক শুনে ধীরে ধীরে সামনে এসে দাঁড়ায় মহাবীর।

পদ্ম মহাবীরের শক্ত আঙুলগুলো তুলে নেয় দু'হাতে। বলে, যে

যাই বলুক। তুমি তো আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। যতদিন বাঁচব, এ কথা আমার মনে থাকবে।

মহাবীরের চোখে জল দেখা দেয়। এমন বিরুদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই মেয়েটির দৃঢ়তা আর আপনজনের মত স্বচ্ছন্দ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়। এতটুকু সঙ্কোচ বা আড়ষ্টভাব দেখা যায় না তার মধ্যে। খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঝক্‌ঝক্ করে। মহাবীর মনে মনে বলে, সাব্বাস!

একটু আগে তার চিন্তা-ভাবনা যে ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে পাক খাচ্ছিল, সেখান থেকে মুক্তি পায়। হন্‌হন্ করে এগিয়ে যায় মহাবীর।

দিনের অজস্র আলো হুড়মুড় করে কখন পালিয়ে যায়। মহাবীর তার আজব আস্তানার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সে তন্ন তন্ন করে পৃথিবীকে দেখে। গঙ্গা ফড়িংগুলো খুশির আতিশয্যে সবুজ ঘাসের চত্বরে লাফিয়ে বেড়ায়। এদের ওপর পড়ন্ত সূর্যের আলোর ঝর্ণার অকৃপণ দান বর্ষিত হতে থাকে। এ দৃশ্য হয়ত প্রতিদিনকার। কিন্তু মহাবীরের মনে হয়, আজই যেন কে এই সমারোহ নিয়ে তাকে অভিনন্দিত করছে। তার মনের মধ্যে এক অব্যক্ত আনন্দ কেমন যেন এই পরিবেশে শিষ দিয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে সূর্যের শেষ চিহ্ন অন্তর্হিত হয়ে যায়। মহাবীরের সামনে ফিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়। এ জিনিস কোনদিন সে দেখে নি বলে মনে হয়। ঘন অন্ধকারের আবেষ্টনীর মধ্যে এক ধরনের আরাম পায় আজ মহাবীর। এই আরাম সে মনের ভেতরে বিশেষভাবে অনুভব করে যেন। কিন্তু এই অবস্থাটা বেশিক্ষণ টিকে থাকে না। কেমন যেন হোঁচট খায় মহাবীর। পদ্মার ব্যথিত মুখখানা সন্ধ্যাতারার মতই তার সামনে ফুটে ওঠে। জীবনের সলতেটিকে জ্বালিয়ে রাখার জন্য রীতিমত মূল্য দিয়ে যাচ্ছে বেচারা। পদ্মার দুঃখের আয়নায় মহাবীর

আজ তার নিজের ক্ষতবিক্ষত জীবনখানা স্পষ্ট দেখতে পায় যেন ; তাকেও চলতে হবে এই পথে। এই একটি পথই খোলা আছে বোধহয় বাঁচার জন্যে। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে ফুটে ওঠে পদ্মর তেজী দুটো চোখ। আজ অসংখ্য মানুষকে তো সে দেখল নদীর চরে। তাদের কারো কথাবার্তা, হাবভাব এমনভাবে তাকে আকৃষ্ট করেনি। তবে কি মেয়েমানুষ বলে সে কিছুটা দুর্বল হয়ে গেছে? কিন্তু এর আগে অনেক মেয়েমানুষ তো এসেছে তার আশেপাশে। তারা হয় ঢোঁড়া সাপ, নয় ফেউ শিয়াল। পদ্ম 'জাত সাপ', কিংবা বাঘিনী। চিন্তার আনন্দে মশগুল হয়ে ওঠে মহাবীর। রাত বেড়ে যায়। আজ আর নিফটক পাড়ায় যায় না সে। নিজের আস্তানার পাশে বসে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

অন্নপূর্ণা সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে আসে। তার অনেক আগেই ঝড় মাথায় করে পদ্ম গ্রামের মাটিতে পা রাখে। বাড়ির আশপাশের মেয়েরা এসে ভিড় জমায়। কিন্তু জীবন রক্ষা পাওয়ার জন্য আনন্দ কারো কথার মধ্যে বেরিয়ে আসে না। সবার চোখে মুখে ভাসে আতঙ্কের কাল মেঘ। শত্রু-শিবিরে জয়ধ্বনি। মোড়ল-মশায়রা রবাহূত চলে আসেন শ্রীমন্তর বাড়ির সামনে। দরাজ গলায় বলে যায়, সোমত্ত মেয়ে। সারারাত একটা চাল-চুলোহীন বাউণ্ডুলে লোকের সঙ্গে হল্লা করে কাটালো? তাকে ছিমন্ত ঘরে তুলতে চায় কেমন করে? এতে কি গেরামের ইজ্জৎ থাকবে না সমাজের ইজ্জৎ থাকবে?

উঠোনের মাঝখানে কিছুক্ষণ পাথরের প্রতিমার মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে পদ্ম। তারপর ঠক্ ঠক্ করে কাঁপে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে, নৌকোডুবি হল। ভেসে গেলুম। জীবনটা চলেই যেত। যে জীবনটা বাঁচালো, সে তো সত্যিকারের মানুষের মত কাজ করল। আমার কাছে সে শুধু মানুষ নয়, দেবতা। তাকে জড়িয়ে এমন খারাপ কথা বলছেন আপনারা?

আমরা খারাপ কথা বলচি, না তুই ছুঁড়ি খারাপ কাজ করে এলি ? কালে কালে হল কি ? ঘোর কলি। ঘোর কলি।

সত্যি ঘোর কলি মোড়লমশাই। এমন দিনকে রাত করার কাল এর আগে কোনদিন ছিল কিনা আমার জানা নেই।

ছুঁড়ির আবার চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি আছে রে গোঁসাই। আচ্ছা, দেখাব মজা। দেখব বুলি তখন কোথায় থাকে।

শিউরে ওঠে অন্নপূর্ণা। পাঁচি পদ্মর হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। হা-হা করে ওঠে মোড়লের-সঙ্গে-আসা লোকজন। বলে, ঘরে ঢোকা চলবেনে। আগে বিচার হোক।

ঘরে ঢুকতে বাধা পেয়ে বাঘিনীর মত ফুঁসে ওঠে পদ্ম। মোড়লদের ছোটখাটো দলটির দিকে তাকিয়ে বলে, সন্ধ্যায় আপনারা বসুন। যা করবার করুন। কিন্তু সারা রাতদিন কষ্ট-পাওয়া একজন মেয়েকে আপনারা কি করে বলেন, বাইরে থাকতে ? আপনাদের কি এতটুকু দয়ামায়া নেই ? সব পাথর হয়ে গেছেন আপনারা। এখন আমি ঘরে যাব। যা করার সন্ধ্যায় করবেন।

এর জন্যে পরাচিত্তির করতে হবে।

শ্রীমন্ত লাফিয়ে উঠে বলে, করতে হয়—করব। তা বলে তোমরা ভেবেছ কি ? ডুবো মেয়েটাকে ফিরে পেইচি তাকে ঘরে তুলবুনি ? যা বিচার হয় হবে।

ভীমে, লোকে, শিবে, পরাশরেরা শুধু দল বেঁধে দাঁড়িয়ে নেই আজ, খুবই তৎপর তারা। প্রবীনদের মুখ তারাই খুলিয়েছে। ওটার জন্যে টাকাটা-সিকেটা যা খরচ করতে হয় তা তারা করেছে। এই খরচের বোঝা অবশ্য বহন করছেন গৌরীসেন। দূর থেকে কল-কাঠি সবই তিনি নাড়ছেন। মাছ ধরছেন। এক ফোঁটা জল তার শরীরে লাগছে না।

লোকে বলে, মাগীর রোক আছে। কায়দা করে বাড়ি ঢুকে

গেল, এ্যাকটো কত্তে কত্তে। সন্দেবেলা কিন্তু বেশি লোক জমা কত্তে হবে।

ভীমে বলে, সে আর বলতে। এক্কেবারে হাট বোঝাই। পরাশরে একটু গম্ভীর মেজাজে বলে, এত কষ্ট করে কাজ ওঠাব কিন্তু আমাদের ভোগে লাগবেনে। এই যা দুঃখু।

কথা শুনে শিবে চটে যায়। বলে, শালা টাকাও খাবি আবার ভাগেও ভাগ বসাবি? মামদোবাজী পেইচিস্ নাকি? উটি হবেনে। কারো হাতে যাবেনে ই চিজ।

পরাশরে তার গম্ভীর মেজাজ আরো গম্ভীর করার চেষ্টা করে বলে, শিবে ভাল করে ভেবে দেখ, তোর ল্যাজ নাড়ার যতটুকু সাধ্যি সব তো দপ্পণের জোরে। তার হুকুম ছাড়া একচুল ইদিক উদিক কত্তে পারিস তুই?

কথা শুনে কেমন যেন নেতিয়ে পড়ে শিবে। দু'চোখ তার দাঁড়িয়ে যায়। কোন কথা বলতে পারে না। পরাশরে তখন ধীরে ধীরে বলে, ল্যাজ আর নাড়িসনি। যা কচ্চিস করে যা।

॥ ১৩ ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। পাড়ার প্রায় প্রতি বাড়িতে অনুচ্চকণ্ঠে একই আলোচনা। কি হবে? সারাদিন পাড়ায় পাড়ায় 'নগরকীর্তনে' নামে একদল মানুষ। বয়স্ক থেকে শুরু করে হাল আমলের ছোকরারাও তা থেকে বাদ যায় না। পচা দুর্গন্ধের ওপর যেমন সব বয়সের মাছিরা 'ছাবরে' বসে।

পয়সার জোরে মেয়েদের যেন-তেন-প্রকারে পথে-বার-করে আনার দুষ্টচক্রের এ ব্যাপারে আড়মোড়া-খাওয়া-ভাব দেখে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। সবাই বুকের মধ্যে আগলে রাখতে চায় নিজের মেয়েটিকে। এদের নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই। দেশের রাজা

আর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তো এরাই। এরা সারারাত কাটায় বাড়ির বাইরে। বিয়ে-করা বউরা সবকিছু জানে। কিন্তু টুঁ শব্দটি করার জো নেই তাদের। সকালে স্নান সেরে তারা স্বামীর পুজো করে। কেউ কেউ স্বামীর পাদোদক পান করে সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

পাঁচি অন্নপূর্ণাকে ধীরকণ্ঠে বলে, যমের হাত থেকে রক্ষে পেল মেয়েটা, সে নিয়ে কুম্ম কথাবার্তা নেই। কথা খালি যে রক্ষে করল তাকে নিয়ে। এ তো বাবা উল্টো হিসেব। জান বাঁচাবার জন্যে দরিয়ায়-পড়া-মানুষ যা পায়—তাই ধরে কুলে উঠতে চায়। এই বুদ্ধিটা এদের মাথায় নেই। এরা সব মোড়ল না ছাগল তা কে জানে বাবা! সাধারণ হিসেব-নিকেশটা পর্যন্ত জানেনে!

এভাবে হিসেব না কষলে ওদের যে সুবিধে হয়নে ঠাকুরঝি। ভাঙাগলায় বলে অন্নপূর্ণা।

সেটা অবশ্যই ঠিক। ওদের জোর বেশি। তাই ওরা ওদের দিকে ঝোল টেনেই হিসেব করবে। সেখানে আমাদের শক্তি কতটুকুন? তাছাড়া পাড়ার লোকজন ভালমন্দ দোষগুণ বিচার না করেই, ওদের দলে ভিড়ে গেল। 'হুঁজুরের জয়' ছাড়া এরা আর অন্যকিছু বলতে জানেনে। অন্ধকারের জীব তো। তাছাড়া কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে 'পিসিডন', 'মহাজনদের' বিরুদ্ধে গান গাইবে? পাশের বাড়ির লোকজন অব্দি ভয়ে কথা বলেনে।

তাই হয়। শুনমু শ্মশানের সাধুবাবাকে পুলিসে ধরেছিল ডাকাতি, খুন ইত্যাদির মামলায়। ছেড়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে মাল-গছার জন্যে পড়েছিল চক্কোত্তি ঠাকুর। তিনিও ছাড়া পেয়েছেন। বড় উকিল ধরেছেন। বড় খুঁটি ধরেছেন। ব্যাস। হাজার হাজার টাকা তো ওদের কাছে কিছুই নয়। ওতেই সব 'সাফ'। সব 'সাখারা'। তাই তো বলি। দিদি, ওদের অঙ্গে কালি লাগালে, ঝেড়েঝুড়ে আবার সিংহাসনে বসে। আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই

রয়ে গেনু। নরকের দরজা আমাদের জন্যে সব সময় খোলা। যদি না যেতে চাই গলা ধাক্কা দিয়ে ওখানে ঢোকাবেই।

পাঁচির চোখের তারা রীতিমত চঞ্চল। বিষন্ন মুখখানা অন্নপূর্ণার প্রায় কানের কাছে এনে বলে সে, মেয়েটার ভাগ্যের কথা ভেবে কাঁটা হয়ে যাচ্ছি ভাই।

অন্নপূর্ণা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, মা গঙ্গার কোলে পড়েছিনু, কেন ওঠালে দয়াবান মানুষেরা। চলে গেলে, আর এই কষ্ট ভোগ করতে হত না। কথার শেষে অন্নপূর্ণার দু'চোখ জলে ভরে যায়।

অজগর তার বিরাট মুখ-গহ্বরের সামনে যা পায় গ্রাস করে। এ সময় মানুষ কাছাকাছি থেকেও ভয়ে আতঙ্কে হায় হায় বলার সাহসটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলে। পাঁচি আগের এই ধরনের ঘটনাগুলো সামনে এনে ভাবনায় ডুবে যায়। শয়তান-চক্র মেয়েগুলোকে কেমন করে তুলে নিয়ে যায়। কেউ তার প্রতিকার করতে পারে না আজ পর্যন্ত। বিন্দে গেল, কমলী গেল, সুধা গেল, পালানী গেল, জবা গেল, এবার পদ্মর ওপর নজর পড়েছে। নজর অবশ্য অনেক আগেই পড়েছে। সেকথা সে অন্নপূর্ণাকে বলেও ছিল।

পুকুরঘাটে গিয়ে বসে পদ্ম। তার মুখের ছায়া পড়ে পুকুরের আয়নার মত স্বচ্ছ জলে। একটা মাছ 'ঘাই' দেয়। জলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের আদল ভেঙে-চুরে যায়। মুখখানায় হাত বুলিয়ে দেখে পদ্ম। ঠিকই আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রতিবিম্বের কম্পন স্তব্ধ হয়ে যায়। স্থির জলে আবার আগেকার মত মুখখানা ভেসে ওঠে। হাসে পদ্ম। তার মুখখানা ভূতের মত বা পেঁচার পানা বিকৃত হল মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে। আবার সব ঠিকঠাক।

পদ্মর মনে পড়ে যায়, সুবৃহৎ মহাভারতের 'ইতি গজঃ' অংশটুকু সুচতুর হস্তক্ষেপে চাপা পড়ার কথা। তারজন্যে কি ধরনের বিপর্যয় নেমে আসে। একের পরে এক। আজকের দিনে ক্ষুদ্র স্বার্থকে

প্রাধান্য দেবার জন্যে, আসল বস্তুটিকে বা মূল সত্তাকে ঢাকা দেবার প্রয়াস সদম্ভে সর্বত্র বিরাজমান। তার চৌকস কার্যক্রমের সামনে লক্ষ লক্ষ ফ্যাকাশে চোখ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে মাত্র। মুখে টুঁ শব্দটি করতে সাহস পায় না।

পদ্মার ভাবনা মাকে নিয়ে। বাবা যাযাবর ধরনের লোক। পৃথিবীর পথে পথে যে কোন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে পারবে। কিন্তু অন্নপূর্ণা! তার মা কিন্তু ভিন্ন গোত্রের মানুষ। সে কি করে টিকে থাকবে এই ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যে। পদ্মা স্পষ্ট দেখতে পায়, আকাশভরা কালমেঘ। চারদিকে কেমন যেন থমথমে ভাব।

পাঁচি সমস্ত বাধা-বিপত্তির সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করে তাদের বাড়ির উঠোনে এসে পা রেখেছে। কিন্তু মেয়েপুরুষ হিসাব করে তাদের গ্রামে লোকসংখ্যা তো কম নয়। কিন্তু কেউ আসে না তাদের এই দুর্দিনে। তাহলে? বিরুদ্ধ শক্তির জোয়ারের তোড়ে ভেসে যাবে তারা। এইটাই অনিবার্য কি?

মা ডাকে, পদ্মা।

যাই মা।

পদ্মার চিন্তাভাবনা হঠাৎ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হতে থাকে। একটি মাত্র শুকতারাকে লক্ষ্য করে নাবিক তার পথ ঠিক করে নেয়। জীবনের পথটিকে ঠিক করার ক্ষেত্রে একই ধরনের পদ্ধতি বর্তমান। গত রাত্রির অনিবার্য মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিয়ে যারা তাদের জীবন-দীপকে অনির্বান রেখেছে তাদের নিষ্ঠাকে ছোট করে দেখা যায় না। জীবনের ক্ষেত্রে এদের এই গভীর ভালবাসাকে সে অস্বীকার করবে কেমন করে?

সন্ধ্যার আগে সারা গ্রামে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। 'লিউনান বোটের পিসিডন সায়েব' 'সরকারী আটচালায়' বসবেন। বিচার হবে। গুরুতর আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না হলে এমনটি তো হয় না কখনো। অন্নপূর্ণার গলা কাঠ হয়ে যায়। দু'চোখ দিয়ে সে শুধু

দেখে। একরাশ মানুষের সামনে সে হাজির হয়েছে। নিজের কথা গুছিয়ে বলার অধিকার থাকবে না তার। কোন কথা বলতে গেলেই কলরবের বন্যায় ভেসে যাবে। বলার সুযোগ থাকলে হয়ত এই বিপদের দিনে অনুনয়-বিনয় করে কিছু বলত। কিন্তু সে জানে এই বিচার প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়। এর আগে অনেকের জীবনে এ জিনিস ঘটেছে। পাঁচি দীর্ঘ সময় তাকে বলেছে সেইসব কথা। বড় নিষ্ঠুর, মর্মান্তিক সেইসব কাহিনী।

বিরূপাক্ষ চাটুজ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তিনি পাশের কারখানার অফিসের বড়বাবু। শ্রীদাম চক্রবর্তীর বড় শালার বড় মেয়ের সঙ্গে বছর দশেক আগে তার যথেষ্ট ধুমধাম করেই বিয়ে হয়েছে। বিরূপাক্ষ প্রচুর জমি-জমার মালিক। কিছু লেখাপড়া জানেন। তার ওপর কারখানার অফিসের বড়বাবু। লোকটিকে তাই টাঁাকে করে রেখেছে কারখানার মালিক। মালিকের সাহায্যেই অবশ্য ভোট-বৈতরণী পার হয়েছেন বিরূপাক্ষ আর সব চেয়ে বড় কথা নির্বাচিত সদস্যের প্রায় সবাইকে দখল করতে পেরেছে। না হলে 'চেয়ারখানা' পান কি করে? তাঁর দাপটে বাঘে-ছাগলে একঘাটে জল খায়। এ হেন বিরূপাক্ষকে দিয়ে বিচারের ব্যবস্থা।

ভাগীরথী তীরে বহু-পুরাতন বাংলো বাড়িটাকে এলাকার সমস্ত লোকই বলে সরকারী আটচালা। প্রেসিডেন্টবাবু মাঝে মাঝে বসেন এখানে। গ্রামের সমস্যা নিয়ে।

বাইরে থেকে গণ্যমান্য কেউ এলে গুদাম-ঘর থেকে গদিআঁটা পুরাতন আমলের বনেদী চেয়ার বার হয়। তার সামনে রাখা হয় মেহগনি কাঠের টেবিল। মাথার ওপরে ঝুলতে থাকে ঝাড় লণ্ঠন। নিচে পাতা হয় দামী ফরাস। দেয়াল ঘেঁসে সাজানো থাকে অসংখ্য চেয়ার। দরজায় দরজায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মখমলের দামী পরদা। এরমধ্যে কিছু কিছু জিনিসপত্র রীতিমত ছিন্ন-ভগ্ন-মলিন কিন্তু এর আভিজাত্যের মূল্যকে অস্বীকার করবে কে?

কিনু পাহারাদার থাকতে নষ্ট হবে না কিছু। সবকিছু তার কাছে চোখের মণি। কিনুর মাইনে সামান্য ক'টা টাকা কিন্তু 'পেলা'য় পুষে যায় তার। সরকারী আটচালার আশপাশে প্রায় বিঘে আষ্টেক পাঁচিল-ঘেরা জমি। তার হেফাজতে ফল-ফসল এখানে ভালই হয়। মালিক বাড়িতে রোজই এটা সেটা পাঠাতে হলেও যেটুকু পড়ে থাকে, তাতে কিনুরামের রীতিমত ঢেঁকুর ওঠে। বাংলোর পাশে টালির ছাওয়া ছোট্ট একটা কামরায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে বিনা খাজনায় স্বচ্ছন্দে বাস করে কিনু। কিনুর আসল পদবী আজ আর কেউ জানতে চায় না। কিনু পাহারাদার বললেই সবাই চেনে।

পান খেয়ে কিনুর ঠোঁট দুটো সব সময় রাঙা। দু'পাশে ভাঁজ করা লম্বা গোঁফ। মুখ ভরা মিষ্টি হাসি। অথচ দৃঢ় এক ধরনের গাম্ভীর্য তার সারা অবয়বে বিরাজমান। কাজকর্মের সময় মাথায় 'ফেজ' ধরনের একটা টুপি পারে। মালকোঁচা ধুতি, গায়ে বেনিয়ান কিনুরাম যখন সালাম জানায় তখন তা রীতিমত দর্শনীয় হয়ে ওঠে।

রাতের বৈঠক। তাই পেট্রোম্যাক্সের আলো জ্বলে। একটা নয়। গোটা দুই। রীতিমত 'যাত্রা আসর' পাতার কায়দায় সাজ-সজ্জার ব্যবস্থা। একপাশে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বসার উঁচু আসন। বাকি সবাই বসবে নিচে। আলোর সামনে এসে লোকজন হোঁচট খেতে থাকে। টাল সামলাতে সামলাতে এগিয়ে আসে অনেকে। কিনু খবরদারী করে। এসো—বসে যাও··। তার সঙ্গে সহযোগিতা করে আট দশজন চৌকিদার, দফাদার। সবার মাথায় পদমর্যাদা অনুসারে পাগড়ি বাঁধা।—'পিসিডন সায়েব' আসবেন। ওদের আসাটা তো বাধ্যতামূলক।

লোকজনে ছেয়ে যায় নির্ধারিত স্থানটি। সন্ধ্যা তো অনেক আগেই হয়ে গেছে। সবাই যখন রীতিমত বিরূপাক্ষের সরব ধ্যানে

মুখর হয়ে উঠেছে তখন ধীরে ধীরে বিরূপাক্ষ এগিয়ে আসেন আপন আসনের দিকে। চৌকিদার আর দফাদার তাঁকে সাধারণ মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে সিংহাসনের দিকে নিয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যায় এক নিমেষে।

বিরূপাক্ষ এদিক ওদিক তাকায়। উঠতি যৌবনের জোয়ার তার চোখে মুখে। এক নিমেষে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিতে পারে। দর্পণকে দেখা যায় তার ঠিক পাশটিতেই। আরো কিছু মোসাহেব তাকে ঘিরে রাখে। সবার মুখেই এক ধরনের পৈশাচিক উল্লাস। সবার মধ্যেই কেমন এক ধরনের ব্যস্ততা।

'পিসিডন' সাহেবের সামনে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে আসে শ্রীমন্ত। জ্যা বাঁধা ধনুকের মত শরীরের অবস্থা। কাঁপা শরীরে দু'হাত জোড় করে, কাঁপা গলায় বলে সে, পেন্নাম হই গো পিসিডন সাহেব। কথার সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরখানা আরো বেঁকে যায়। একটু পরে গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে সবার দিকে ভয়ে ভয়ে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, আরো যারা আছেন, ছোট বড়—সবার চরণে নমস্কার।

এটাই রীতি। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে যে মানুষ, সে সবার চরণ স্পর্শে ধন্য হবার যোগ্য মাত্র।

শ্রীমন্ত বসার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মও বসে পড়ে। সবার চোখ এখন পদ্মার দিকে। ফুটন্ত পদ্মের মতই তার দেহশ্রী। মাথা নিচু করে না সে। খোলা চোখে এদিক ওদিক তাকায়।

যাই কিছু ঘটুক না কেন সব কিছু মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছে সে যেন। চ্যাঙড়া ছেলেগুলো তার চোখে চোখ রেখে সুবিধা করতে পারে না। কর্তাব্যক্তিদের অবস্থাও তথৈবচ। বিরূপাক্ষ দর্পণের সঙ্গে একান্তে কি সব বলা কওয়া করে নেয়। দর্পণ 'জীহুজুরের দল' নিয়ে পেছনের দিকে অন্ধকারে চলে যায় কিছুক্ষণ।

অন্ধকারে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে অনুচ্চকণ্ঠে কি সব অতি সন্তর্পণে আলোচনা করে।

মৌসাহেবের দল ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যায়। অল্পবয়সী ছেলে-ছোকরাদের দলে গিয়ে মিশে যায় তারা। সেখানেও কি সব কানাকানি হতে থাকে। হঠাৎ বজ্রগম্ভীর স্বরে আওয়াজ ওঠে, 'সমাজ বলে কি একটা কিছু নেই? নিয়ম কানুন বলেও কি কিছু নেই? সব কি ন্যাংটার রাজত্ব হয়ে গেছে? এ আমি হতে দেবো না। যে যার ইচ্ছা মত কাজ করবে—নোংরামি—নষ্টামি—ব্যভিচার—অনাচার—এ আমি সহ্য করবো না। বিয়ে নেই—সাধি নেই—একজন কুমারী মেয়েকে নিয়ে—ছিঃ—ছিঃ—গ্রামের আবরু বলে কিছু নেই? দিনে দিনে সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ আমি হতে দোব না। কোথাকার কে এক বাউণ্ডুলের সঙ্গে—

সে হারামজাদাকে তো আনলে হয়। দু'ঘা দেওয়া যায়। উত্তেজিত স্বরে কে একজন চিৎকার করে ওঠে।

না না। সে ম্লেচ্ছটাকে এখানে এনে কি হবে? যে জায়গায় শাস্তির ব্যবস্থা করলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—সেখানেই করা হোক।

শিবে, পরাশরেরা মুখ টিপে হাসে। নিজেদের কব্জিগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে। ভীমে শিবের কানে কানে ফিস্‌ফিসিয়ে বলে, তোমাদের জান ঠাণ্ডার ব্যবস্থা তো হবেই বাবা। আমাদের হাঁ করে তাকিয়ে থাকাই সার।

এটা তো চিরকেলে রীতি মিতে। মৌচাকের মৌ ভাঙতে চোখ, মুখ, গা ফোলায় একজন আর চুকচুক করে মধু খায় আর একজন।

এ ব্যবস্থাটা পাল্টাতে হবে রে। বড় বাজে লাগে এই নিয়মটা।

পাল্টাবি আর কেমন করে বল? পেটের জ্বালায় আমাদের যা কিছু সব তো বেচে দিইচি।

শুধু বেচে দিতে হচ্ছে না, আধা মূল্যে—সিকি দামে দিতে হচ্ছে।

দূর ছাই, সিকি দামটাই বা পাচ্ছি কোথা? নামমাত্র পেয়ে—সব ছেড়ে দিতে হচ্ছে। ডাহা ফাঁকি। ফাঁকিবাজির রাজত্ব চলেছে।

পরাশরে ধরা গলায় বলে, ভাই—আজ কিন্তুন আমার মনটা ভাল নেই।

কেন রে?

মেয়েটার মুখখানা দেখে, মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সে কি রে শালা! ই যে ভূতের মুখে রাম নাম।

হেসে উড়িয়ে দিস্‌নি লোকে, ভাল করে বুঝে দেখ। যে ব্যাপারটা বাবুরা দাঁড় করাচ্ছে সেটা কি সত্যি? মেয়েটা কি রাত্রে ফষ্টিনষ্টি করতে গেছল? তোরা কি বলতে চাস নৌকোডুবি হয় নে? ডুবো মেয়েটাকে শ্মশানের লোকটা বাঁচায় নে? তবে উল্টো কথা বলা হচ্ছে কেন?

তুই থাম্ থাম্। টাকাগুলো নিলি কেন?

পেটের দায়ে।

তা'হলে কাজ করে যা। যা বাবুরা বলে দেবে—তাই সত্যি।

ভারি আমার সত্যি মিথ্যেঅলা যুদিষ্টির ঠাকুর রে!

ভীমে রসিয়ে-বসিয়ে বলে, শালাকে মারো কম। ছোটাও বেশি।

পেরেক পুঁতে গাছে সেঁটে রাখো। যীশু করে দাও।

ইতিমধ্যে আবার জলদ গম্ভীর রব ওঠে। না না, এ একেবারে অসহ্য। পাপ করে চুপ-চাপ বসে থাকবে পাপী। বসে থাকবে তার জন্মদাতা পিতা?

একজন মোসাহেব চেঁচিয়ে ওঠে, পিসিডনবাবুর অপমান। এখনো মুখে রা নেই। পাপ মেনে যা ছুঁড়ি।

এবার উঠে দাঁড়ায় শ্রীমন্ত। বিরূপাক্ষের দিকে মুখ করে তাকে

উদ্দেশ্য করেই বলে, আপনি তো আপন মনেই বলে যাচ্ছেন প্রভু। আমাদের কিছু বলতে তো আদেশ করেননি।

মোসাহেবরা রীতিমত বিরক্ত হয়ে উঠল। শ্রীমন্তর কথাবার্তা, বলার ভঙ্গি ইত্যাদির মধ্যে তাদের আমল না দেওয়ার মনোভাব ফুটে ওঠে।

বিরূপাক্ষ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শ্রীমন্তর দিকে। মাঝে মাঝে তার চোখ পদ্মার ওপরেও পড়ে। এতদিন গ্রামের অজ্ঞ মানুষগুলোকে দেখে আসছে সে। কিন্তু এরা বাপ-বেটি ভিন্ন-গোত্রের মানুষ বলে তার মনে হয়। তার আগেকার সমস্ত ধারণা চুরমার হয়ে যায় এদের দেখে। এরা কথা বলে। নিজের কথা গুছিয়ে বলার চেষ্টা করে। শুধু তাই নয়, পুরোপুরি বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। এই ধরনের গুটিকয়েক মেয়েপুরুষ তো শুধু মেয়েপুরুষ নয়। সমস্ত সমাজ কাঠামোর শক্ত মেরুদণ্ড। এরা যদি নির্বিবাদে কথা বলে যায়, তাহলে আরো অনেকে কথা বলবে। ইংরেজ রাজত্বে তাই এই ধরনের মানুষের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। সেটা সে জানে। অবশ্য এর সঙ্গে তাদের ঘাড়ে দেশ-প্রেমের ভূতটাও চেপে বসত। সে ভূত এদের ঘাড়ে যে কোন সময়ে চেপে বসতে পারে আজকের দিনের কায়দায়। তাই দাবিয়ে রাখতে হবে এদের। বেশ জোরের সঙ্গেই। সেটা হবে একটা মহৎ কাজ।

ব্যাটার আবার উকিলের ঢঙে জেরা আছে দেখছি। দেখাচ্ছি মজা বাছাধন। একটু সবুর কর। একজন মোসাহেব বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে।

পদ্ম বাবার অপমানে দুঃখে ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে যায়। রক্তপদ্মর মতোই দেখায় তাকে। বাবার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে থাকে সে, ওরা কি মজা দেখাবে হুজুর? মারধর করবে? জায়গা-জমি কাড়বে? ঝি-বৌদের অপমান করবে? এ ছাড়া আর কি করার আছে?

আমাদের মত নিচু ঘরে যারা জন্মেছে তারা এ জিনিস তো দিনরাত দেখছে। তাই এতে আর ভয় পাই না। শুধু খারাপ লাগে কি জানেন, আপনাদের মত যারা উঁচুতলার মানুষ, তাঁরা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলেন—হরিজনদের মঙ্গল করতে হবে। এদের মধ্যেও আছে পরম ব্রহ্ম, ঈশ্বরের প্রকাশ। তাই সবাইকে মানুষের অধিকার দিতে হবে। মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের মহান নেতারাও একথা বলেন।

দ্রুত বিবর্ণ হতে থাকে বিরূপাক্ষের মুখ। মেয়েটা মুখস্থ করা কবিতার মত যেন আবৃত্তি করে যায়। অন্যরা কিন্তু দমবার পাত্র নয়।

হুঙ্কার দিয়ে ওঠে দর্পণ, অপমান—অপমান করা হচ্ছে হুজুরকে। এর প্রতিকার চাই। এখুনি প্রতিকার চাই। মানুষ কি সব মরেছে! না জাহান্নামে গেছে! এ জাঁহাবাজ ছুঁড়ি এত সময় পাবে কেন? তার চোখ কতগুলি নির্দিষ্ট চোখের ওপর গিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা ঝড় বয়ে যায়।

হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। ধাক্কা খেয়ে শ্রীমন্ত ধুলোয় গড়াগড়ি খেতে থাকে। তার ওপর কিল, চড়, লাথি পড়তে থাকে অবিরাম।

পদ্মকে চ্যাংদোলা করে এক দল চক্ষের নিমেষে কোথায় নিয়ে চলে যায়।

বাঘিনীর মত মাঝে মাঝে চিৎকার করে পদ্ম, মেয়ে-ছেলে পেয়ে আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছো তোমরা। চলো—নরক, জাহান্নামে যেখানে খুশি নিয়ে চলো। এখন তোমাদের শক্ত মুঠি ছাড়াবার শক্তি তো আমার নেই। কিন্তু বেঁধে রাখতে পারবে না আমায়। এতো সাধ্য তোমাদের কারোর নেই।

তাই নাকি?

পরে চিন্তা ভাবনা করে দেখো আমার কথাটা কত খাঁটি।

এখন মানে মানে চলো বাবা, আর খাঁটি মাল দেখিও না।

কি খাঁটি আর কি খাঁটি নয় তা তোমরা নিজেরাই জানো।

তোমাদের বোন এই অবস্থায় পড়লে এভাবে যমের মুখে ঠেলে দিতে পারতে ?

সত্যি ভাই কথাটা আমাদের ভাবা উচিৎ।

শালা পরাশরেকে সামলে। ও শালা কি রকম কথা বলছে। মাঝপথে ছুঁড়িকে ছেড়েও দিতে পারে। পাক্‌লে পাক্‌লে কথাগুলো বলে ভীমে।

লোকে বলে, পালাবার কুল্লু পথ নেই দাদা, আমাদের পেছনে আর একদল গাড আছে। শালা চক্কোত্তি ঠাকুরের কাজ।

লোকে এদের চোর-চুট্টা-হারামি-বদমাশ বলে। কিন্তু খুব হুঁশিয়ার এরা। ওরা না থাকলে আমাদের পেয়ার করবে কে বল ?

পেয়ার করবে না হাতি, কাজ হাঁসিলের জন্যে কুকুর ডাকার মতো 'আ-তু' করে চেঁচাবে আর আমরাও লেজ নাড়তে নাড়তে দৌড়ে গিয়ে হাজির হয়ে যাবো। পরাশরে বেশ শাণিত গলায় বলে কথাগুলো।

মেঘা এই দলে নতুন নাম লেখালে কি হয়—হিংস্র কাজকর্মে তার জুড়ি মেলা ভার। কড়মড়িয়ে দাঁতের শব্দ তুলে বলে সে, অতই যদি বুঝিস তবে আসিস কেন ?

পরাশরে মেঘার দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলে, পেটের দায় বড় দায় রে ভাই। ওটা যদি না থাক্‌ত তাহলে—

ঝাঁঝিয়ে ওঠে মেঘা। বলে, কত আচ্ছা আচ্ছা আদমী কত কি কচ্ছে আর তোর পেটের দায় না থাকলে তুই সাধুগিরি কত্তিস। যা যা অত বক্‌বক্ করিসনি। কাজ কত্তে এসিচি কাজ করে যাব। যেটাকে ধরতে বলেচে সাঁড়াশি-কামড়ে ধরব। তাতে তার পেরাণ পাখি থাকুক আর যাক্।

ভীমে গর্জন করে ওঠে, ঠিক বলিচিস তুই। কাজ আমাদের কত্তেই হবে। কথা রাখতেই হবে। শুধু কি এই করে পেট চলে ? রাতের কারবারও তো আছে। সে ব্যাপারে থানার কলকাঠি নাড়ে চক্কোত্তি ঠাকুর। এতে কত উপকার হয় জানিস ?

না। সেকি আর ও না জানে। ও কি কচি খোকা ভেবিচিস ?

ভীমে আবেগমাখা কণ্ঠে বলে, বাবা মুগরীর চিড়িবাড়ের মধ্যে মাথা গলাবার পথ আছে। বেরুবার রাস্তা নেই। সেটা ভেবে দেখা দরকার। আমাদের লাইনটাও ঠিক সেই রকমের। এটা মনে রাখা দরকার।

জানি সবই ভাই। অজানা কিছু নেই। তোদের সঙ্গে থাকলে কুনটে জানতে আর বাকি থাকে বল ? তবে এটাও ভেবে দেখিস, আমবা যে মাল এনে দিই তার একআনার দাম কি আমরা পাই ? বেবাক পুরোটাই তো চলে যায় ঠাকুর মশাইদের ভোগে। সেখানেই তো আমার কথা, এত কম পেয়ে এত খেটে কি লাভ ?

পদ্ম কাঠ হয়ে সব শুনে যায়। একটা নতুন জগৎ তার সামনে আসে। এক নতুন অভিজ্ঞতা। আজ অন্ধকারে যে জীবগুলো কিল্‌বিল্ করে বেড়ায় তাদের মাধ্যেও দ্বন্দ্ব আছে। এতদিন শুধু ঘৃণাই পাওনা ছিল এদের কপালে। আজ পদ্ম স্পষ্ট দেখতে পায় মাঝে মাঝে বিদ্যুতের দীপ্তি খেলে যায় তাদের মুখের ওপর। সে আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় এদের কারো কারো চোখ সমস্যা জর্জর। এই পৃথিবীতে ভাল পথটাও বেছে নিতে চায়।

একসময় পদ্মর মনে হয় তার মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি পায় তার এই অসহায় অবস্থাতেও। মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয় শ্মশানে আর তাকে ধরে বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাঙর-কুমীরদের গোপন আড্ডায়। যতক্ষণ প্রাণটুকু থাকবে ততক্ষণ চলবে পৈশাচিক উল্লাস। ছোটবেলা থেকে এমন কত কাহিনী শুনেছে সে। শেষ পর্যন্ত তার জীবন নিয়েও যে একটা কাহিনী তৈরি হবে এটা তার জানা ছিল না।

পাঁচি পিসি অবশ্য বেশ কয়েকবার তাকে সতর্ক করে দিয়েছিল আভাসে ইঙ্গিতে। বাইরের হাওয়ায় কথাটা নিশ্চয় তার কানে গিয়েছিল। তখন তার কথাকে উপহাস করে উড়িয়ে দিয়েছিল পদ্ম।

আজ দেখছে তা কতখানি সত্য।

এবার মাটিতে নেবে হাঁটো মা লক্ষ্মী। আমাদের ড্যানা এবার লজ্জগজে হয়ে গেছে।

দু'জনের দু'হাতের মুঠো দু'ধার থেকে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছিল পদ্মাকে তুলে নিয়ে যাবার হস্ত নির্মিত দোলনা। এই দল এই কায়দায় অনেক মেয়ে পুরুষ পাচার করেছে। কারো জীবন শেষ করে দিয়েছে এরা। রাতের অন্ধকারে তারা হারিয়ে গেছে। কারো জীবন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মত। পদ্ম ভাবে, তার জীবন আজ শুধু মসীলিপ্ত হল না, জমাট-বাঁধা ঘন তমিস্রার রাজ্যে হল নিক্ষিপ্ত। এর শেষ কোথায় সে জানে না।

আগে পিছে সতর্ক প্রহরী নিযুক্ত করে পদ্মাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চ্যাংড়ার দল ছ্যাঁচড়ামো করে বলে, দেবতাদের দেবী চলেছে। সতর্ক হয়ে নিয়ে যাস ভাই।

মাঝখানে পদ্ম। চারপাশে কর্তাবাবুদের লোকজন হাঁটে। ইতিমধ্যে পথ দেখাতে একটা গ্যাসের বাতি এসে যায়। নারকেল সুপুরি আম জাম বাগানের ভেতর দিয়ে চলে বিচার প্রহসনের দণ্ডিত আসামী। তাকে কয়েদখানায় দিয়ে আসার জন্যে চলেছে একপাল অপরিণামদর্শী যুবক। রাত্রির অন্ধকার দু'পাশ থেকে ব্যঙ্গ করে এক টুক্‌রো গ্যাসের আলো দেখে। গতির দাপটে যা প্রায় নিভু নিভু। অন্ধকারের বিরাট জিহ্বা যে কোন মুহূর্তে তাকে গ্রাস করে নিতে পারে। নিতে চায়।

পদ্ম সদর্পে হেঁটে চলে। মাঝে মাঝে ফুঁসে ওঠে. সরে যাও। এত ঘেঁসে আসছ কেন? রাস্তা তো সরু নয়।

বাপরে! দেমাক দেখলে হাসি পায়।

আর একটু পরে দেমাক দেখিও দিদিমণি। থুড়ি তখন তো--

দাঁড়িয়ে পড়ে পদ্ম। বলে, কি বলতে চাও তোমরা --

বাপরে, কুলোপানা চক্কোর যেরে ভাই।

শুধু চক্কোর-সার নয়, বিষও আছে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে পদু।

ভীমে এবার সুযোগ পায়। রসিয়ে রসিয়ে বলে, তবে এ সব জেনেশুনে এমন পথে এমন সুড় সুড় করে চলেছ কেন বাছাধন?

কেন এমন করে যাচ্ছি সেটা জানো না তোমরা?… এতক্ষণ যা ঘটে গেল সব কি আমার ইচ্ছাতে হল?

থাক্ থাক্ বাবা আমাদের জবাব দিতে হবে নে। কুঞ্জে গিয়ে দেবতাদেরই জবাব দিও। অঙ্গভঙ্গি করে কথাগুলো বলে লোকে।

বাহবা! এই না হলে চ্যালার দল।

ভঞ্জু একটু তোতিয়ে তোতিয়ে বলে, অ—আ—কে ফা—অ—আ—সা—আ—আ—দে লা—আ—আ—ভটা কি?

লাভ লোকসানের তুই কি বুঝিস বা? ও শালাকে দলে রাখলে

কথা শেষ হতে না দিয়ে ভীমে বলে, ও ঠিকই বলেছে—মাঝ পথে গণ্ডগোল বাধিয়ে যদি হিতে বিপরীত হয়, তখন হিসেবটা দেবে কে? চল্ বাবা যেটুকু কাজ আছে 'ইস্তামাল' করে আসি। তারপর মৌজ করা যাবে।

সেই ভাল।

॥ ১৪ ॥

নদীর তীরে বাগানবাড়ি। ঘাটে লঞ্চ বেঁধে, রাস্তার ধারে ঘোড়ার গাড়ি থামিয়ে ডাকসাইটে লোকজন এককালে এই বাড়িতে অতিথি হয়েছেন। এবাড়ির অতিথিরা চাঁদনীরাতে রাজপ্রাসাদ সদৃশ সুদৃশ্য নৌকো নদীর জলে ভাসিয়ে রাতের পর রাত কাটিয়েছেন। সারারাত হৈ-হট্টগোল, উচ্চকণ্ঠ, বিস্রম্ভালাপ কত কি শোনা গেছে। বেশির ভাগ সাদা চামড়ার মানুষরা এখানের মাটিতে পদধূলি রেখে ধন্য করতেন।

আজকাল কাল চামড়ার মানুষরাই আসে। উত্তরাধিকার সূত্রে তারাই এখন হকদার।

ঝাউ দেওদারু ক্যাকটাস দিয়ে সুন্দর করে সাজান বাগান। দেশী-বিদেশী নানা জাতের ফুলের বাহার সারা বছর। দূর থেকে দেখলে ছবির মতই মনে হবে। এ বাগানের গাছপালা, আর্কিড জাতীয় গাছ সমস্তই খুব হিসেব করে লাগানো। এমন কি মালির ঘরের টালিগুলোও মূলবাড়ির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে লাগানো আর রং করা।

বাগানের ভেতর ছোট ছোট রাস্তা। কৃত্রিম জলধারা, এমনকি বাড়ির দেয়াল পর্যন্ত নিখুঁতভাবে তৈরি।

সুদূর এই গ্রাম দেশে এককালে সাহেবসুবোদের আমোদ-প্রমোদের জন্যে তৈরি হয়েছিল এই সৌধখানা। আজ তা এ কালের শ্রেষ্ঠীদের হাতে পড়েছে।

পদ্মকে নিয়ে বাড়ির সামনে আসতেই তিন-চারজন মহিলা তাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে যায়। সৌদামিনীর নামের সার্থকতা আছে। এ ব্যাপারে তার দেমাক আর অহঙ্কার সমানে বর্তমান। ভ্রু কুঁচকে বলে সে, ও মা! তুমিই পদ্ম। তোমাকে দেখেই বাবুরা একেবারে দিশেহারা। শেষ পর্যন্ত সাগর বেঁধে সীতা উদ্ধার হল, না এঁদো পুকুর থেকে পদ্ম উদ্ধার হল?

পদ্ম কোন কথা বলে না। নতুন পরিবেশে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। এত সাজসজ্জা, বাহার, জৌলুষ, আলোভরা পরিবেশ এর আগে সে দেখে নি কোনোদিন।

সৌদামিনী সমানে তাকিয়ে থাকে পদ্মর দিকে।

নয়নতারা চোখ ঘুরিয়ে বলে, নতুনের সোয়াদ গো সই, এরই নেশায় পাগল হয়ে যায় মন-ভোমরা। দু'চারদিন যাক্। দেখবি, তুই-আমি যেথা—যুঁই পদ্মও সেথা।

টেঁপার মা বাস্তববাদী। কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আমার কাজ আমায় শেষ করে দিতে হবে ভাই। বাবুরা সব এসে পড়বে। বছর দেড়েক ধরে যার পেছনে ছোটাছুটি তাকে নিয়ে কি কম

লোফালুফি হবে আজ। এদের ব্যাপার-স্যাপার তো বুঝি আমি।

টেঁপার মায়ের কাজ সাজগোজ ঠিক করা। উপযুক্ত অঙ্গ-রাগের ব্যবস্থা করা। ইত্যাদি—

পদ্ম মনে মনে ভাবে, এ জাল কাটা যাবে তো? এর আগে অনেকেই এই ফাঁদে পড়েছে। সে কাহিনী শুনেছে সে। কেউ জাল ছিঁড়ে বার হয়ে আসতে পারে না। অন্যদের ক্ষেত্রে এই সময়ে ভয় হয়েছিল কিনা তার জানা নেই। তার কিন্তু কোন ভয় হচ্ছে না। বরং কোন এক ধরনের নেশায় সে বিভোর। কোন্ মন্ত্র বলে এই পাষাণপুরী থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? তন্ন তন্ন করে সেই পথের সন্ধান করে সে। মনে মনে গুনগুন করে সে, 'ডুবছি মাগো অথৈ জলে, পাতাল কতদূর।'

পদ্ম পাগল হয়ে যাবে নাকি?

এমন অনেক দুঃখ, নিষ্ঠুর চাপ তো তাদের জীবনে বহুবার এসেছে আর এই ভাবনাটাই এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে তাদের জীবনে, এটাই তো অনিবার্য। তার মা বহুবার বলেছে তাকে, কষ্ট দুঃখের মাঝখান দিয়েই পথ করে নিতে হবে। এখন সেই মায়ের অবস্থা শোচনীয় জায়গায় পৌঁছলেও তার কথা এখন পদ্মর মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আজ শিকল বাঁধা অবস্থাতেও মনে তা জোর এনে দেয়।

রাত বাড়ে। প্রশস্ত হল-ঘরটায় গ্লাসের শব্দ হয়। এরই মধ্যে অনেকে মত্ত। হল-ঘরের পাশের ঘরটায় সাজগোজ-করা মেয়ের দল। তার মধ্যে আজ নবাগতা পদ্মও আছে। এ-বাড়ির কাপড় জামা পরতেও আপত্তি করে না সে। সেজেগুজে সে চুপচাপ থাকতে পারে না। পর্দা সরিয়ে হল-ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেলে। বার বার। এক উজ্জ্বল স্রোতধারা যেন দু-কূল ছাপিয়ে প্লাবন সৃষ্টি করতে চায়। তার সুতীব্র আঘাত বিশেষভাবে উপলব্ধি করে সে।

সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, দেখবিখন লো ছুঁড়ি। নয়ন

ভরে দেবিখন। দেখে দেখে চোখ পচে যাবে। এখন আর অত দেখেনে।

নয়নতারা ধাক্কা মেরে বলে, লাইনে যখন এসিচিস কুরে কুরে খেয়ে, কেমন করে ছোপড়াসার করে, দু'দিনে বুঝবিখন। তখন ঘেন্না লেগে যাবে।

তারই বয়সী একজন গোঁজ মুখ হয়ে বসে থাকে। পদ্ম তার দিকে দৃষ্টি ফেরাতেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সৌদামিনী বলে, কি দেমাক ভাঙল? এদের আবার কথা! তার আবার দাম! ওই ছুঁড়িকে ধরে আনল তেহট্ট থেকে! রূপে মজে গিয়ে। এতো রূপ নাকি সংসারে আর নেই। মাগীকে ছবি করে বাঁধিয়ে রাখবে, ইনিয়ে বিনিয়ে নেশার খেয়ালে বলত বাবুসাহেবরা। আর কারো দিকে ফিরে তাকাবে না। এই নিয়ে কি দেমাক ছিল পোড়ারমুখীর। কি, এবার দেমাক ভাঙল তো? মেয়েটার কাছে গিয়ে মুখটা তুলে ধরে বলে সৌদামিনী।

প্রায় কাঁদ কাঁদ চম্পা। পাথরের প্রতিমা যেন। সত্যি তার রূপ আছে। হাঁ, এখনো আছে। বহু ঝঞ্ঝা বয়ে যাবার পরেও। অদ্ভুত তার দুটো চোখ। সেই চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ে। পদ্ম তাড়াতাড়ি গিয়ে আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছে দেয়। এবার ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে চম্পা।

টেঁপার মা ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, খাবি তো তোরা? সৌদামিনী নয়নতারা ছোঁ মেরে তার হাত থেকে গ্লাস তুলে নেয়। টেঁপার মা পদ্মর সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে নাও।

ও জিনিস আমি নোব না।

কেন?

অত খোলা জিনিস আমার চলে না।

চোখ কপালে তোলে সৌদামিনী। বলে, বিলিতি চাই নাকি?

নিশ্চয়।

এতে হবে নে তাহলে ?

বললুম তো।

আরো কয়েকবার সাধবার পর টেঁপার মা ভেতরের দিকে চলে যায়। ভেতরের কথাবার্তায় তখন রীতিমত টান টান স্বর। টুংটাং শব্দ ওঠে অবিরাম। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে হাসি হুল্লোড় চলে। বাইরে থেকে এখানে কে বা কারা আছে বোঝা শক্ত হলেও কয়েক জনের গলার স্বর বেশ স্পষ্ট চিনতে পারে পদ্ম। ঘৃণায় তার নাক সিটকে যায়। এরা এই ধরনের জীবনযাপন করে ? অথচ বাইরে এদের কত নামডাক।

চক্কোত্তিদের 'বাগানবাড়ি।' আগে ছিল নীলকর সাহেবদের। তাদের দাপটে বাগানবাড়ির ধারে কাছে যাবার জো ছিল না। তার পর লক্ষ্মীঠাকরুণ যেদিকে চলেছেন বাগানবাড়িও তাদের দখলে।

আজ বাগানবাড়ির দখলী সত্ত্বটুকুই শুধু তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে নেই—এই বাড়িতে প্রয়োজনীয় উপকরণ আনতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন, সেই দাপট শক্তিও তাদের আছে।

মাঝের কপাট খুলতে একটা অট্টহাসির ঢেউ পাশের ঘরে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে। সঙ্গে আসে টেঁপার মা। বেটে বোতল, গ্লাস ইত্যাদি নিয়ে। গ্লাসে তরল পানীয় ঢালতে ঢালতে টেঁপার মা বলে, আজ তুই যা চাইবি তাই পাবি।

আসবে তো। নির্বিকার চিত্তে বলে পদ্ম।

তোর ভেতর এত ?

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছ ?

হব না। ভেতরে ভেতরে এসব জিনিস খাওয়া শিখিচিস। ডুবে ডুবে অনেক আগে থিকেই জল খাচ্ছিস ছুঁড়ি।

টেঁপার মা গ্লাস পদ্মর দিকে এগিয়ে দেয়।

পদ্ম দু'হাত দিয়ে টেঁপার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে। কানের কাছে মুখ এনে বলে, আজ তোমরা সবাই মিলে প্রসাদ করে না দিলে,

আমি কি করে ছুঁই বল ?

সবাই কেমন যেন ইতস্ততঃ করতে থাকে।

টেঁপার মা বলে, বড়মুখ করে বলচিস যখন, নিচ্চি। এ বিষ যখন ধরিচি একবার তখন কি আর ছাড়তে পারি? আমাদের কত্তা-ব্যক্তি মশাইরা আদর করে মুখে তুলে দিয়েছেন যে জিনিস তা কি অচ্ছেদ্দা করে ফেলে দিতে পারি? এ যে অমিত্তি। আহা! আমাদের ঘাটে ভিড়িয়ে এ জিনিস ধরাবার জন্যে বাছাদের কি কষ্ট! রাতদুপুরে টো মারতে হয়েচে ঘুলঘুলি দিয়ে। ঠিকদুপুরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েচে পুকুর ঘাটের ধারে। মেলা পাব্বনে পিছুপিছু ঘুরতে হয়েচে চরকির মতো। তবে না পেরেচে—

কথা শুনে হো হো করে হাসতে থাকে সবাই। পদ্মর ভেতর থেকে গলিত লাভা যেন সরোষে বেরিয়ে আসতে চায়। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করে পদ্ম। সে স্পষ্ট দেখতে পায়, টেঁপার মায়ের মধ্যে আগুন জ্বলছে। কিন্তু এ আগুন দিয়ে কোন কাজ হবে না। পাথরের ওপরকার বীজে অঙ্কুরোদ্গম হলেও যেমন ব্যর্থ তেমনি তার ভেতরকার আগুনও বিশেষ একটি কুয়োর মধ্যে আবদ্ধ যেন। বাইরে আসার কোন পথ নেই তার।

অতি সন্তর্পণে সবাই একটু একটু করে বেঁটে নেয় বোতলটার ভেতরকার অমৃত। নিজের ভাগেরটুকু নিয়ে পদ্ম কায়দা করে কোণের দিকে চলে যায়। ঠোঁটে-মুখে কিছুটা মাখে। কিছুটা শাড়ি-ব্লাউজে ঢেলে দেয়।

এইভাবে চলে বেশ কিছুক্ষণ। এরই ফাঁকে পদ্ম একটা ছোট্ট দরজা আবিষ্কার করে। ওটা খুলে নয়নতারা বাইরে থেকে আসে। আবার বন্ধ করতে উদ্যত হয়। পদ্ম বলে, মাসী, খোলা থাক।

এখুনি যাবি ?

একটু পরে।

অল্পক্ষণের মধ্যে খাঁচার পোষা-পাখির মত মনে হয় পদ্মকে।

কেউ এতটুকু সন্দেহ করার সুযোগ পর্যন্ত পায় না। এর আগে যারা এসেছে, কত হাত-পা ছুঁড়েছে। চেঁচিয়ে সাত পাড়ার লোক জড়ো করতে চেয়েছে। তাদের ঠাণ্ডা করতে হয়েছে। সে তুলনায় এ তো পোষা শালিক।

ভেতর থেকে একটা হুল্লোড় ওঠে। টেঁপার মা সমেত দু'জন ভেতরে ঢুকে যায়। ফিস্‌ফিসিয়ে বলে সবাই, রাজাবাবু এসেচে। রাজা বাবু—

তুই এখিনে থাক্। আমি একটু দেখে আসি।

ঢং দেখে বাঁচিনি! খোলাখুলি বল্‌না বাবু, হাত পাতলে লোকটা হাত ভরিয়ে দেয়।

তাহলে তো সত্যিকারের রাজা!

হ্যাঁ ভাই।

রাজার সাহায্য নিতে সবাই যখন হল-ঘরটায় ঢুকে পড়ে, তখন আর কাল বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ে পদ্ম।

পেছনে শুধু কলাবাগান। তার পরে নদীর চর। ভয়ে বুক দুর দুর করে কাঁপতে থাকে। ছুটে চলে পদ্ম।

একটা কথা শুনেছে সে অনেকবার। সুযোগ এলে যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গে তড়িঘড়ি তাকে কাজে লাগাতে হয়। যে না পারে সে এই পৃথিবীতে নির্বোধ ছাড়া আর কিছু নয়।

উলুবেড়ে থেকে একটা নৌকো এসে থামে। মাঝি হাঁকে, বাগাণ্ডা—পুকুরে চণ্ডীপুর—। কিছু লোক নেমে যায় এখানে।

পদ্ম নৌকোর ওপর উঠে যায়। একজন দাঁড়ি লগি ঠেলতে ঠেলতে বলে, কোথা যাবে গা মেয়ে? এপারে বেশি দূর যাবেনে। শ্মশানের কাছ থেকেই পাড়ি দুবো।

তুমি তাহলে শ্মশানেই নামিয়ে দিও আমাকে।

নৌকোর মেয়ে-যাত্রীদের থেকে যথাসম্ভব দূরত্ব বাঁচিয়ে বসে পড়ে পদ্ম।

মাঝে মাঝে তাকায় সে ফেলে আসা পথের দিকে। আবার আসছে নাতো লকে, শিবে, পরাশরেদের বাহিনী। বুকের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর পর্যায়ে উপনীত হয়। এক সময় মনে হয় তার অন্ধকার নদী গর্ভে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে। কিন্তু না। তার নিজস্ব ইচ্ছাই একমাত্র ইচ্ছা নয়। তা আজ স্পষ্ট অনুভব করে সে। একদল বলে, সবার ওপরে ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু তার চিন্তা আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন খাদে প্রবাহিত। তার ইচ্ছার কোন মূল্য না দিয়ে তাকে সমাজ এক বিশেষ স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্যই ছিল না সেখানে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যুর করাল আলিঙ্গন যখন তার কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তখন সমাজের তথাকথিত নিচুতলার একটি মানুষ এসে তার পাশে দাঁড়াল বিনা দ্বিধায়। বিনা স্বার্থে।

তারই পাশাপাশি সমাজের উঁচুতলার ভব্য-সভ্য মানুষেরা কি বীভৎসভাবে তার পিছু ধাওয়া করেছে। তাদের সমগ্র পরিবারটিকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে চায়। অজগরের এই বিরাট হাঁ করা মুখ সভয়ে লক্ষ্য করেছে সে। আজ চলেছে রীতিমত জীবনমৃত্যু নিয়ে খেলা।

পদ্ম জানে না এই খেলার শেষ কোথা!

শ্মশানের কাছাকাছি এসে নৌকোখানা ভিড়ে যায়। চরের কাছাকাছি হতেই প্রায় লাফিয়ে নেমে পড়ে পদ্ম। একজন দাঁড়ি চেঁচিয়ে ওঠে, পয়সা।

মাঝি খেঁকিয়ে ওঠে, বুঝতে পারলিনি, নিশ্চয় বেকায়দায় পড়েছে। না হ'লে এতরাতে একলা সোমত্ত মেয়ে পথে নামে।

পদ্ম তীরে দাঁড়িয়ে ধরা গলায় কি যেন বলে, বোঝা যায় না।

মাঝি চিৎকার করে বলে ওঠে, হ্যা—মা—যাও তুমি—। ভালয় ভালয় বাড়ি যাও—। মাঝি শক্ত হাতে হালখানা ধরে অনেকটা এগিয়ে যায়। ছলাৎ ছলাৎ জলের শব্দের সঙ্গে মাঝির এই কথা পদ্মর চোখে জল আনে। আজ সারাদিন চক্রান্তের জালের মধ্যে

পড়ে, প্রতি মুহূর্তে ক্ষয়ে যেতে হয়েছে। অসহায় বাবা-মার অশ্রুভরা চোখ তাকে যেন কুরে কুরে খেয়েছে। তাই এক সময় মনেও হয়েছে তার, যদি তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলে শয়তানদের শাস্তি হয় তবে তাই করুক। পরক্ষণেই অবশ্য সামলে নিয়েছে নিজেকে। ও তো পাপের কথা। দুর্বলতা। প্রাণ থাকতে, জ্ঞান থাকতে চেষ্টা করে যেতে হবে।

মা-বাবার কি অবস্থা হচ্ছে জানা নেই। ওরা সহজে ছাড়বে না। শকুনদের চোখ যেখানে পড়বে, সেখানে ভাগাড় বানাবে। তবু আপাততঃ ওদের জালটা ছিঁড়তে পেরে অনেক শান্তি—অনেক আনন্দ। মাঝির কথাগুলো এই অবস্থায় যেন মরুদ্যান বিশেষ। কাঁপা পা দুটো শান্ত হয়েছে এবার। বুকটাও। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে সে।

কয়েকদিন মহাবীরের শরীরে বেজায় জ্বর। নিজের আস্তানায় শুয়ে পড়ে আছে। কম্বল, কাঁথা, লেপ আশেপাশে যা ছিল, সব শরীরের ওপর চাপিয়েও যেন শান্তি নেই। মাথায় বিশ্রী যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণা হলে সে তার নির্বান্ধব জীবনে শিখেছে মাথা কুটতে। আজো মাথা কুটছে মাঝে মাঝে। উপুড় হয়ে জড়িয়ে ধরছে মাটি। এমন একটি অবস্থাতে সে একা। এর জন্যে কোন দুঃখই করে না সে। করে লাভই বা কি? মাঝে মাঝে শুধু তার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়, ভগবান, জলদি আরাম করো। বহুৎ খারাপ লাগছে দেওতা। জলদি আরাম করো রামজী—

জলের তেষ্টা লাগলে হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায়। তোবড়ানো গ্লাস হাতে কলসী নোয়ায়। মাঝে মাঝে নোয়ানোর মাত্রা ঠিক থাকে না। হাত কাঁপে। জল বেশি পড়ে যায়। বিছানার এক অংশ ভিজে যায়! মহাবীর বলে ওঠে, হায় শিয়ারাম—এ কি হোয়ে গেলো—পরভু। হায় রাম। দুর্বল জীয়নের দুনিয়ামে দাম নেহি।—স্থান নেহি পরভু।

জ্বরে কাটা-ছাগলের মত আছাড় খায় মহাবীর। জ্বরের প্রথম-দিকে অনিল ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। অনেকগুলো ট্যাবলেট দিয়েছিল ডাক্তারবাবু। দিনে তিনটে খেতে বলেছিল। সে হিসাব-নিকাশ থাকবে কেমন করে? মনে পড়লে একটা খায় মহাবীর। দুই হাত একত্র করে কপালে ঠেকায়। যেন ঈশ্বর প্রদত্ত আশীর্বাদ গ্রহণ করে।

সন্ধ্যার পর থেকে জ্বর বাড়ে। জ্বর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর মুখখানা মনে পড়ে তার। সেই সুন্দর দু'খানা চোখ। স্পষ্ট কথা। পদ্ম! পাশাপাশি সিংহলের রাজকুমারীর কথা মনে পড়ে যায় তার। বহুদিন আগে গল্প শুনেছিল। প্রায় একই নাম। পদ্মা রাজকুমারী! এক সময় বলে ফেলে সে, হামার রাজকুমারী—হামার রাণী—জান যায় রে—। রাজকুমারী—তু—আয়—

শ্মশানের কাছাকাছি এসে বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে পদ্মর। মহাবীরের আজব কুঁড়ে থেকে অনর্গল অসংলগ্ন কথা বেরিয়ে আসছে। কিছু দূরে সাধুজীর ধুনি জ্বলছে আজ দাউ দাউ করে। জোরালো কণ্ঠে কিছু সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে যাচ্ছে সাধুজী। মনের উচ্ছ্বাস বোধ হয় চেপে রাখতে পারছে না। লোকসমাজে যা রটে গেছে, তাকে চাপা দেবার জন্যে আপ্রাণ আচার অনুষ্ঠান করে যায় সে। তবু বাতাসে ঘুরে বেড়ায় আসল কথাটা। একে পরোয়া করে না সাধুজী। সে জানে—তার সামনে এ কথা তোলার হিম্মৎ নেই কারো। তাহলে সন্ধ্যার দিকে আপন মহিমা কীর্তন করে আত্মপ্রসাদ লাভে বাধা কোথায়? বরং মানসিক তৃপ্তি। পরবর্তী কাজের পথে উৎসাহ এনে দেয়।

জমাট বাঁধা অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পদ্ম। কাঁপা কাঁপা অসংখ্য আলোক শিখার পাশে কাতর কণ্ঠে সংস্কৃত শব্দবাণ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে যেন।

দৃষ্টি আর কান কাছে আনলে আজব কুঁড়ে থেকে শোনা যায়—

রাজকুমারী—ও হামার রাজকুমারী— সিন্হল কা রাজকুমারী। পদ্মা—তু কাঁহা। বাপরে—। জীয়ন যায় রে বাব্বা। কথার সঙ্গে সঙ্গে মাথা কুটতে থাকে মহাবীর। মাটিকে আরো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরতে চায়। অসহায় ভাবে গড়াগড়ি খায় মাঝে মাঝে।

মাঝে মাঝে বলে, 'এই—কৌন গাঁয়ের 'যাত্‌রী' আছে ভাই?'

কবে মরে গেলোরে?

হায় মালিক! উমর সাত-আট সালের বেশি হোবে না তো?

বাপরে। জান নিকাল যায় রে বাপ—

এ পদ্মা সিন্হল কা রাজকুমারী—জলদি আ যা—। মহাবপঙ্খী লিয়ে জলদি আয় বাবা। মাঝে মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে কথাগুলি বলে যায় মহাবীর।

ঘরের ভতর কুপির আলো জ্বালা।

পদ্মা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। অসহায় রোগীর এই আর্ত চিৎকার দাঁড়িয়ে দেখা যায় না। তার জীবনে মৃত্যুর কাছাকাছি অবস্থায় এই মানুষটির সেবা যত্নের কথা স্পষ্ট মনে আসে। এরপর একটির পর একটি পা কখন মহাবীরের আস্তানায় এনে ফেলেছে তা জানে না পদ্মা। ভিজে বিছানাটা গুটিয়ে সামলে দিয়ে, তাকায় ওষুধগুলোর দিকে। ভাবে, জিজ্ঞাসা করবে খাওয়ার ব্যাপারে। তারপর ঠিক করে নেয়, কিছু দরকার নেই। একটা করে খাইয়ে দিলেই হবে। তার মনে হয় জ্বরের দাপটে একটাও খেতে পারেনি।

হাঁ করো।

তু কৌন?

হাঁ করো। মুখ খোলো। আমি পদ্মা।

বাঃ! পদ্মা—হামার পদ্মা—

হাঁ। খেয়ে নাও।

বাধ্য বালকের মত এক এক করে ওষুধ, জল খেয়ে যায় মহাবীর। মাথায় হাত দিয়ে দেখে পদ্মা, তপ্ত আগুন। ন্যাকড়া ছিঁড়ে জল-

পট্টি দেওয়া শুরু করে সে।

মিল গিয়া। হামারা পদ্ম মিল গিয়া—। হামারা পদ্ম—। বলতে বলতে কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ে মহাবীর। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে সে।

॥ ১৫ ॥

মিলের ঘড়িতে তিনটের ঘণ্টা বাজে।

না এখন নয়। এখনো রাস্তায় রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। আরো আলো ফুটে উঠতে দিতে হবে। নাহলে সাফ হবে না সব কিছু।

সকাল প্রায় হয়ে আসে। মিলের লোকরা দল বেঁধে যাওয়া শুরু করে। মিলে আর কোয়াটারে কোয়াটারে মেয়েরাও কাজে চলেছে। এই সময়টায় বেরিয়ে পড়ে পদ্ম। তিন ফটকের কাছাকাছি এসে কালানীর কাছে ধরা পড়ে যায় সে। কালানী হাত ধরে টেনে আনে পদ্মকে। বলে, আয়, আমার কাছে আয়। চমকে ওঠে পদ্ম। চক্রান্তকারীদের চরেরা পাকড়াও করল নাতো তাকে? পরক্ষণেই তার সে ভাবনার অবসান ঘটে।

কালানীর আসল নাম কল্যাণী। বছর পাঁচেক আগে যখন তার বিয়ে দেবার তোড়যোড় চলছে সেই সময় সে চটকলের জোয়ান ছেলে পরমার হাত ধরে এই ভাড়া ঘরে এসে ঢুকে পড়ে। এছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না কল্যাণীর। পরমেশ্বরকে সে মনে মনে ভালবাসলেও, বিয়ে-থা করে তাকে নিয়েই ঘর-সংসার করবে এমন কথা ভাবেনি কোনদিন। কিন্তু সংসার সমুদ্রের উদ্বেল ঢেউ—একটার পর একটা এসে আঘাত করে গেছে তাকে। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত কালানী আদৌ বুঝতে পারেনি তার অবস্থান ধীরে ধীরে কোন পর্যায়ে এসে উপনীত হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সে নিজেকে আবিষ্কার করেছে পরমার এই ঘরে। সেই

পরমা! যাকে তার বাবা বলত, ভিন্ জেতের ভিন্ গোত্রের বেয়াদপ ছোঁড়া—

একদিন তার জবাব দিয়েছিল কালানী। বলেছিল, বাবা তুমি যাকে বেয়াদব বলছ—একদিন বৃষ্টি বাদলের রাতে ভিজে ভিজে ডাক্তার বাড়ি যাওয়া—ওষুধ আনা—কাজগুলো স্বেচ্ছায় নিজের ঘাড়ে নিয়েছিল সে।

নিয়েছিল তো। ওই একটাই গুণ আছে ছোকরার গাঁয়ের গরিব-গুর্ব মানুষের জন্যে কিছু করে। এ ছাড়া আর কোন্ গুণটা তার আছে শুনি? —অসভ্য শয়তান! মাঝে মাঝে বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার শখ হয় বাছাধনের। অসহ্য—

কালানী বুঝতে পারে আলোচনার চাকা কোনদিকে ঘুরছে।

মায়ের কাছ থেকে ঝাঁঝালো কথা প্রায় প্রতি মুহূর্তে কানে আসে। 'ধিঙ্গিপনা দেখাতে আর ভাল লাগেনে বাবা। পোড়া রাজ্যে জুটেওনে একটা। এক মিন্‌ষেকে যদিবা ধল্লো, তুটোকে খুইয়ে এখনো তার খাঁই শুনলে হাত পা জমে যায়। নগত দাও। সোনার জিনিস দাও। আরো কত কি? না হলে নাকি তার পায়ের কাছে কত মেয়ে লটকাচ্ছে। মরেও নে'

বাবা পাত্র দেখতে যায়—আর ফিরে আসে। সামর্থের অভাব। তার ওপর বাবার মনঃপূত হয় না। শেষ পর্যন্ত একজন যখন কথা দিয়েও রাখল না, তখন কল্যাণী কালানীতে রূপান্তরিত হল। পরমার হাত ধরে ঢুকে পড়ল তিন ফটকের পাশে শ্রমিক বস্তিতে। কিছু না হোক অন্ততপক্ষে বাপকে দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচানো গেল। নিজে বাঁচল জননীর কটাক্ষাঘাত থেকে।

এ রাজ্যে একে একে অনেকেই এসে হাজির হয়েছে। সবার মাথায় কলঙ্কের বোঝা। জীবনের সমস্যাগুলোকে তলিয়ে কেউ দেখল না। থিতিয়ে কেউ ভাবল না। শুধু বলল, এরা বাঁধন ভেঙেছে। সমাজের আইন মানে না। সমাজের বাইরে এরা।

তাই সমাজপিতা আর সমাজকর্তারা কি বলাবলি করছে সেদিকে কান দেয় না এরা। আপন মনে আপন কাজ করে এগিয়ে চলে।

কালানী পদ্মকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে বলে, যাবি কোন্ চুলোয়? শনির নজরে পড়লে কেউ আস্ত থাকে নাকি? তোদের এতদিনের ঘর-বাড়ি আর কি আছে? সে এখন ছিদাম চক্কোত্তির চ্যালা দপ্পণের খপ্পরে চলে গেছে। এ হিসেব মিথ্যে হবার নয় রে, এতটুকু মিথ্যে হবার নয়। এখানে বসে বসে অনেক হিসেব করি আমরা। সব দেখি সত্যি হয়ে যায়। হিসেব করার একটা যন্ত্র আছে আমাদের কাছে। তার মধ্যে দিয়ে আমরা আগেভাগে সবকিছু হিসেব করে নিই।

মা—আমার মা এখন কোথায় আছে বলতে পারো?

পথের ধুলোয়।

পথের ধুলোয়? বিস্ময়ে বলে পদ্ম।

তোদের জমি ঘরবাড়ি কার নামে?

মায়ের নামে।

তাহলে আজকের দিনটা তার 'রেজিস্ট্রী' আপিসেই যাবে। কাল থেকে পথের ধুলো।

তুমি কি করে জানলে?

হিসেব বলছে।···যা হোক, তুই চান করে নে। কিছু মুখে দে। আমি ওকে পাঠাই। খোঁজ খবর নিই। কাল সন্ধ্যে থেকেই আমরা রীতিমত ছটপট করছি।

বাহুর বন্ধনে বেষ্টন করে পদ্মকে ছোট্ট ঘরখানার মধ্যে নিয়ে যায় কালানী। এ ঘরে কোন ঠাকুর দেবতার ছবি নেই। দেয়ালে মাথা প্রায় নেড়া, মোটা গোঁফ, ছোট দাড়িআলা একটা লোকের ছবি আছে মাত্র। বিছানা পুরু নয় কিন্তু পরিষ্কার। সারা ঘর-খানায় কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। ভারি ভাল লাগে পদ্মর। সারা রাত্রি অক্টোপাশের বাঁধনের পর এ এক মুক্তির আনন্দ যেন। মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল অনেক আগে থেকেই। এখুনি স্নান

করতে পারবে ভেবে খুব ভাল লাগে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মহাবীরের অসহায় মুখখানার ছবি ভেসে ওঠে তার সামনে। তার পাশাপাশি তার মায়ের মুখ। বাবার মুখ।

কালানী বলে, লড়াই করে জিতিচিস তুই। তাই তোর মুখখানা আমার বার বার দেখতে ইচ্ছা করে রে।

পরমা মিলের শ্রমিক। চটকলের মজুর। চটকলিয়া। সামান্য কাজে নামমাত্র তপ্তা পেয়ে স্বামী-স্ত্রীকে জীবনযাপন করে ছাড়া আর উপায় ছিল না।

ভারত স্বাধীন হবার অল্প কিছুদিন আগে জাতীয় পতাকা সামনে নিয়ে তার ট্রেড ইউনিয়ন রীতিমত রমরমা অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। শিল্পাঞ্চল জুড়ে তখন এক ছাড়া দ্বিতীয় কেউ ছিল না। ডাঃ বাগাজী নির্বাচনে দাঁড়ালেন আই এন, টি, ইউ সি-র প্রার্থী হয়ে। কমিউনিস্টরাও দাঁড়ালেন নির্বাচনে। কমিউনিস্ট প্রার্থীর প্রতীক তালা-চাবি। আই, এন, টি, ইউ, সি প্রার্থীর প্রতীক গরুর গাড়ি মহল্লায় মহল্লায় রব উঠল, তালা-চাবি তোড় দো—বয়েল গাড়ি কা বোট দো।

রাশিয়ার দালাল কমিউনিস্টদের হটাতে, দেশছাড়া করতে একদল পরম উল্লাসে এগিয়ে আসে মহান ব্রত নিয়ে। পরম পুকুরের ধারে কমিউনিস্ট পার্টির সভার ওপর চলে ক্রমাগত আক্রমণ। ইট পাটকেল নিক্ষেপ। এখানে আহত হয় পরমা। তার মাথার আঘাত গুরুতর হয়। ক্ষতস্থানে সেলাই করতে হয় কয়েকটা। সেই সময় থেকেই সাদামাটা তার মত করে সে একটা চিন্তা খাড়া করে নিয়েছে। অবশ্য এর জন্য জানতে হয়েছে তাকে প্রচুর। আজ তার ধারণাটা স্পষ্ট। রুশ দেশ যদি অত্যাচারী কুখ্যাত হিটলারকে আর সারা পৃথিবী থেকে ফ্যাসিইজমের সম্ভাবনাকে শিকড় সমেত উপড়ে দিতে না পারত তাহলে ভারতের এই স্বাধীনতা এত তাড়াতাড়ি আসত না।

অবশ্য ভারতের স্বাধীনতা যাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছে ইংরেজ, তাদেরই বেশি পছন্দ করত। তাই তড়িঘড়ি এই স্বাধীনতা দেবার ব্যবস্থা। নাহলে জনজাগরণের জোয়ারে সম্মুখ সারিতে চলে যেত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অন্য মানুষের দল। অন্য মূল্যে অন্য ভাবে আসত ভারতের স্বাধীনতা।

পরমা তাই অন্য ধরনের মানুষ। মানব সভ্যতার উষালগ্নে যে মানুষ দলবেঁধে পশু শিকার করে সমানভাগে ভাগ করে খেত। ভাগ করে খেত গাছের ফল। সেই যুগটার ওপর চোখ রাখতে ভালবাসে। বলে, বসুন্ধরা মা। তার বক্ষস্থলে সযত্নে লুকানো অমৃত রস, ফল-ফসল সবার জন্যেই রেখেছেন। তাতে যারা প্রয়োজনের বেশি ভাগ বসায় তারা মনুষ্য যুগকে একটা ইতর যুগে ফিরে নিয়ে যেতে চায় আর গেছেও। এই জঙ্গলের রাজত্বের অবসান ঘটাতেই হবে। মানুষের কাছে এটা অসাধ্য কিছু নয়। তবে এর জন্যে কিছুদিন এক নাগাড়ে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

চেষ্টা চালাতেই হবে। সকাল থেকেই কাজটা চালিয়ে যাচ্ছে পরমা। কোথাও না পেলেও 'সাব রেজিস্ট্রী' অফিসে অন্নপূর্ণার খোঁজ পাবেই এমনি একটা আশা নিয়ে বেরিয়ে যায় সে। শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত শুষ্ক মৃতপ্রায় অন্নপূর্ণাকে আবিষ্কার করে গুরুপদ ভাণ্ডারীর বাঁশের খোঁটা আর ইটের পিল্লের ওপর বসানো ভাঙা তক্তপোষের ওপর। গুরুপদ চিবোনো পানের টুকরো গোঁফের আগায় আর খোলা দলিল সমেত আশপাশের কাগজপত্রে ছেটাতে ছেটাতে বলে, বলতে হবে - হাঁ সব টাকা বুঝে পেইচি—বুঝেচো মেয়ে?

ফ্যাকাশে চোখ তুলে অন্নপূর্ণা বলে, হাঁ বলব। আমার ঘরখানা—

শ্রীমন্ত পাশেই বসেছিল। বাতাসে উড়ছিল তার রুক্ষ কাঁচা-পাকা

চুলগুলো। করমচার মত দুটো চোখ তুলে ফুঁসিয়ে ওঠে সে, সে কি আর আছে রে হতভাগী। নেখার আগেই দেবতার সেবায় লেগে গেছে।

তবে রে! চোখ পাকায় দর্পণ।

শ্রীমন্ত সবিনয়ে বলে, জিভ দিয়ে তো খারাপ কথা বার হয়নি বাবু। খারাপ হিসেবে নিচ্ছেন কেন? আমাদের যা কিছু ছোট খাট বস্তু সব তো দেব-দ্বিজেদের ভোগে লাগার জন্যে। এ তো খাঁটি কথা। তবুও যদি কিছু খারাপ বলে থাকি, নিজ গুণে ক্ষমা করে নিন।

পরমা দেখে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে শ্রীমন্ত হাসি মিশিয়ে সহজ ভাষায় কঠিন সত্যটাকে কিভাবে প্রকাশ করে যায়। সে নিজের চোখে দেখে এসেছে, দর্পণ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে, শ্রীমন্তের পুকুরের মাছ ধরিয়েছে, ঘরের টিন খুলেছে, চাল কাটিয়েছে, দেয়াল ভেঙেছে, মাটিগুলো সারা ডাঙায় ছড়িয়ে দিয়েছে, মাঝে মাঝে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে তৈরি করেছে আগামী দিনের পরিকল্পনা।

দলিলের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় টিপ নেবার জন্য হাত টেনে নেয় গুরুপদ। উঃ শব্দে চিৎকার করে ওঠে অন্নপূর্ণা। কালির পাত্রে আঙুল ঠেকিয়ে টিপ নেয় গুরুপদ। পরমার চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট সে দেখতে পায়, অন্নপূর্ণার ফ্যাকাশে শরীরখানাতে অবশিষ্ট যে রক্তটুকু ছিল তাও নিংড়ে বের করে নেয় এরা নৃশংসের মত। মাগো বলে পড়ে যায় অন্নপূর্ণা।

ছুটে আসে পরমা। বলে, আপনাদের পাখা নেই?

দরদ যে একেবারে উথলে উঠল।

অসুস্থ একজন—

হাঁা বাবা হাঁা—। বিসমিল্লা বলে প্যাঁচ টানার আগে পর্যন্ত, একটু জল-খড় দিয়ে যেতে হয়। তা জানি আমরা। অত শেখাতে হবে নে। কাজ বাকি আছে অতএব ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। অতএব যাও বাবা শ্যামাচরণ—একটু জল—একটা পাখা—

॥ ১৬ ॥

পরমার দৃষ্টি চলে যায় গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে। শ্রীদাম চক্রবর্তীর সুদের হিসেবের হাত থেকে কেউ রেহাই পেয়েছে বলে তার জানা নেই। ঘর-বাড়ি, জমি-জিরেত, গরু-লাঙ্গল, ঘটি-বাটি. সব তার খপ্পরে চলে গেছে। অজগর সাপের মত বিরাট হাঁ করে বসে আছে সে। মাঝে মাঝে হিংস্র জিভটা নাড়ে। এই মুখের মধ্যে কেমন যেন সম্মোহিতের মত মানুষ এসে ঢুকে পড়ে। বাইরে সারাদিন তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আনবে—অনেক কটু কথা বলবে। অনেক লম্ফ ঝম্ফ করবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই মানুষটা সুবোধ বালকের মত সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসবে। দর্পণের সামনে এসে বসবে। বলবে, ছেলেটার বড় জ্বর কিম্বা বউটা যায় যায়, আর কোন উপায় নেই, একটা ব্যবস্থা করো।

পরমার মাথা ঘুরতে থাকে। মানুষের অভাব, দারিদ্র্য যদি না থাকত—তাহলে এভাবে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ত না শ্রীদাম চক্রবর্তীর চরণে মানুষের এই দুর্বলতার পুরো সুযোগটা নিতে পারত না শ্রীদাম চক্রবর্তী। অজস্র ঘর ভাঙার ছবি তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। একরকম মড়ার মত হয়ে গেছে অন্নপূর্ণা। একটা সাইকেল রিক্সা চড়িয়ে তাকে নিজের ডেরার দিকে নিয়ে আসে পরমা। শ্রীমন্ত বলে, আমিও যাব। তুমি আগে যাও বাবা। ই শালার জাতটাকে আমি আগেই চিনিচি। তাই আমার কষ্ট কম। সব গেছে। গাছতলা আছে। আমার জন্যে কুনু ভাবনাই নেই। শুধু ভাবছি এই বাজ পড়া গাছটার আর তার পাশে ঝলসে যাওয়া চারা গাছটার কথা।

শ্রীমন্তর দু'চোখ জলে টলটল করে। গলার স্বর ভারি।

পরমা বলে, ভয় করবেন না। আমরা তো আছি।

সে কথা কি ভুলি বাবা। দুর্দিনে কে আমার সাথী, আর কে আমার শত্রু—তা চিনে নিতে কষ্ট হয় নে বাবা। এই জায়গায় ভুল করলে, বাকি পথটা তো চলতেই পারব না বাবা। যদিও ভাবছি আমাদের এবার শেষ। তোমাদের এবার শুরু করতে হবে

ধুলো ভরা গ্রামের রাস্তার ওপর সাইকেল রিক্সা ছুটে চলে। দুপাশে গাছ-গাছালির সারি। গাছের ওপর পাখির ডাক। কাঠ-বিড়ালীর দৌড়োদৌড়ি। সবই যেন অন্য কোন দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরেছে প্রকৃতি। আজ দুঃখ-জর্জর অন্নপূর্ণা তার সমব্যথী পরমার বুকে ব্যথা, চোখে জল। গ্রামের পথ শেষ করে গাড়ি এসে দাঁড়ায় শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক আর অন্যান্য মানুষের ঘেসাঘেসি জীবন ধারণের নির্ধারিত জায়গায়। পরমা সস্নেহে নামায় অন্নপূর্ণাকে। পদ্মা অনেক আগেই এসে গেছে। তাই পদ্মা আর কালানী রিক্সার ভেঁপুর আওয়াজে বেরিয়ে আসে।

মুখে কোন কথা নেই। এদের নিয়ে অভ্যন্তরে চলে যায় তারা।

পরমা অন্নপূর্ণাকে বসতে দিয়ে কালানীকে ডাকে রান্নাঘরে। কালানী শঙ্কিত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করে, কি ?

পরমা বলে—আজই অন্নদাদির চিকিৎসা করতে হবে।

আজই ?

হ্যাঁ। খুব খারাপ অবস্থা। আখের সব রস নিংড়ে নিতে দেখেছো। ওর অবস্থা ঠিক সেই রকম। তাছাড়া মনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত। সইবে কি করে ?

কথা শেষ হতেই দ্রুত পায়ে এগিয়ে যায় পরমা। ঘরে গিয়ে দেখে মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে অচেতন হয়ে পড়েছে অন্নপূর্ণা। পরমা পাশেই অনিল ডাক্তারের কাছে ছোটে। কালানী বলে, অনিলকে না পেলে বৃন্দাবনকে আনবে।

ঠিক আছে। তুমি পাখা চালিয়ে যাও। যা গরম। এমনিতে মানুষ দম আটকে যাবে।

কিছুক্ষণ আগেই এরা রাক্ষসী প্রকৃতির চেহারা দেখে এসেছে। শ্রাবণ মাসেও মাঠ ফুটি-ফাটা। একফোঁটা বৃষ্টি নেই। মাঠে গরু চরছে। একটা ঘাস নেই। সারাটা দুপুর আসে অলুক্ষণে কাকের ডাকের সঙ্গে গৃহে গৃহে মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে। রাত্রির ভয়াল অন্ধকারের মধ্যে চলে তার শেষকৃত্য আর দীর্ঘশ্বাসের পালা। কান্নায় কান্নায় পৃথিবী ভরে যায়।

ঘূর্ণি ঝড় ওঠে মাঝে মাঝে। ধুলো পাতা খড়ের টুকরো ওড়ে অনেক দূর পর্যন্ত। নদীর দিকে একবার তাকায় পরমা। ফুঁসে ফুঁসে ওঠে নদীর জল। ডাক্তারখানার সামনে কয়েকজনের মুখে তারা শোনে আলোচনা করছে নদীর মধ্যেও ঘূর্ণি। ক'খানা নৌকো ডুবেছে আজ দুপুরে। বুড়োশিবের চড়ায় গিয়ে উঠেছে কিছু লোকজন। বাকি সব শেষ।

মৃত্যু—মৃত্যু—

চারদিক থেকে শুধু মৃত্যুর হিসাব আসছে। মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে। আজ সকাল থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাকে কি বলবে, শক্তির জোরে শুধু জমি ছিনিয়ে নেওয়া। না এ বলতে তার মন সায় দেয় না। একদল মানুষ এমনি অসংখ্য অন্নপূর্ণাকে পথের ভিখারী করে দেয়। লালসা চরিতার্থ করতে না পেরে এমন অসংখ্য পদ্মর পাপড়িগুলো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেয়। দু'চোখে তার আগুন জ্বলে ওঠে। দু'হাতের মধ্যে বিদ্যুৎ যেন গতিবেগ পায়।

ডাক্তারবাবু।

আমি রেডী। তুমি যে ধরনের সিমটমের কথা বলেছ তার যত রকম ওষুধ আর ইনজেকসান আছে সবই আমি নিয়েছি সঙ্গে করে। তবে একটা কথা আগেই বলে নিচ্ছি, সময় যদি পাই ঠিক আছে। সময় না পেলে—কি করব বল? হ্যাঁ, তুমি বুঝবে ব্যাপারটা। কিন্তু বুঝতে চায় না, বোঝে না অঘামারা মানুষগুলো। হায়—হায়—হায় —কি বলব বলো। লম্ফ-ঝম্প করে চিৎকার করে বলবে, সুরেন

ডাক্তার—ওই ভগবতী ডাক্তার, ওই বিশ্বনাথ ডাক্তারকে আনতে পাত্তুম—। এ শালা কিছু কত্তে পাল্লে নে। একটা কেন বিশটা ডাক্তার না হয় তোরা আনতিস, মেনে নিলুম। কিন্তু সময়ের পরে এসে ওরা কি করবে? আর আমি শালা অনিল চন্দর এসেই বা কি করব? এসবগুলো ভেবে দেখতে হবে তো?

কথা বলতে বলতে ডাক্তারবাবু হাসেন। হাসির সাথে সাথে তার ভেতরের চিবোনো পান অনেকখানি বাইরে এসে ছিটকে পড়ে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে হাঁটতে থাকে পরমা। ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে যায় অনিল ডাক্তার। কিছুক্ষণ দেখে এসে বলে, ওকে শান্তিতে মরতে দাও ভাই। আর বেশিক্ষণ নেই।

কালানী ঘটি থেকে জল হাতে দেয়। সাবান ধরে। প্রায় নতুন একটা তোয়ালে এগিয়ে দেয়। ডাক্তার কালানীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমাদের ব্যাপারে অনেক গল্প শুনেছিলুম আমি। আজ দু'জনকেই চোখে দেখলুম। পরের জন্যে কোমর বেঁধে কিছু করতে তোমাদের যারা দেখেনি নি, তারাই একমাত্র বলতে পারে তোমরা সৃষ্টিছাড়া। আজ নিজের চক্ষে সবকিছু দেখে গেলাম। নরক কুণ্ডকেও সাজিয়ে-গুছিয়ে এমন মানুষ বাস করার মত করে কে সাজাতে পারে?

কালানী পারিশ্রমিকের টাকা দিতে যায়। ডাক্তার বলে, আজ থাক্। পাওনা রইল অন্য কোনদিন চেয়ে নেব।

সেদিন যদি হাতে না থাকে?

ঠকাব না মা। সে ভয় কোরো না। তোমার আছে জেনে তবেই আমি চাইব। আজ চলি। একটু তাড়া আছে।

ডাক্তার বেরিয়ে যায়।

পরমা নির্মেঘ আকাশখানার দিকে তাকায় কিছুক্ষণ। একটুকরো মেঘ নেই। আজ সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের ওপর দাঁড়িয়ে কৃষকের

বুকখানা যে ব্যথায় মোচড় খায়, পরমার দৃষ্টিতে সেই ব্যথা। কালানী ধীরে ধীরে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। পরমার পাশে। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, কি করবে বল? তুমি তো আপ্রাণ চেষ্টা করে গেলে।

হ্যাঁ।

কিছু খাবার আনতে হবে এদের জন্যে। এখুনি খাইয়ে দেওয়া দরকার।

কোন কথার জবাব দেয় না পরমা। হন্ হন্ করে বেরিয়ে যায়।

শ্রীমন্ত মুখ বাড়িয়ে দেখে আর ভাবে। ই শালা দুনিয়ার আর এক 'লীলে খেলা'। এক শালারা ভিটেমাটি সব কেড়ে নিচ্ছে। রক্তমাংসের দেহটাকেও ধরে টানাটানি করছে, শিয়াল শকুনের মত। আর সেই মানুষের আর একদল এমন দুর্দিনে আশ্রয় দিচ্ছে, ডাক্তার আনছে, সেবা করছে। ই শালা দুনিয়াকে চেনা ভার।

খাবার সময় শ্রীমন্তর মনে হয় এরা যেন কতদিনের আত্মীয়। আপনজন। জীবন থেকে অনেক কিছু হারিয়ে গেল। আবার এমন জিনিস পথে-ঘাটে পাওয়াও গেল। প্রথমে তো কথাটা বিশ্বাস হয় না তার। পদ্মার নামটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে এরাও কোন নতুন ধরনের সর্বনাশ করতে আসছে নাকি? কত ভাবনাই এসেছিল তখন শ্রীমন্তর মাথায়। কিন্তু কোন ভাবনাই দানা বাঁধতে পারে নি। হু হু স্রোতে ভাসা শ্রীমন্তদের জীবনের কাষ্ঠখণ্ডকে যে যেদিকে সঙ্গে করে নিয়ে এগিয়ে যেতে পেরেছে সে সেইদিকেই নিয়ে গেছে।

একবার শুধু মনে হয়েছিল শ্রীমন্তর—চলেছি তো এদের সঙ্গে। আবার যদি কোন ঘটনা ঘটে? তারপরেই মনে হয়েছে—আর কি আছে? মধু থাকলে ভোমরা আসে। এখন তো আর ছিটে ফোঁটা বলতে নেই। কিসের লোভে এই ছেলেটি ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের পেছনে।

দর্পণ একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ফেলেছিল পরমার দিকে। কিন্তু খুব

একটা বেশি সন্দেহ করে উঠতে পারে না। কারণ এটা আবার তার শাস্ত্রে লেখা নেই। দুঃখের দিনে দুঃখীর পাশে আবার থাকবে কে? সে দেখে আসছে দীর্ঘদিন। কেউ থাকে না।—দর্পণের ভাষায় 'ভোঁ ভাঁ হয়ে যায়।—থাকে যদি মধু।—সবাই লেপটে থাকে। রাতদিন কারণে অকারণে গুঞ্জন করে। তাই দু-চার বার কড়া চোখে তাকিয়ে ছেড়ে দেয়।

রেজিস্ট্রী হয়ে যাবার পর বিসর্জনের বাজনা ওঠে। মুহুরীর কাছে নিয়ে গিয়ে রসিদে সই করিয়ে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, শালার জাত হড়কে যায়, ল্যাঠা-চ্যাঙ মাছের জাত। মেয়েটা হড়কে দিব্যি হাওয়া হল! এখন শুনছি সেই রাতেই তিনি মহাবীরজীর সেবাদাসী হয়েছেন। চোখ আছে বাবা আমাদের। শ্মশানের সাধু নিজে চোখে দেখেছেন। এ বাবা মিথ্যে হবার নয়। যা বাবা 'উৎসন্নে' গেছে, আপদ গেছে।

জলে মাছের জোর আছে। শিল্পাঞ্চলের এই স্থানটিতেও পরমার বেশ জোর আছে। অন্নপূর্ণা মারা যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকে এসে দেখে যায়। দূরে দাঁড়িয়ে পরমার সঙ্গে কি সব আলোচনা করে সকলে। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই শ্মশান-যাত্রার সাজশয্যা প্রস্তুত। পদ্ম তাকায় কর্তব্যরত মানুষগুলির দিকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা তুলনামূলক ভাবনা তার মাথার মধ্যে খেলে যায়। গ্রামের মধ্যে কিছু মানুষের সমর্থন যদি তাদের ভাগ্যে জুটত, তাহলে হয়ত ভাগ্যের চাকাটা এভাবে ঘুরত না। খুব অল্প সময়ই সে এসেছে এখানে তার মধ্যে একটা আসমান জমিন পরিবর্তন দেখেছে। এখানে গতর খাটিয়ে মানুষগুলো মানুষের জন্যে ভাবে। শুধু ভাবে না। কিছু করে। মিলের শ্রমিক দূর সম্পর্কে তার কাকা মাখনই তো খবরটা দেয় পরমাকে। পরমা এখানের লোকজনদের মধ্যে আলোচনা করে নিয়ে ছুটে চলে যায়। এই অমানুষিক অত্যাচার থেকে সারা পরিবারটির মানুষগুলোকে রক্ষা

করতে হবে। এ আর একটা নতুন পৃথিবী, নতুন জগৎ বলে মনে হয় পদ্মর।

চিতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

মহাবীরের এ কি চেহারা! বিরাট এক পরিবর্তনের চিহ্ন তার চোখে মুখে। শ্মশানের আশপাশের সবাই তার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে। মদ খাচ্ছে কি খাচ্ছে না বোঝা যায় না। কথাবার্তা কম। গম্ভীর মুখ। পোযাক পরিচ্ছদের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। এখন অঙ্গে এসেছে ধুতি, সার্ট। গোঁফটা পরিপাটি করে ছাঁটা। আজব কুঁড়ের ভেতরেও এসেছে পরিবর্তন।

সাধুজী পরিহাস করে বলে ওঠে, ছেমন্ত মুচীর জামাই হবে এবার। একটু সভ্য ভব্য হতে হবেনে বাবা।

শ্মশানের এককোণে বসে থাকে পদ্ম। দু'চোখে ঝরে অবিরাম ধারা। পাশে কালানী। মহাবীর একসময় এসে বলে, এতো অত্যাচার ভগবান বরদাস্ত করছে?

কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ধীরে ধীরে উঠে পড়ে সে। এমন সময় পরমা এসে পড়ে প্রায় ঝড়ের মত। বলে, মহাবীর ভাই, কত সময় লাগবে?

দো ঘণ্টা।

পরমা পরমাত্মীয়ের মত তার গলা জড়িয়ে ধরে এক পাশে চলে যায়। কি সব কথাবার্তা হয়। শুধু কয়েকটা টুক্‌রো কথা ভেসে আসে—হাঁ-হাঁ—আলবৎ। ঘাড় নেড়ে চেড়ে কথা বলে মহাবীর।

পদ্ম আর এক নতুন জিনিস দেখে। অনেক কিছু বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে আজ কোন কথা বার হয় না। পর্বতপ্রমাণ এক প্রস্তরখণ্ড আজ তার কণ্ঠরোধ করে আছে যেন। তাকে অপসারিত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। হঠাৎ মনে হয় তার সারা দেহ-মনে নেমে আসছে এমন এক ক্লান্তি যাকে অস্বীকার বা পরাস্ত করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

অন্নপূর্ণার দেহ শেষ করে দিয়ে নদীর ধার ধরে এগিয়ে চলে সবাই। শ্রীমন্ত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, অন্ন, তুমি বেঁচে থেকে দেখে যেতে পারলে না এমন ছেলেও তোমার আছে। ভেঙে পড়া শ্রীমন্তকে তখন ধরে ধরে নিয়ে চলে পরমা। সঙ্গে চলে মহাবীর।

তামাটে আকাশ। গাছগাছালির রঙের মধ্যে সবুজ ভাবটা কেমন যেন অদৃশ্য হয়ে যেতে বসেছে। দুপুরের রোদ্দুরে গাছপালার ঝিমিয়ে পড়া পাতার দিকে তাকালে জীবনের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায় না। মানুষজন বার হচ্ছে না বাইরে। শুধু যাদের কাজকর্ম আছে, না বেরুলে নয় তারাই কোনো রকমে বাইরে বেরুচ্ছে। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে। মানুষ, গরু, বাছুর সমানে মরছে। খরার বিষ-কামড়। বন্যায় তবু পার পাওয়া যায় কিন্তু খরার হাত থেকে সহজে পার পাওয়া যায় না। খরায় পোড়া মাটিকে সরস করে তার বুকে ফসল ফলান দীর্ঘ সময়ের কাজ। এর মধ্যে কৃষক-জীবনের প্রদীপের তেলটুকু পুড়ে যায় সল্‌তে সমেত। অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এদের কথা ভাবার কে আছে আজ? পরমা কথাগুলো ভাবছিল নদীর ধারে বসে। গতকালই প্রভাসদা আর রথীনের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছিল। এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ায় মহাবীর। সহাস্যে বলে, জয় বাবা পরমেশ্বর।

হাসি হাসি মুখ, খবর কি?

খবর এখোন সব খারাপ। হরদম মরছে। কত মুর্দা জলে ভেসে আসছে দেখছো না। জ্বালাতে পারছে না। মাটি চাপা দিচ্ছে। দরিয়ায় ফেলে দিচ্ছে। গরু মহিষ ভি হরদম মরছে।

খারাপ খবর হলে তোমার মুখে হাসি কেন?

হামার হাসি তোমার অবস্থাটা দেখে। এমন রোদের বেলায় কেউ দরিয়ার কিনারে বোসে?

ঠিক বলেছ তুমি, ঠিক কথা।

উঠে দাঁড়ায় পরমা। মহাবীর পকেট থেকে বিড়ি বার করে।

ছুজনে ধরায়। সাধুজী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে এই বিড়ি ধরানো-পর্ব দেখে হাসে।

সাধুজী একসময় বলেই ফেলেন, আচ্ছা—আচ্ছা 'জিগরী দোস্ত' বনগিয়া, মালুম হোতা হ্যায়!

ছুনিয়াকা সভি আদমি তো হামরা দোস্ত হ্যায় সাধুজী।

আচ্ছা—আচ্ছা—। এক ধরনের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসতে থাকে সাধুজী। বলে, রথীন আর প্রভাস রায়ের সঙ্গে—

পরমা বলে, একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক যা হতে পারে তাই তো এটা। তার থেকে বেশি কিছু নয়।

স্বাভাবিক সম্পর্ক এমনিতে হয় না চাঁদ, আর সম্পর্ক এমনিতে থাকেও না। তার পেছনে আরো কিছু থাকে—বুঝলে, গম্ভীর গর্জনে বলে ওঠে সাধুজী।

সেই 'আরোটাকে' আপনি যে ভাবে দেখে মন্দের বলে ভাবছেন —তা নাও হতে পারে তো সাধুজী। সারাদেশ জুড়ে শুধু চোর-জোচ্চোর আর ডাকাত-গুণ্ডাদের আড়িপাতা কারবারই একমাত্র চলেছে তা আপনাকে কে বললে? মানুষের কল্যাণের জন্যেও তো মানুষ মানুষের কাছাকাছি হতে পারে। পৃথিবীতে কি তার নজীর নেই?

এরপর পরমাকে আর কিছু বলতে হয় না। সাধুজীর রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মত চোখ ছুটো হঠাৎ কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়। ধীরে ধীরে আরো নিষ্প্রভ হতে থাকে। তখন কথার দিক পরিবর্তন করে পরমা বলে, হায় হায়! কোথায় কি বলে যাচ্ছি। আপনার কাছে এসব বলে লাভ কি? ছুনিয়ায় বদমায়েসগুলোর জন্যে যা বলা দরকার সেকথা তো আপনাকে বলা যায় না। দিন, পদধুলি দিন।

সাধুজী সহাস্যে লাফিয়ে ওঠেন। বলেন, জিতা রহো বেটা। সাবাস! কেয়া নাম তুমহারা? এই সময়টার জন্যেই যেন সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন তিনি।

পরমেশ্বর কিন্তু লোকজন আমায় ডাকে পরমা বলে।

জুতা মারো শালা লোককো কেয়া জানতা উ-লোক। উল্লু, বলে হন্‌হন্‌ করে আপনস্থানে চলে যায় সাধুজী। তুরন্ত বাঘটার অবস্থা আপনচক্ষে দেখে তাজ্জব বনে যায় মহাবীর। সঙ্গে সঙ্গে তাকায় সে পরমার মুখের দিকে। সাহসের সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে পারে পরমা। বড় ভাল লাগে তার ছিমছাম এই যুবকটাকে। আরো ভাল লাগে তার আচার ব্যবহার ইত্যাদি। দেশের কথা মনে পড়ে যায়। উচ্চবর্ণের মানুষরা কাছে এগুতে দেয় না। দূরত্ব বাঁচিয়ে বসতে হয়। কত রকমের ছুতমার্গ। বাঙ্গালে এসব যদি মানে, তবে পরমা এমন ব্যবহার করে কি করে? অন্নপূর্ণাকে শ্মশানে দাহ করে ফিরে, পাশাপাশি বসে খাওয়া-দাওয়া করে পরমা। কালানী স্বচ্ছন্দে পরিবেশন করে যায়। এতটুকু জড়তা থাকে না তার ব্যবহারে। যেন আপনলোক এমনভাবে তাকে গ্রহণ করে সবাই। সেকথা মহাবীর ভুলতে পারে না। ভুলতে পারবে না তার জীবন ক্যানভাসে যে মহৎ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে সেদিন, তা মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত প্রতিক্ষণে কতবার মনে পড়বে তা হিসাব করে বলা বেশ শক্ত। এক কথায় বলতে গেলে, কয়েকটা দিনে মহাবীরের জীবনে বিরাট একটা পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন একটা সাইক্লোনের মত। এতে কিন্তু দিশেহারা হয়ে যায় না মহাবীর। বরং নতুন এক দিগন্তরেখা অবলোকন করে। নিজের ক্ষমতাকে আবিষ্কার করে।

পবিত্র শক্তিকে মহাবীর ভালবাসে। তাই পরমার স্পষ্ট কথাবার্তা তাকে রীতিমত আনন্দ দেয়। মহাবীর সাধুজীর কৃত্রিম জীবনের কথা জানে। তার ধারণা, পরমাও জানে তার জীবনের কার্যকলাপ। তাই একান্তে চোখ পাকিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করে মহাবীর, সব কুছ জানা আছে তো?

কি?

সাধুজীর ব্যাপার।

না।

জানেন না?

না ভাই।

হায় রাম! এ শালা বনৌটি—সাধু। আস্‌লি রূপ বহুৎ গন্ধা। এ সাধু নেহি। এক নম্বর ডাকু। ই আশপাশের গাঙে ডাকাইতি আউর ডাঙ্গায় ডাকাইতি সবখানেই ইনি আছেন।

সেকি!

হাঁ।—আপনি ডাঁট দিয়ে তাই যেই বলিয়েছেন চোর গুণ্ডা আউর ডাকাইতদের কারবার চলিয়েছে। ব্যাস্‌ চুপ্‌। জোঁকের মুখে নিমক পড়ে গেছে।

তাই নাকি? তবে এদের ভেতরে দুর্গন্ধ পাঁক যে থাকবে তা আমি অবশ্য জানি।

॥ ১৬ ॥

আকাশে মেঘ জমেছে। তাড়াতাড়ি বৃষ্টি আসার সম্ভাবনা। নদীর ওপর নৌকোগুলো দাঁড় টেনে এগিয়ে যাচ্ছে। জেলে-নৌকো-গুলো ইলিশের জাল নিয়ে প্রস্তুত। বর্ষা এসে গেছে। নদীতে রাত দিন মৎস্যজীবীদের কত কাজ এখন। সারারাত কেরোসিনের টিমটিমে কুপি দোলা খায় ঢেউয়ের দোলনায়। বৃষ্টি বন্ধ হবে। আবার আসবে। ঝিমঝিম। ঝমঝম। নেশা ধরিয়ে দেবে। বর্ষার কথা ভাবে মহাবীর।

পরমা বলে, কি অত ভাবছ?

বরষাত—

হাঁ। বর্ষা আসছে। তাড়াতাড়ি চলে যাই। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পেছন ফিরে এগিয়ে যায় সে। এগিয়ে যায়। আরো এগিয়ে যায়। পরমার পথের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মহাবীর। লোকটাকে দেখে যেন আশা মেটে না। তার চলাফেরা থেকে শুরু করে কথার প্রতিটি শব্দ যেন আলাদা ভাবে তৈরি।

আজব কুঁড়ের দিকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এগিয়ে যায় মহাবীর। ভক্ত লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসে। কোথায় দূরে গিয়েছিল। চিৎকার শুরু করে। মহাবীর কুঁড়ে-ঘরে ঢুকে একটা ঠোঙা বার করে। পুরো একটা ঠোঙা নিয়ে হাজির হয়। ছুটো ঠ্যাঙ মহাবীরের বুকের ওপর তুলে ঠোঙায় মুখ রাখে ভক্ত। মহাবীর বলে, সাব্বাস। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি আসে। ছুটে কুঁড়ের মধ্যে চলে যায় মহাবীর।

বাঁশি বাজিয়ে উর্বশী ভেসে যায় ভরা জোয়ারের নদীর স্রোতে।

রাত্রি বাড়ে। এখনো ঝিম ঝিম করে বৃষ্টি ঝরছে। হরকোচ আশশেওড়া আর ভেরেণ্ডা ভরা ঝোপটায় কি যেন নড়া চড়া করছে। মহাবীরের অন্তরে প্রবল ইচ্ছা জাগে জিনিসটা কি দেখে আসে। কিন্তু মাঝপথে সে ইচ্ছা বাধা পায়। ছপাস ছপাস শব্দ করে জনত্বই লোক এগিয়ে আসে। আকাশে বিদ্যুৎ চমকায়। মহাবীর খুব সহজেই দেখতে পায় কাল পোষাক-পরা ছ'জন লোক তার কুঁড়ের দিকে আসছে। কুঁড়ের মধ্যে মাথা গলায় তারা। দেশলাই কাঠি জ্বালে। প্রায় সাথে সাথে বলে ওঠে একজন, শালা মালটাল টেনে কাৎ। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। চল্।

একটু দাঁড়া না এখানে।

কেন ?

নৌকোখানা ঠিক আসছে কিনা জানিস ?

হাঁ—হাঁ—। আখড়া থিকে বরাবর চোখ রেখে আসচে।

মাল ঠিক মত আছে তো ?

নিশ্চয়।

শেষ অব্দি গুরুজীর কাছে যেন অবিশ্বাসী হতে না হয়!

ঠিক আছে বাবা, চাকে হাত দাও তারপর দেখবে কতটা মধু আছে।

গুরুজী, শিবে এরা আসছে কি? তাড়াতাড়ি ডাক। ঐ মিট-মিটে আলো জ্বেলে যে নৌকোখানা আসছে, ওটাই হবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাত-আটজন মহাবীরের কুঁড়ের কাছে এসে পড়ে। কুঁড়ের সামনের দু'জন চলে যায়। ভক্ত কিছুক্ষণ চিৎকার করে। একবার চরে নেমে যায়। তারপর আবার চলে আসে মনিবের কাছে। যেন বোঝাতে চায় এটা তার জীবনে কোন নতুন ঘটনা নয়।

মহাবীর উঠে বসে। ধীরে ধীরে এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে বাইরে আসে। নদীর চরের দিকে এগিয়ে যায়। দেখে একটা নৌকো ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় টানতে টানতে এগিয়ে যাচ্ছে তীর গতিতে। কিছু পরেই চিৎকার। পট্‌কা ফাটার শব্দ। দুম্ দাম্। নদীর বুকে জ্বলে মশালের আলো। মাছধরা নৌকো আর এদিকে ওদিকে ভাসা বয়াগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু পরে সব চুপচাপ হয়ে যায়। ছপ্ ছপ্ করে নৌকোটা এসে থামে আজব কুঁড়ের সামনে। কুঁড়েয় গিয়ে কাঠ হয়ে পড়ে থাকে মহাবীর।

চড়ারায়নগরের মৎস্যজীবী পাড়ায় মাছের ওপর নির্ভর করে বাঁচার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় রাজবংশী, বাগ্দী, জালিয়া কৈবর্ত, তিয়র, কাওরা ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা। এদের মধ্যে থেকে ডোম, রাজবংশীদের ঘরের কিছু জোয়ান ছেলেকে জমিদার বাবুরা চাকরি দিয়ে হাতে লাঠি ধরিয়ে দেয়। লাঠি পেয়ে এরা খুব খুশি। মনের আনন্দে জমি দখল করে। হুকুম মাফিক প্রজা ঠেঙায়। রাতারাতি ঘরবাড়ি ভেঙেচুরে সাফ করে দেয়। জমিদারদের অনুগ্রহ লাভ করে আনন্দের আর সীমা থাকে না তাদের। বাকি সমস্ত মানুষ নদীতে

মাছ না পেয়ে যখন খাবি খায় রঙ্গা ওরফে রাঙ্গালাল তখন চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, খা শালারা—হাওয়া খেয়ে বাঁচ।

হাওয়া খেয়েই বাঁচবো। তোর মত গোলামীর কড়িতে বাঁচবুনি।

তবে রে—

যা যা। ও ডাঁট দেখাবি জমিদার বাবুর কাছে।

কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে থাকে রঙ্গা। ধীরে ধীরে বলে, তুই-

হ্যাঁ আমি। বলে বুক চিতিয়ে রঙ্গার সামনে এগিয়ে যায় মুচিরাম।

ছুটো হাতকে সামলে রাখতে পারে না রঙ্গা, চালিয়ে দেয় মুচের ওপর। কিন্তু একি! এযে পাথর। কয়েকবার ধ্বস্তাধ্বস্তির পর পাড়ার মেয়েপুরুষরা ছাড়িয়ে দেয় ওদের।

বুড়ো গুরুচরণ পাকা গোঁফ ছুলিয়ে বলে, ভায়ে ভায়ে লাগতে নেই বাবা।

কে ভাই। ও ভাই! জমিদারের ম্যাড়ানি খেয়ে গরীবদের ওপর লাঠি চালায় না! ও শালা ভাই হবে কেন?

হুঁশিয়ার!

যা যা।

উঠতি জোয়ান বয়েস থেকেই মুচিরাম ছিল এই ধরনের ডানপিটে।

বাইরে থেকে কাল পাথর-কোঁদা মূর্তি দেখলে কি হবে, ভেতরটা ছিল তার ফুলের মত নরম।

জমিদার বাবুদের অত্যাচারের কথা শুনলেই তার বুকের রক্তে সাঁওতালী মাদল বেজে উঠত। তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ত রঙ্গা, বিষ্টুদের ওপর। সুযোগ পেলে তার হাতের ছোট দলটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

সেবার শুনল তাদেরই হাড় হাভাতে ঘরের একটা ছেলে স্কুলে

লেখাপড়া শিখে শহরে পরীক্ষা দিতে যাবে। বাহবা! ছোট নয় তারা! বুক ফুলিয়ে কথাগুলো প্রচার করতে লাগল মুচিরাম।

কি হবে বাবা নেখাপড়া শিকে?

কি হবে মানে? ছেরটা কাল ছোট হয়ে থাকব আমরা?

ভগমান যা ভাগ্যে নিখেছে—

রাখো তোমার ভগমান—

ছি ছি! ওকথা বলতে আছে বাবা—

আলবৎ বলব। আমাদের লাঠির জোরে জমিদার বাবুর জমিদারী চলবে, ভাল খানাপিনা চলবে সেটা হবে তার কপালের ধন, আর আমাদের কব্জির জোরের কুনু দাম নেই!

দাম তো দেয় বাবা।

ওটা দাম দেয়া নয়, লাখ টাকা কামিয়ে নিয়ে এক টাকা বকশিষ। কিন্তু আসল দাম কোথা—? খাটার পয়সা—? তাছাড়া অকাজ কুকাজ করিয়ে নেয় আমাদের দিয়ে।

মোটা সাদা গোঁফ নেড়ে একগাল হেসে গুরুচরণ বলে, কি জানি বাবা, তোদের কি ধরনের হিসেব—

কেন, বুঝতে কিছু অসুবিধে হচ্ছে?

না। অসুবিধে হয়নে। তবে বুঝেও কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

গুলিয়ে যাবেই। কারণটা হচ্ছে বহুদিন এক ধরনের হিসেব হতে হতে এ আর এক নতুন ধরনের হিসেব আমদানী হয়েছে তো।

মাথায় গামছাটা কষে বাঁধা, ঘাড়ে তেলে পাকানো লাঠি, দলবল নিয়ে এগিয়ে আসে রঙ্গা। ফূর্তিতে বেসামাল হয়ে লুটোপুটি খেতে খেতে গুরুচরণের কাছাকাছি হয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে বলে:

হরের ব্যাটা শেমো ঢালি
সায়েব হবার আশ গো।
কেতাব পড়ে বিলেত যাবে
কভুই ছিল সাধ গো॥

পড়বে পায়ে ফিঁতে আঁটা,
গলায় থাকবে বোতাম সাঁটা,
এক ঘায়েতেই বেবাক খতম।
একি সওয়া যায় গো॥

এত হাসি কেন? এত আনন্দের কি হল, খুলে বল না আমায়। তোর ছড়া হেঁয়ালী ভেঙে মানে বুঝি নি বাবু। গুরুচরণ গভীর ভাবে জানার আগ্রহ প্রকাশ করে।

রঙ্গার সাকরেদ বিজু বলে, এমন কিছু নয় গো খুড়ো। হরি ঢালির ব্যাটা শ্যামসুন্দর বাবু শহরে পরীক্ষা দিতে যাবে। তাই নবাবী করে জুতো এনে পায়ে পরে গুনগুন করে গান ধরে জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মানে জুতো পরার 'রিয়েশেল' দিচ্ছিলেন। জমিদার বাবু ঘোড়ায় করে আসছিলেন কল্যাণগড় থেকে। কাঁচারিতে ঢুকেই 'অডার'। পাকড়াও শালেকো। লাগাও বেত। এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে জুতো পরে গান হাঁকিয়ে যাওয়া। ব্যাস্। বেরিয়ে পড়ল দারোয়ান। শপাং—শপাং—শুরু হল। বাছাধনকে আর পরীক্ষে দিতে হচ্ছে নে।

মুচের দাঁতগুলো কড়মড়িয়ে ওঠে। মাটিতে বাঁ পায়ের গোড়ালি দিয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে হন্‌হন্ করে চলে যায়। এরপর বেশ কয়েকদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রায় মাসখানেক পরে উদাস উদাস দৃষ্টি নিয়ে মুচিরাম গ্রামে ফিরে আসে! বাপ মা জিজ্ঞাসা করে, কোথা ছিলি বাবা?

অনেক দূরে চলে গিয়েছিনু।

কেন?

এমনি।

সেদিন গভীর রাতে নারীকণ্ঠের কাতর চিৎকার ওঠে, বাঁচাও বাঁচাও—মেরে ফেললে—

উঠোনে এসে দাঁড়ায় মুচিরাম। চিৎকার আরো তীব্র হতে

থাকে। তার সারা শরীরখানা কেমন যেন লাফিয়ে ওঠে। হাতে একখানা কাটারি নিয়ে ফণা তোলা সাপের মত সে এগিয়ে যায়। কয়েকটা লাফ দিয়ে রঙ্গার উঠোনে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, এই শালা মার বন্ধ কর।

কে বাবা তুমি ?

তোর যম।

তবে রে—। ছড়িখানা ফেলে দিয়ে একটা শাবল নিয়ে ছুটে আসে রঙ্গা। লাফিয়ে পড়ে মুচের ওপর। মুচে রঙ্গার হাতের শাবলখানা এক হাতে ধরে নিয়ে অন্য হাতখানা চালিয়ে দেয় তার মাথার ওপর। বেশ কয়েকবার। মাটিতে চলে বেশ কিছুক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি। শেষ পর্যন্ত কাঁপতে থাকে রঙ্গার দেহখানা। মুচে কাটারি খানা তার দেহটার ওপর ফেলে দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে যায়। দু'পাঁচজন যারা এসেছিল পাথরের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে।

চড়ারায়নগরে একটা ঝড় বয়ে যায়। জমিদার সিংহবাবুদের প্রত্যক্ষ আর সক্রিয় অংশ গ্রহণে লক্ষে করে পুলিশ আসে পর পর কয়েকদিন। রঙ্গার বৌ কদম পুলিশের কাছে ক্ষত-বিক্ষত সারা শরীরখানা দেখিয়ে বলে, আমায় মেরেই ফেলত। আমার কান্না শুনে পড়ার লোক ছুটে আসে। ছুটে আসে মুচে। তাকে দেখে, আমার স্বামী একটা শাবল নিয়ে লাফিয়ে পড়ে। মুচে শাবলখানা ধরে ফেলে। পাশে একটা কাটারি ছিল, সেটা হাতে নিয়ে কোপ মারে।

তুমি বাধা দাও নি ?

না।

কেন ?

খুব তাড়াতাড়ি ঘটে যায় ঘটনাটা। কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারিনি।

আর কারা ছিল ?

অনেকেই ছিল। নাম মনে করতে পারছিনি।

তারা কেউ বাধা দেয় নি ?

তাদেরও বোধহয় আমার দশা হয়েছিল।

এরপর মাস চারেক কেটে যায়। সেদিন দুপুর রাতে আগড়ে ধাক্কা শুনে এগিয়ে আসে কদম। বলে, কে ?

আমি মুচে।

ওঃ।

দরজা খুলে দেয় কদম নিঃশঙ্ক চিত্তে।

মুচের মুখ বোঝাই দাড়ি গোঁফ। আদুল গা; কোমরে একটা ছোট্ট কাপড় মাল কোচা দিয়ে আঁটসাঁট করে পরা। কুপি জেলে সেদিকে একবার ভাল করে দেখে নেয় কদম। পরে বলে, আজ কি আমার পালা ? কই হাতে অস্তর কোথা ?

আমি জাতে রাজবংশী। বীর। মেয়েদের খুন করা আমার কাজ নয়। ধর্ম নয়। শয়তানদের ঢিট করাই আমার কাজ। কিন্তু আমি তো তোমার স্বামীকে খুন করিচি। তার অপরাধের শাস্তি দিতে গিয়ে তোমার কাছে অপরাধ করে ফেলিচি। এর জন্মে ক্ষমা চাইতে এসিচি।

স্বামীকে খুন করলে স্ত্রী ক্ষমা করবে ? সেই জন্মে এসেচো এখেনে, না অন্য কোন খারাপ মতলব নিয়ে এসেচো ?

সেদিন এখেনে এসেছিলুম তোমার কান্না সহ্য করতে না পেরে। আজ এসিচি তোমার স্বামীকে খুন করিচি তার জন্মে ক্ষমা চাইতে। তুমি বিশ্বাস করো।

কদম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মুচের মুখের দিকে। কিছুক্ষণ পরে মুখটা নিচু করে নিয়ে বলে, যদি তোমায় বলি, রঙ্গা মরার পর আমার দুঃখু নেই, এর জন্মে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে না।

মুচের চোখ দুটোর মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জলে ওঠে।

বর্শার ফলার মত কুপির আলোটা কুলুঙ্গি-দিয়ে-আসা বাতাসে দুলতে থাকে।

কদম বলে, একটা শয়তান পিচেশকে শেষ করে দিয়ে তুমি ভালই করেচো। আমার সারা শরীরখানায় হাজার হাজার বেতের দাগ। কালসিটে পড়ে গেছে। জমিদারী কায়দা শিখে বাবু মশাই মাগের ওপর রোক্ ঝাড়ত রোজ গভীর রাতে বাড়ি এসে। আমাকেও জোর করে ধরে এনেছিল নাকাশি পাড়ার মাঠ থেকে—। আমার বাবার সামনে থেকেই।

তাহলে তোমায় বিয়ে-থা করেনি ?

হায় কপাল ! মাছধরা হচ্ছিল নাকাশি পাড়ার বিরাট মজা দীঘিতে। মেয়েপুরুষ অনেকেই গিয়েছিল মাছ ধরতে। ঠিক দুপুরবেলা জমিদারের পাইক বরকন্দাজ ছুটে গেল হৈ হৈ করতে করতে। দীঘিতে-নামা ছাকনি জাল, খেপলা জাল, পোলো নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে সবাই। রঙ্গা চেঁচায়, এটা জমিদারবাবুদের খাস সম্পত্তি। এতে তোরা মাছ ধচ্চিস কেন ?

জেলেরা জবাব দেয়, আমরা ছেলেবেলা থেকে ধরে আসচি এখেনে। কেউ কোনদিন একটা কথাও বলে নি। আজ তুমি বাধা দিচ্ছ কেন ? মা গঙ্গার জলে যেমন সবার মাছ ধরার অধিকার, এখেনেও তেমনি।

চোপরাও—

মারবে নাকি ?

আলবৎ।

সঙ্গে সঙ্গে বেধে যায় খণ্ড যুদ্ধ। জমিদারের পাইক বরকন্দাজ আর মৎস্যজীবীদের মধ্যে। শুধু হাতে বেশিক্ষণ বীরত্ব দেখানো যায় না। জলে-কাদায় নেমে লাঠি চালিয়ে রঙ্গারা কাজ হাসিল করে। কাপড়-জামায় কাদা লাগলে কি হয়, ওতো সার্টিফিকেট। খালুই হাঁড়ি কোঁচড় থেকে সযত্নে রাখা মাছ ফেলে দিয়ে বীরত্ব দেখাতে

দেখাতে মাঠের পথ ধরে সবাই। পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল কদম। তার ডাগর চোখ, গোল মুখ, একমাথা চুল আর স্বাস্থ্যের জোয়ার দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে রঙ্গা। বলে, চল আমার সঙ্গে।

কেন?

কেন জানিসনি—হে—হে—হে—। আমার ঘরে জরু নেই। তুই হবি আমার ইস্তিরি।

চিৎকার করে ওঠে কদম। তার বাবা হা হা করে ছুটে আসে।

কোন কথা গ্রাহ্য না করে কদমকে টানতে টানতে নিয়ে যায় রঙ্গা। সেদিন কাঠফাটা রোদ্দুরে রঙ্গার সর্বনাশ কামনা করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত অন্তরে এগিয়ে যায় কদম।

সেই কদম আজ অনেক শান্ত শীর্ণ। শীতের ক্ষীণ স্রোতা নদী যেন। মুচের টলটল-করা চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আমাকে জ্বালার হাত থেকে বাঁচিয়েচো কিন্তু আমার স্বামীকে খুনও করেচো।

স্বামী?

হ্যাঁ স্বামী। আগেকার রাজরাজারাও তো এমনি করে তাদের স্ত্রীকে ধরে আনতো।

তুমি এটা মান?

এখনো যখন নিয়মটা চলচে মানি বইকি। নিয়মটা ভেঙে দাও। আর মানবো না। পারবে ভাঙতে? সে হিম্মৎ আছে?

মাথা নিচু করে মুচে। ধীর কণ্ঠে বলে, খাবার কিছু আছে? বড় খিদে পেয়েচে।

কদম এমন আবেদন এর আগে কোনদিন শোনে নি। আজ তার অন্তঃস্থলে এই করুণ আবেদন এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে চলে যায় কদম। রান্না-চালার পশ্চিমদিকে ঘন বনটার দিকে তাকায়। দু'চারটে জোনাক পোকা জ্বলছে। উদোম উঠোনের ওপর শিয়াল দাঁড়িয়েছিল। কদমের বাইরে আসার সঙ্গে

সঙ্গে ছুটে পালায়। পাশে বাদাম গাছটায় কেঁও—কেঁও চিৎকার করছে একদল বাদুড়। মাঝে মাঝে তাদের ডানা সঞ্চালনের শব্দ কানে ভেসে আসে। খালের ধারে খেল-কদম জঙ্গলের পাশে একটা ডিঙি বাঁধা। কদম তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতরে আসে। মুচেকে বলে, ডিঙিতে তুমি এসেচ?

হাঁ।

জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে যায় কদম।

খিলেনৌকো নিয়ে আসার সময় মুচে গভীরভাবে চিন্তা করতে করতে এসেছে, এই অন্ধকার-জীবন সে তো কোনদিন আশা করেনি। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে কিন্তু প্রতিবাদ এমন পর্যায়ে এসে গেছে যার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের স্বাভাবিক আলোগুলো নিভে গেছে। কত সুখী ওই মৎসজীবীরা। ট্যানা পরে নদীতে থর-জাল, বেংতি-জাল পেতে যারা বসে আছে, পুলিশের লঞ্চ ওদের নৌকোয় গিয়েও মাঝে মাঝে হানা দেয়। বলে, মুচে আছে?—মুচিরাম? আরো অনেকের নাম বলে, যারা তার মত অপরাধ করেছে বা করে বেড়ায়। দৃঢ়তার সঙ্গে নৌকোর লোকেরা বলে, সে কেন এখেনে থাকবে! কোথা আছে দেখগে। আমরা পেটের জ্বালায় এখেনে সারারাত 'জাল ধরে' বসে আচি।

আজ মুচেকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পেছনে তার অনেক শত্রু। জমিদার বীরেন্দ্রকিশোর সিং অনেক লোক লাগিয়েছে। ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছে। সরকারী ব্যবস্থা যা সেটা তো আছেই।

কপালে এই দুর্যোগ নিয়ে গভীর জঙ্গলে তার দেখা হয়ে যায় নিশিকান্ত সাধুর সঙ্গে। তার সঙ্গে আছে আরো অনেকে, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। লুটে আনে সর্বস্ব। ঘৃণায় ভরে যায় মুচের মন।

নিশিকান্ত বলে, চমকালে কি হবে বাছা। থামো। কিছুদিন থাকো—সব বুঝতে পারবে।

মুচের পালিয়ে যাবার পথ নেই। থাকতেই হবে এখানে। থেকে যায়। শোনে নিশিকান্তর কথা। নিশিকান্ত বলে, শালারা আমাদের সামনে লোক ঠকিয়ে ভুঁড়ি দোলাবে আর আমরা চুপচাপ দেখে যাবো। হতে পারে না মুচিরাম। এর একটা ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যবস্থা না নিলে এরা সমানে এগিয়ে যাবে। আরো অন্যায় করবে।

কথাটা খুব একটা মনঃপুত হয় না মুচিরামের। তবু যে আশ্রয়ে থাকতে হয়, সেখানকার কিছু কথা মানতেই হবে। তাই মেনে নেয় কথাগুলো।

এর মধ্যে নিশিকান্ত দু'একটা কাজ করিয়ে নেয় মুচিরামকে দিয়ে। কাজকর্মের খবর শুনে সে হাসে। বুঝতে পারে মুচিরাম লড়াইয়ে প্রথম সারির লোকের যোগ্যতা রাখে।

সেদিন দিন-দুপুরে গভীর অরণ্যের মধ্যে নিশিকান্ত বলে, তুই চলে যা মুচে।

কোথা ?

কদমের বাড়ি।

কেন ?

কেন বুঝতে পারছিস না। লাঠির জোরে যে জমি দখল করলি তা কার জন্যে ফেলে রাখবি ?

কদমের কাছে যাবো ?

হ্যাঁ। যাবি। খবরা-খবর পাবি। খারাপ বুঝলে পালিয়ে আসবি। ভাল বুঝলে থাকবি। রাতের অন্ধকারে গিয়ে আশ্রয় নিবি মাঝে মাঝে। ব্যাস্।

কদমের কাছাকাছি এসে কিন্তু মুচের আগেকার সমস্ত পরিকল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

কদম গামলায় করে ভাত আর তরকারী এনে মেঝের ওপর রাখে। বলে, তুমি খেয়ে নাও। আমি বাইরেটা একটু দেখি।

মুচিরাম গোগ্রাসে গিলতে থাকে ভাতগুলো। ক'দিন পুলিশের ক্রমাগত তাড়া খেয়ে খেয়ে তার পেটে অন্ন জোটে না। আজ পেটটা বোঝাই করতে পেরে খুশি হয়ে ওঠে। কদম বাইরে দেখবার কাজটা করায় সে রীতিমত নিশ্চিন্ত।

কদম ঘরের মধ্যে এসে দেখে মুচিরাম গামলার সব কিছু খেয়ে তার বিছানার ওপর পরম নিশ্চিন্তে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ভোর হবার আগে ডেকে দিলেই চলবে। কদম ঘরের আগড়টা আলগা রেখেই দাবায় গিয়ে বসে।

কিছু পরে তিন চারটে মূর্তি এসে দাঁড়ায় কদমের উঠোনের ওপর। অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, মুচে আছে?

কে তোমরা?

তার দলের লোক।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে আসে মুচে। উঠোনে নেমে বলে, কি?

একটা কাজ আছে।

আজ?

হাঁ।

কদমের দিকে একবার মুখ ফিরিয়ে চলে যায় মুচে।

কদম ভাবতে বসে, মুচে কি খুব ঘৃণার কাজ করেছে? তার চিৎকার শুনে সহ্য করতে না পেরে আজ অন্ধকারে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। পুরোপুরি তার জন্মেই এই দশা বেচারার। আজ নিজের খাবারটা তাই বিনা দ্বিধায় তার হাতে তুলে দিয়েছে কদম। মুচের খাবার দৃশ্য দেখে তার কান্না পায়। এতদিন পর্যন্ত খাবার পাত্র রঙ্গার সামনে তুলে ধরে কদম পেয়েছে শুধু গালাগাল ভর্ৎসনা আর অত্যাচার। আজ এক বিশেষ ধরনের ব্যতিক্রম তার সমস্ত

চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। তৃপ্তির সঙ্গে গামলার শেষ কণা পর্যন্ত মুখে তুলে দিয়ে বড় ঘটির জল গলায় ঢেলেছে। নিশ্চিন্তে তার বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়েছে। কোন সন্দেহ পর্যন্ত করে না। অথচ রঙ্গা প্রতি মুহূর্তে তাকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। চিৎকার করে সাত পাড়ার লোক জমা করে প্রকাশ্যে বলেছে, আমায় ভাল লাগবে কেন, বেঘো মনটা কি রেখেছে? দিনরাত তার সঙ্গে ফুস্থর ফুস্থর গুজুর গুজুর। যা, তার ঘর করগে যা।

ঝোঁকের মাথায় লোভ লালসায় ধরে এনেছে তাকে। দিনরাত জ্বালা দিয়েছে। জ্বালা দিতে দিতে শেষ হয়েছে।

কদমের বাবা এসেছিল খবর শুনে। কদমকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কদম রাজী হয়নি। বলেছে, কষ্টের বড় ধকলটা যখন সহ্য করিচি বাকিটা করে নুবো। তুমি এসো মাঝে মাঝে। দেখে যেয়ো। জমিদার বাবুরা এখন টাকা-কড়ি ধান-চাল পাঠাচ্ছে। তোমার ওখানে গেলে পেটের খাবার তো জুটবেনে।

অনেক ভেবে চিন্তে এখানে পড়ে আছে কদম। একটা কথা ভাবার চেষ্টা করে সে, তার এই দড়কচা অসম্পূর্ণ জীবনের জন্য দায়ী কে? খুঁজে বার করতে ইচ্ছা হয় আসল দোষীটাকে। তারপর নখের ওপর রেখে টিপে শেষ করে দিতে ইচ্ছা করে তাকে।

আজ রাতের অন্ধকারে মুচেকে নিয়ে গেল যারা তারা তো কোন দেবী পূজো করতে গেল না। নিশ্চয়ই কারো সর্বনাশ করতে বার হল। এর জন্যে মুচে কতখানি দায়ী? অথচ এর দায় দায়িত্ব তার বড় কম নয়। এই সব ভাবতে ভাবতে কদম কখন ঘুমিয়ে পড়ে।

॥ ১৭ ॥

সকালে মানুষজন নদীর বাঁধ ধরে যাতায়াত করে। রক্তের একটা রেখা সাধুজীর আস্তানা পর্যন্ত দেখা যায়। ওখান থেকে

রক্তের রেখা গ্রামের দিকে চলে যায়। সবাই এ ব্যাপারে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ চাওয়া-চায়ি করে। মহাবীর সাতসকালে ডেকে আনে পরমাকে। সব দেখায়। রাতের বেলাকার কয়েকজন মানুষের গতিবিধির কথা শোনায়। পরমা বলে, আর তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না মহাবীর।

কেন?

বাংলায় একটা কথা আছে জানো? চোর মরে সাতঘর জড়িয়ে।

তার মানে ওরা আমাকে জড়াবে? হামিভি সব ঘটনা বলে দোবো?

কিন্তু পুলিশ তখন তোমায় জিজ্ঞাসা করবে তুমি যদি এসব জানতে তবে আমাদের জানাও না কেন?

হাঁ। এ বাত ঠিক আছে। এ বাত বিলকুল ঠিক।

পরমা জানায়, ডাকুরা ভীষণ সেয়ানা। ঘটনাস্থলে কোন্‌দিক দিয়ে এলো আর কোন্‌দিক দিয়ে গেল কোনক্রমে বুঝতে দেবে না। তাহলে পুলিশ মোটামুটি ধরে ফেলতে পারবে যে।

আগে ভি একবার পুলিশ ছোটাছুটি করেছিল। শুনা বহুত টাকাকড়ি দিয়া আউর সব বাঁচিয়ে গেলো। বহুৎ মালপত্তর পাকড়াও কিয়া থা পুলিশ।

আজকে পুলিশ শুধু মাল পাবে না। পাবে ডাকু সর্দারকে একটা ঠ্যাং ভাঙা অবস্থায়। কারণ মেদিনীপুরের ঐ নৌকোখানায় ওষুধ আর মালপত্র যেমন ছিল তেমনি ছিল কয়েকজন ভাল লাঠিয়াল। তারা দেখেছে সাধুজীর মত চেহারা। তাই গতকাল তুমি বলতে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল আমার মনটা। আজ আমার মন কিন্তু রীতিমত শক্ত। এতটুকু সন্দেহ নেই। সাধুজী ডাকাত সর্দার।

এতো সকাল বেলা তুমি এতো সাংঘাতিক খবর পেলে কোথা থেকে?

কাল ডাকাতি হয়ে যাবার পরই মাছধরা নৌকো নিয়ে আমরা গিয়েছিলুম। সেই সময় নৌকোর লোকেরা বলে, অন্য নৌকো নিয়ে রাত্তিরেই তারা থানায় চলে গেছে।

পরমার মুখের দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহাবীর। পরমা তার পিঠে চাপড় মেরে বলে, আরো শুনবে এই রাতেই নিরাপদ ভেবে সমস্ত ওষুধের পেটি চলে আসে হারান ডাক্তারের ডাক্তারখানার পেছন দিকের বিরাট ঘরখানায়। মুদিখানার মাল চলে যায় শ্রীদাম চক্রবর্তীর গোলায়। দিনের পর দিন এটাই হয়ে আসছে। শ্রীদাম চক্রবর্তীদের অস্বাভাবিক শ্রীবৃদ্ধি। এদিকে চোরের চোখ ভরে। পেট আর ভরে না।

মহাবীরের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

কেমন একটা উত্তেজনা সারাদিন মাতিয়ে রাখে মহাবীরকে। সন্ধ্যার পর গা ছম ছম করতে থাকে তার। নদীর দক্ষিণ দিকের বাঁধ ধরে বেশ কিছুদূর হাঁটতে থাকে। আজ তার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় পদ্ম। কয়েকদিন নানান ঝক্কি ঝামেলা এসে আছড়ে পড়লেও পদ্মর মুখখানা মাঝে মাঝে মনের সামনে এসে আবার হারিয়ে গেছে। এই হাঁটাপথে মহাবীরের মন জুড়ে পদ্মর কথা। যা হবার হয়ে গেছে। এখন পদ্ম আর তার জীবনের মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র আছে কিনা ভাবে। পদ্ম তার মায়ের মৃত্যুদিনে একটা কথাও বলেনি। ভারাক্রান্ত মন। কিন্তু এক চরমতম দুঃখের মুহূর্তে পদ্ম তার কাছে এসেছে। শুধু কাছে এসেছে বললে ভুল হবে, জ্বরের উত্তেজনাতেও যতটুকু মন ধরে রাখতে পেরেছে, তাতেই উপলব্ধি করতে পেরেছে পরম আত্মীয়ার মত পদ্ম তার সেবাযত্ন করেছে। ঠিকমত ওষুধ দিয়ে বাঁচিয়েছে।

একদিন মহাবীর পদ্মর প্রাণরক্ষা করেছিল, এটা কি তার প্রতিদান মাত্র না আরো কিছু। এই প্রশ্নে সে পাগল হয়ে ওঠে। কয়েকদিন মনের দিক থেকেও সে ক্ষত বিক্ষত।

আর বেশিদূর যেতে মত চাইছে না। কুঁড়ের দিকে এগিয়ে আসে মহাবীর। দূর থেকে দেখে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কুঁড়ের ধারে। আরো ভাল করে দেখার চেষ্টা করে। মনে হয় যেন কোন স্ত্রীলোক। তবে কি পদ্ম এলো। বুকের মধ্যে দ্রুতলয়ে হৃৎস্পন্দন হতে থাকে। পায়ের দ্রুততা কেমন যেন কমে আসে। অনেক কথা ভিড় করে আসে মনের কোণে। কোন্ কথাটা দিয়ে আজকের আলাপ শুরু করবে। পরমার পরামর্শ মত একটা হ্যারিকেন কিনেছে। আগে গিয়ে জ্বালবে সেটা। সেই আলোয় খুব ভাল করে দেখবে মুখখানা। আগে মায়ের মৃত্যুর জন্য সহানুভূতি জানিয়ে তবে অন্য কথায় আসবে।

দেখতে দেখতে আজব কুঁড়ের সামনে এসে দাঁড়ায় মহাবীর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ কাপড় দিয়ে ঢেকে সাধুজী দাঁতে দাঁত ঘসে বলে, আমি ডাকাতি করি তুই শুয়ার জান্‌লি কোথা থেকে? পরমা জানল কোথা থেকে? গত রাতের ঘটনা তোরা জানিস? আমার পায়ে ঘা লেগেছে। রক্ত ঝরে ঝরে এসেছে এ ব্যাপারে যদি কেউ বিন্দুবিসর্গ জানে তোদের জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

কথা শেষ করে জবাবের কোন সুযোগ-সময় না দিয়ে একটা লাঠির ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চর থেকে ধারে উঠে যায় সাধুজী। সঙ্গে তিন-চারজন সঙ্গী।

এঁকেবেঁকে খালটা বার হয়ে গেছে পূর্বদিকে। নামেই খাল। চেহারাটা রীতিমত শাঁসাল। ভাগীরথীর জোয়ার-ভাঁটা অবাধে এর মধ্যে ঢুকে যায়। ছোট ছোট নৌকো ডিঙিও আসে মালপত্র নিয়ে।

খালের ধারে কুঁড়ে ঘরগুলোতে আজ রীতিমত আশঙ্কার বাতাস বইছে। পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে কোন 'ঝুজ্‌কো' ভোর থেকে। আসল ব্যাপারটা যারা জানে, তাদের ধারণা বাড়ির দরজায় এই রাজপুরুষরা রাতদুপুর থেকে ঘোরাফেরা করছে মুচিরাম আর কেষ্ট সিংকে ধরার

জন্যে। আসল দু'জন পুলিশের গন্ধ পেয়ে খাল ঝাঁপিয়ে উধাও। ধরা পড়েছে সাকরেদরা।

ক্যারকেরি-জ্যাঠাই কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে যায়, পাঁচজনে খায় ননী, বাঁধা যায় নীলমণি। ঝাঁটা মার, আধোয়া ঝাঁটা মার গুখেকোর ব্যাটাদের মুখে। বাছাদের মাত্তে মাত্তে নিয়ে গেল—

খালে নৌকো ভাসিয়ে আস্‌তে আস্‌তে ছিমন্ত বলে, কি হলো গো জ্যাঠাই ?

তুই আবার এমন সময় এলি ? কোথা গেছলি ? শুনিসনি কিছু ? পালিয়ে যা এখিন থিকে। আঁটকুড়ির ব্যাটারা রাত থিকে যাকে পাচ্ছে তাকেই বেদম ঠ্যাঙাচ্ছে। কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।

ছিমন্ত তাড়াতাড়ি নৌকোখানা গাবগাছের মোটা শেকড়ে বেঁধে ক্যারকেরি-জ্যাঠাইয়েয় কাছে এসে দাঁড়ায়। গলার স্বর অস্বাভাবিক নিচু করে বলে, কাকে কাকে নিয়ে গেল ?

জ্যাঠাই ছিমন্তকে ধাক্কা দিয়ে বলে, তুই তাড়াতাড়ি সরে যা বাবা ! কালামুখোরা আশপাশেই কোতা লুকিয়ে আচে।

বেলা বাড়ে। শ্যামগঞ্জের মিলের শ্রমিকরা দল বেঁধে খেতে আসছে বাড়িতে। শুধু মাছ মেরে পেট চলে না। তাই মিলের কাজে লেগে গেছে। অনেকে। এরা বলতে বলতে আসে, শালারা রাতারাতি বড়লোক হতে চায়। সাম্‌লা এবার ঠ্যালা।

মাল তো সব চলে গেছে ছিদাম চক্কোত্তির গদিতে।

দারোগাবাবুর পিটুনি আর জেলখানার ভাত এখন বাছারামদের কপালে।

শ্রমিকদের মধ্যে নটবর একটু উট্‌কো প্রকৃতির। সে বৃন্দাবনের কানের কাছে মুখ এনে বলে, একদিন শালা দপ্পণে আমার কাছে লোক পাঠায়। বলে কিনা রাজবংশীর ছেলে, কব্জির জোর আছে। সাহস আছে। লেগে যা একাজে। আখের ভাল। আমি

প্রথমটায় কেমন যেন ঘাবড়ে যাই। বাড়িতে বলতে বাবা চেঁচিয়ে ওঠে। বলে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দোবো তাহলে। সেই থেকে শালাকে দেখলে আমি উল্টোদিকে পথ হাঁটি।

মেয়েরা কাজ সেরে ফিরে পড়ছে। আবার বিকেলে যেতে হবে। রাস্তায় হুলুস্থুল কাণ্ড। শঙ্করী মেয়েটাকে দেখতে শুনতে রীতিমত ভাল। এ নিয়ে অনেকে অনেক রকম কথা বলে। তার বাবা সমুদ্রে মাছ শিকার করতে গিয়ে আর ফিরে আসে না। শুধু তার বাবা নয়, তার সঙ্গে আরো বাইশজনের মত এই পাড়ার লোক ছিল। এমন ঘটনা এ পাড়ায় আকচার ঘটেই থাকে। তাই সারা পাড়া জুড়ে কয়েক মাস কান্নার বন্যা বয়ে যায়। তার পর ধীরে ধীরে অবস্থাটা থিতিয়ে আসে। এই সময়ের আগে থেকেই সুদর্শন তেওয়ারী শঙ্করীদের বাড়িতে যাতায়াত করতো। তাই পরান শাসমলের মৃত্যুর পর আড়ালে আবডালে অনেকে বলে, শঙ্করীকে নাকি সুদর্শন ঠাকুরের মত দেখতে। রাস্তাঘাটে তার ওপর নজর পড়ে জোয়ান ছেলেদের। ফষ্টি-নষ্টি শুরু করে দেয়। তাই কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে সে কাজ করতে যায়। ফেরার পথেও তাই করে।

আজ আসার পথে শঙ্করী রীতিমত খুশি হয় খবরটা শুনে। ক'দিন তার পিছু লেগেছিল যে আদাড়েগুলো তাদের অধিকাংশই গ্রেপ্তার হয়েছে। একসময় বলে ফেলে সে, এবার -এবার কি করে পিছু নাগ্ বি রে আবাগীর ব্যাটারা? চুরি করবি, ডাকাতি করবি, ফল পাবিনি?

তার কথা শুনে ক্ষেপে যায় গোঁসাই। সকাল থেকেই তার মেজাজটা রীতিমত তিরিক্ষি হয়ে আছে। তার জোয়ান ব্যাটাটাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার ওপর এ ছুঁড়ি ফট্‌ফটিয়ে বলে কি? গোঁসাই বুক চাপড়ে বলে, এ্যাই—এ্যাই—কি বলচিস। জিব টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌বো। টুঁটি টিপে শেষ করে দুবো।

বল কি! ব্যাটা চোর!

খবরদার চোর বলবিনি—

কেন? চোরকে সাধু বলতে হবে নাকি?

তুই কি? বাপের ঠিক আছে তোর?

নিশ্চয়। যে জন্ম দিয়েচে, সে আমার বাবা। তোমার জন্ম কে দিয়েচে তুমি জান?

এ পাড়ায় এই বিষয় নিয়ে তর্ক করা যায় না। ক্যারকেরি-জ্যাঠাই ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে এসে যায়। রসিয়ে রসিয়ে বলে, কেন কেঁচো খুঁড়তেচো গোঁসাই ঠাকুর পো, কেউটের ফণা বেরিয়ে পড়বে। সাতসকালে গিলেচো তো এককাঁড়ি। টাল সামলাতে পারচোনি। মানে মানে ঘরে যাও।

বাঁশ ঝুলে-পড়া, ছায়ামাখা, খালের স্রোতে হাঁড়ি ভাসিয়ে মাছ ধরছিল একপাল মেয়ে। ঘাড়ে ছাকনি জাল আর কাঁকে হাঁড়ি নিয়ে তারা উঠে আসে। পাড়ার বৌঝিরা ভিড় করে দাঁড়ায়। মজার একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যেন। মনসার ভাসান কিংবা শীতলার গান হলেও এমন মনোযোগ সহকারে পরিবেশ সৃষ্টি করে না কেউ।

॥ ১৮ ॥

গাবতলার পাশে বিস্তৃত মাঠ। জমিদার বাবুদের খাস জমি এটা। এর ওপর সারি সারি বাঁশের মাচায় ইলশে-জাল শুকনো হচ্ছে। গাবের কষে জালগুলো খড়মড়ে আর কৃষ্ণবর্ণ। ছিদাম এর পাশ দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত পদে বাড়ির দিকে যায়।

বকুল বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। ছিদামকে দেখতে পেয়ে বলে, চার-পাঁচবার এলো এখিনে। তুমি বাবু তাড়াতাড়ি চলে যাও।

তেল গামছা বাইরেই এনেছিল সে। ছিদামের হাতে তুলে দেয়।

ছিদাম হাতে একটু তেল নিয়ে চারপাশে খেলকদম-গাছে-ঘেরা ছোট্ট ডোবাটার দিকে যায়। বকুল দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে।

নাকেমুখে ভাত গোঁজার সময় ছিদাম বলে, তুই একটু দেখিস। আমি ছোট গাঙ পারের দিকে যাবো। আজ একটা ভাড়া ধরেছিনু, কিছু পেইচি। ওটা তোকে দিয়ে যাচ্ছি।

তুমি বলেছিলে না, মারি তো গণ্ডার—। গণ্ডার মারলে। কিন্তু তার ফল— ?

তুই আর বলিস নি বকুল। পাগল হয়ে যাবো। একটার পর একটা মামলা হচ্চে আর জড়িয়ে পড়তিচি। চক্কোত্তি খালি বলে, নতুন করে মাল আনো, তবে তো কোটের খরচপত্র যোগাবো। না হলে পচতে হবে। আমি কি করবো বলো—

এমনি কথার ছিরি—

হাঁ।

ওর মুখে নাথি মেরে, ই-পথ ছেড়ে দাও না। গতর খাটিয়ে খাও না।

ফাঁদে ধরা পড়ে গেছি রে —হারামিদের খপ্পরে চলে গেছি।

এখন পথ ?

দেখি কোথা কি কত্তে পারি।

ক্যারকেরে-জ্যাঠাই মুখ খারাপ করে গালিগালাজ শুরু করে : এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সংকেত। ছিদাম বকুল তা ভাল বোঝে। তাই আর বসা হয় না ছিদামের। উঠে পড়ে।

এগিয়ে আসে ক্যারকেরে-জ্যাঠাই। গলায় তার ঝাঁঝালো সুর। 'দেশটাকে ছারখার করে দিলে মুখপোড়ারা'।

কদম তার ঘরের কানাচে এসে এসব দেখে। পাথরের মূর্তির মত শুধু দেখতে থাকে।

ক্যারকেরে-জ্যাঠাই সকালে একদিন বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। কদম দাবায় ন্যাতা দিচ্ছিল তখন। জ্যাঠাই ডাকে, বৌ—

মুখ তুলে তাকায় কদম। তার দু'চোখে তখনও স্পষ্ট জলের ছাপ।

কাঁদছিস? কেঁদে আর কি হবে বল? আমাদের জীবনটাই হয়েচে এমনি। এই আছে, এই নেই। অতগুনো মানুষ আনন্দ করতে করতে সাগরে গেল মাছ ধরতে। কে জানত বল আর ফিরে আসবেনে। ফি বছর দলে দলে জোয়ান মানুষগুনো যাচ্চে আর ফিরে আসচে নে। আর তাড়ি-মদ খেয়ে মারদাঙ্গা করে কিছু মরবেই। কি করবি বল?

কদমের চোখ দিয়ে আরো জল ঝরে পড়ে। জ্যাঠাই আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেয়। বলে, মুচেটা নাকি রাতের অন্ধকারে—

কদম বলে, তাড়াতাড়ি হাতটা ধুয়ে আসি। তুমি একটু বোস।

জ্যাঠাই তাকিয়ে থাকে কদমের চলার পথের দিকে। পাড়ার লোকের সন্দেহ মুচে রাত্রিতে কদমের ঘরেই থাকে। কে জানে বাবা, দুনিয়ার রথের চাকা কোন্ দিকে ঘুরছে?

কদম উঠোনে চাটাই পাতে। জ্যাঠাইকে বসতে দেয়। জ্যাঠাই বলে, জমিদারের নোকেরা তোকে এখনো সাহায্য দিয়ে যাচ্ছে?

হাঁ।

আর ওসব নেওয়া কি ঠিক হবে? কুন্‌দিন জমিদারের কুন নন্দী-ভৃঙ্গী ঘাড়ে এসে ভর করে বসবে তার তো ঠিক ঠিকানা নেই। ওদের জ্ঞানগম্যি বলে কিছু আছে মা?

কদম বলে, আমারো তাই মনে হয়। কিন্তু এখন কি করবো জ্যাঠাই?

আমি বলি কি শ্যামগঞ্জের বাজার বসচে রোজ, ওখিনে মাছ

নিয়ে বোস। সবার চোখের সামনে থাকবি। আরো অনেকে তো আছে। তাদের সঙ্গে দিব্যি থাকবি।

কথাটা কদমের খুবই মনঃপূত হয়। তার চোখেমুখে সেই ধরনের ছাপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জ্যাঠাইকে ব্যগ্রভাবে বলে সে, একটা ব্যবস্থা করে দাও তুমি। আমি কাল থেকেই লেগে যাবো।

ঠিক আছে। আমি সব জেলেদের বলে তুবো মাছ দিতে। বিক্রি করে দাম দিয়ে দিবি তুই। যেটুকু লাভ থাকবে তাতেই একজনের ভালভাবে চলে যাবে।

শ্যামগঞ্জের বাজারে বসে একটা নতুন জগৎ দেখে কদম। প্রথমে একটু আড়ষ্টভাব থাকলেও ধীরে ধীরে তা কেটে যায়। এখন সবার সঙ্গেই সম্পর্ক পাতিয়ে কথা বলে। জেনে নেয় ভেতরকার দুঃখ-জ্বালা।

মাছের ঝুড়ি সামনে নিয়ে সে দেখে জোড়া চিমনী ইষ্টিমার আসছে। ইষ্টিশানে থামে ইষ্টিমার। নেমে আসে মিলের বাবু-সাহেবরা। নেমে আসে থানার দারোগাবাবুরা। এরা একজোট হয়ে হৈ-হট্টগোল করে কথাবার্তা বলে। সাধারণ মানুষ দূরে সরে যায়। ছোঁয়াচ বাঁচায়। এদের দল চলে যাবার পর এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে ফিরে আসে কিছু মানুষ। বীরত্ব দেখায়। লম্বা লম্বা কথা বলে কদম মাছের মাছি তাড়ায় আর মুখ টিপে টিপে হাসে।

আনাজপাতির-বাজরা-মাথায়-ঘামে-নাওয়া-চাষীরা মাথার বিড়ে খুলে সারা শরীরের ঘাম মোছে। আফশোষ করে বলে, আর চাষবাস করে হবেনে বাবু। ছেলেটাকে মিলে লাগাতে হবে।

চাষীর বাড়ির ছেলে মিলে লাগ্‌বে কেন মেসো?

আর মা, এতে পেট চল্‌বে নে। ক'দিন ক'পয়সা রোজগার হবে এতে? মিল-কারখানায় হাজা-শুকো নেই। বারোমাস পয়সা।

জমির লোভে যারা একদিন নদীর ধারে এসেছিল আজ তারা জমি

ছেড়ে দলে দলে মিল-গেটের সামনে এসে দাঁড়ায়। সুবিধা পেলেই মজুরের খাতায় নাম লেখায়।

কদম হেসে লুটোপুটি খায় আরজ আলীর কথা শুনে। তার ছেলেটা নাবালক কিন্তু বলে কয়ে মিলে ঢুকিয়েছে আরজ আলী। বিপদের সম্ভবনা দেখে আরজ একটা বপিন-বওয়া ঝোড়া ঢাকা দিয়ে দেয় ছেলেটাকে। এমনি ভাবে মজুরের কাজ করে তারা। মিলের মাল তৈরি করে।

চড়ারায়নগরের মৎস্যজীবী ঘরের ছেলেরাও আজ দলে দলে মিলের ভেতর হাজিরা দিচ্ছে। বলে, কে তোমার ইলিশ আর শুটকির মরশুমের জন্যে হাঁ করে বসে থাকবে বাবা। হাতে নগত টাকা চাই। জামা-কাপড় চাই। দুনিয়ার রং পাল্টেচে। তারা লেংটি পরে থাকবে কেন?

কদম হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিশাল চিমনীটার দিকে। দিনরাত ধোঁয়া উড়ছে। দিনরাত মানুষ কাজ করছে ইঁটের-পাঁচিল-ঘেরা বিরাট চত্বরটার মধ্যে। চট তৈরি করতে এত লোক লাগে? এত মানুষ দিনরাত খাটে?

বাজারে গোষ্ঠ মান্না এসে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। বলে, শালা আমার বেলায় কাজ নেই আর যারা সর্দারদের ঘুষ দিতে পারে, ইনচার্জ বাবুদের বাড়িতে সকাল বিকেল হাজিরে দেয় তাদের তো বেশ কাজ হচ্ছে।

বদলীআলাদের নিয়ে বিরাট সমস্যা। মিলের আশপাশের অধিকাংশ যুবক এসে ঢুকেছে। বদলী শ্রমিক হিসাবে খাতায় নাম লিখিয়েছে। তাই মালিকের বেজায় ডাঁট। শ্রমিকদের নাকের ডগায় ট্যাঁক ট্যাঁক করে শুনিয়ে দেয়, কাজ করতে না পারো সরে পড়ো। কাজের লোকের অভাব নেই।

সোনার সুতো তৈরির এমন সুন্দর আবহাওয়া মেলা ভার।

চড়ারায়নগরের প্রশস্ত খালখানা ভাগীরথীর স্রোতের সঙ্গে

মিশেছে। পাশে পড়ে আছে সুবিস্তৃত এক চরভূমি। সবুজ দূর্বা-ঘাসে ঢাকা। রাজ্যের গরু-বাছুর, ছাগল-মোষ, গাধা-ঘোড়া চরে বেড়ায় এখানে সারাদিন। নদীর বাঁধে খিরিশ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের সারি। মাঝে কটা জাঁদরেল বটগাছ দাঁড়িয়ে আছে অজস্র ডালপালা নিয়ে। অশ্বত্থ আর নিমগাছও আছে দু'চারটে। সব মিলে নদীর ধারে ছোটখাট একটা অরণ্য যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের খর তাপ-প্রবাহে পৃথিবী যখন প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায় তখন এই ছোট্ট অরণ্যের ছায়ায় জনজীবন কর্মমুখর দেখা যায়। পশুপাখিরাও আরামে কোলাহল করে।

দূর্বাঘাস ভরা চত্বরে গুচ্ছেরখানেক নৌকো ভাঙা-আধভাঙা অবস্থায় পড়ে থাকে। কোনটা উপুড় অবস্থায়, কোনটা চিৎ হয়ে। মিস্ত্রি কাঠ সাইজ করে কোনটার ওপর গুল পেরেক সেঁটে যায় ঠক্ ঠক্ আওয়াজে। কোনটার ওপর চলে আলকাতরার প্রলেপ।

বাঁশের খুঁটির ওপর বাঁখারির ঢাকনা দিয়ে মজবুত মাচা আছে অনেকগুলো। এই মাচাগুলোয় অবসর সময়ে বসে থাকে মৎস্য শিকারীর দল। নানা ধরনের গল্পগুজব করে। খোলা হাওয়ায় 'দিল খোলা' হয়ে কথাবার্তা বলে।

নান্নু মোড়ল বলে, এ হলো গে আমাদের জমিদারী। এখিনে এসে কারো 'ঘুরুক ঘারুক' করার উপায়টি নেই। জলে যেমন আমাদের হক্ কায়েম করে দিয়ে গেছেন রাসমণি মা।—নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে সে প্রণাম জানায়।

পাশে হুঁকোর ওপর ঠোঁট দিয়ে চপাশ চপাশ শব্দ করতে করতে তামাক টান ছিল রাসবিহারী। নান্নুর কথা শুনে দু'চোখের তারা নাচিয়ে বলে, বেড়ে কথা বললে হে মোড়লের পো। এ আমাদের রাজ্যি। এ আমাদের জমিদারী। কিন্তু তা শুধু নামে। আসল জমিদারী চালাচ্ছে কিস্তন ফ্যাচাং ঠাকুর। ওপর ওপর আমরা কাজ করচি। মাছ মারচি। নৌকো নিয়ে বার দরিয়ায় চলে যাচ্ছি।

কিন্তুন ফ্যাচাং ঠাকুর সব জায়গাতেই কেমন করে ফ্যাচাং তৈরি কচ্চেচে দেকোদিনি—

হুঁ। ছোট্ট একটা উত্তর দিয়ে দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে থাকে নাসু।

রাসবিহারী বলে, শালা বামুন বাঁচবে অনেকদিন। নাম করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাতা মাথায় দিয়ে এসে হাজির।

ফ্যাচাং ঠাকুরের আসল নামটা কি তা আজকাল কেউ জানতে চায় না। তবে রেজিষ্ট্রী অফিসে কখনো যদি তিনি উপস্থিত হন তবে গোটা গোটা হয়ফে লেখেন হরিন্ময় ঘোষাল। সে সময় দু'একজন রসিকতা করে বলে, পাশে লেখো ফ্যাচাং ঠাকুর। না হলে ধরা যাবে না আসল মালটাকে।

ফ্যাচাং ঠাকুর হাসে। এ হাসি মুখের ওপরকার সাময়িক রং বদল ছাড়া আর কিছু নয়। যেমন রং বদল করে গিরগিটি, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে।

ফ্যাচাং ঠাকুর এসে ঝপাস করে বসে পড়ে রাসবিহারীর পাশে। বলে, দাও হে, কলকেটা একটু দাও।

রাসবিহারী কলকেটা সযত্নে তুলে দেয় ফ্যাচাং ঠাকুরের হাতে। দু'হাতে কলকেটা ধরে কয়েকটান দিয়ে মুখ-বোঝাই ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে ফ্যাচাং, চলো হে আমার সঙ্গে। একটু বজবজে যেতে হবে।

কেন?

একটা সনাক্ত করতে হবে।

কার মাথায় হাত বুলালে ঠাকুর?

একে হাত বুলানো বলিস রাসবিহারী? বেচারা নৌকোর অভাবে শুকোয় যেতে পাচ্চেনে। আমি নৌকোর ব্যবস্থা করে দিচ্চি। স্বয়ং গিয়ে নৌকো কিনে দোবো। যে মাপের নৌকো দরকার একেবারে সেই মাপের। এতোগুলো টাকা ছেড়ে দোবো একটা বাঁধন ছাড়া

তো দিতে পারিনি। তাই বাস্তুটা—

রাসবিহারী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। বলে, কার বাস্তু ঠাকুর?

তোর ভাই ফুটবিহারীর। তাই তোকে দিয়ে একটা সনাক্ত···

ঠাকুর—

কি বলচিস? বল—

শেষ পর্যন্ত আমার বাস্তুর মধ্যেও ঢুকলে?

এ আর আমার কেরামতি কোথা দেখলি তুই? ভগবানের ইচ্ছা·

নান্নু এবার একটু এগিয়ে আসে। ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, আমার টাকা তো শেষ হয়ে গেছে। সুদ সামান্য বাকি। তুমি বলেছিলে আসল শেষ হলেই লিখে দেবে। কিন্তু—

ও জমিটা তো আমার নামে ছিল না। ছিল খোকার মায়ের নামে। উনি এখন অসুস্থ। তাই রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দু'চার মাসের মধ্যে কিছু করতে পারবে না ভাই। একটু দেরি·করো।

একখানা দু'খানা করে নৌকো এসে ঘাটে 'ভিতে' হচ্ছে। মেয়েদের ঝাঁকায় মাছ উঠিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে আসছে সবাই। মাচার কাছাকাছি এসে সবাই জোড়হাত করে প্রণাম জানাচ্ছে। মুখে বলছে অনেকে, প্রণাম হইগো ঠাকুর মশায়।

প্রণাম হই।

ফ্যাচাং ঠাকুর সহাস্যে জবাব দেয়, মঙ্গল হোক বাবা—মঙ্গল হোক—

খাল দিয়ে লগি ঠেলতে ঠেলতে একটা নৌকো আসতে দেখা যায়। নৌকোর ওপর রাসবিহারীর ছেলে বনমালী। নান্নু বলে, রেসো—তোর ব্যাটা বনমালী নয়—

জবাবটা দেয় ফ্যাচাং ঠাকুর। বলে, আমিই—ওকে নৌকো আনতে বললুম। এই জোয়ারেই যাবো কিনা। রাসবিহারী ঘাড়

না যায় তবে ওর ছেলে বনমালীকে দিয়েই সনাক্ত করবো। কথা শেষে একবার আড়চোখে তাকায় ফ্যাচাং ঠাকুর।

রাসবিহারী দু'চোখ তুলে বেশ সহজ সুরেই বলে, আট-ঘাট বেঁধে নাইয়ে-খাইয়ে ওদের নৌকোয় তুলছো যখন ওদের নিয়েই কাজ সেরে নাও ঠাকুর--অধমকে আর শাস্তি দাও কেন?

চান খাওয়ার ব্যাপার সেটা তোমারও হবে। হোটেল আছে না ওখানে। সব ব্যবস্থা আছে। তুমি উঠে পড়। ফ্যাচাং ঠাকুর রাসবিহারীর হাত ধরে টেনে মাচা থেকে নামায়।

নামু হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। লোকটা যাদু জানে বোধহয়।

পরচাখানা বেশ ভাল করে দেখে নেয় ফ্যাচাং ঠাকুর। খাজনার দাখিলাগুলোও। রাসবিহারী আর নুটবিহারী ষোলআনা জমির মালিক। তাই কৌশল করে সে দু'জনকেই রেজিষ্ট্রী অফিসে দাঁড় করাবে। ফেরার পথে রাসবিহারী বলে, শেষ পর্যন্ত আমাদের হাল পাঁচকড়ির মত করবেন তো ঠাকুর?

আরে না না। ওটা কি হয়েছে জান, তিনশো টাকায় সাফ কোবলা দলিল করলো পুরো বাস্তুর। বছর খানেক পরে শোধ দেওয়া দূরে থাক আবার বলে টাকা দাও। আমি দিতে নারাজ। পাঁচকড়ি হাতে পায়ে ধরাধরি শুরু করলো। শুধু আমার নয়, আমার স্ত্রীর, আমার মায়ের। শেষ পর্যন্ত মায়ের কথায় আরো দুশো টাকা দিলুম। সে টাকা যদি শেষ না হয় তাহলে ঘরের টিন খুলে আনবো না? ঘরের জিনিসপত্র আনবো না? না হলে আমার টাকা শোধ হবে কি করে? আমার টাকা শোধ না করলে ও হারামজাদা যে ঋণ পাপে ডুবে থাকবে।

সকাল তখন পুরোপুরি হয় না। ফ্যাচাং ঠাকুর এসে মাচায় বসে। জেলে নৌকোগুলো মোচার খোলের মত নদীর জলে দুলে দুলে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রচণ্ড টান দিয়ে বিড়ির আগুন সুতোর

গোড়া পর্যন্ত টেনে এনে এদিকে ওদিকে একবার তাকায়। মাছ নেবার জন্যে মেয়েগুলো ঝুড়ি-ঝাঁকা নিয়ে এগিয়ে আসছে। এদের দু'একজনের সঙ্গে রসিকতা শুরু করে দেয় সে। বলে, ও রাধি মাসি—রাধি মাসি - কাল মেশো বাড়ি গেল কখন ?

মুখপোড়া ফ্যাচাং ঠাকুরের ট্যাংকে টাকা থাকলে, আমার মদ্দ কি আর আমার থাকে র‍্যা পোড়ার মুখো।

সত্যি মাসি, তুই বিশ্বাস কর—আমায় বল্লে, চাল কিনবো, ডাল কিনবো, না হলে বৌ ঝাঁটা মারবে। টাকা দাও।

আমি দিনু। সঙ্গে গেনু। তার পয়সায় দু'গেলাস খেনু।

ছি—ছি—ছি—

সারা দুনিয়াটা জানে। ছি ছি করলে কি হবে।

মেয়েগুলো ঘৃণা ছড়াতে ছড়াতে নদীর চরে নেমে যায়।

ফ্যাচাং ঠাকুর বলে, শালারা আমার দেশ উদ্ধার করেছে। ছোট জাতদের মুখে চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি। যাদের সাতচড়ে মুখে রা ছিল না তারা আজ তুলকালাম করে ছাড়ছে।

গঙ্গাধর আসছে। ধীরে ধীরে ওকে শ'তিনেকের মত গছান গেছে। এবার রাশটা টানতে হবে। ইতিমধ্যে গঙ্গাধর কাছে এসে যায়। ফ্যাচাং বলে, কি হে গঙ্গা, এবার একটু দেখা করলে হয় না। অনেকগুলো টাকা হয়ে গেল যে।

হাঁ। আপনি মাঝে মাঝে দিলেন বলে আমার দায়-বিপদগুলো কেটে গেল।

এবার আমার দায়-বিপদ কাটাও।

আপনার দায়-বিপদ ?

হাঁ। আমার শিরে সংক্রান্তি। মেয়েটার বিয়ের কথা হচ্ছে। আর তো ফেলে রাখতে পারবো না বাবা।

কিন্তু আমার যে এখন খুবই অসুবিধা ঠাকুর মশাই।

আমারও যে ঠিক একই অবস্থা বাছাধন।

তাহলে – ?

তাহলে আর কি, জমিজমা খানিকটা লিখে দাও। যদি সেটা কাউকে ধরাতে পারি।

এ্যাঁ!

আকাশ থেকে পড়লে যে বাছাধন। নেবার সময় তো এমন এ্যাঁ করে ওঠো নি।

ইতিমধ্যে জামসেদপুর থেকে শুট্‌কি মাছের বড় ব্যবসায়ী এসে উপস্থিত হয়। ঠাকুর মশায়, নমস্তে—বলে মাচার একপাশে তিনি বসে পড়েন।

নমস্তে লালাজী—বলে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গীতে হাসে ফ্যাচাং ঠাকুর। পরে গঙ্গাধরের দিকে তাকিয়ে বলে, যা গঙ্গাধর, শঙ্করের দোকান থেকে চা নিয়ে আয়। পরের ভাবনা পরে হবে। এখনকার কাজ, এখন কর।

গঙ্গাধর চলে যাবার পর লালাজী বলেন, আপনার এতবড় কারবার। আপনি এই মাচায়—। একটা গদি করবেন না—

গদিতে উঠলে এ কারবার ডকে উঠবে লালাজী। এই কারবার করতে হলে গলায় গামছা দিয়ে ধরতে হবে। ঝাঁকা ধরে টানাটানি করতে হবে। নোঙর তুলে নৌকো ভাসিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আবার গায়ে মাথায় হাত বোলাতে হবে। পকেট থেকে বিড়ি নিয়ে মুখে ধরিয়ে দিতে হবে। মান ভাঙাতে হবে। গাঙে সমুদ্দুরে ওরা মাছের ঝাঁকের ওপর জাল ফেলবে। আমায় জাল ফেলতে হবে ওদের চাকে। ধীরে ধীরে। খুব সন্তর্পণে।

চা এসে যায়।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে ফ্যাচাং ঠাকুর বলে, আমার দাদন দেওয়া আড়াইশো নৌকোর মাছ আসবে। মাছ আগামী সপ্তাহে এসে গেলেই উলুবেড়ে থেকে ওয়াগন বোঝাই করে দোবো। আজ টাকা দিয়ে যান।

হুঁ। তাতো দোবোই।

এতক্ষণে ছোটখাট মেলার মত হয়ে গেছে মাচার আশপাশের জায়গাটা। লালাজী এসেছে। শুকোর নৌকো ভিড়বে কয়েকদিন পর। যদি কিছু পাওয়া যায় আজ তাই মাচার ধারে এসে পা ঘষে দাদন নেওয়া বাড়ির মেয়েপুরুষ।

॥ ১৯ ॥

মাঘের প্রথম দিকেই এমন ধরনের প্রকৃতির বিপর্যয় বড় একটা দেখা যায় না। হাড় কাঁপানো শীতের সময় বৃষ্টি আর ঝড় চড়ারায় নগরের পাড়ার পর পাড়াকে শ্মশানের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। বৃদ্ধ শিশু আর অসুস্থ অবস্থায় যারা ধুঁকছিল প্রকৃতির এই নিষ্ঠুর অত্যাচারে সবাই শেষ হয়ে যায়। যারা বেঁচে থাকে তাদের জীবনে একটার পর একটা ধাক্কা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত আছড়ে পড়ে।

কয়েকদিনের পর সূর্যের আলো আসার সঙ্গে সঙ্গে নারীপুরুষ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে যেন সূর্য বন্দনায়। সূর্য আলো দেয়। জীবন দেয়। প্রাণ ভরে সেই উত্তাপ গ্রহণ করে সবাই। সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে সবার কাতর ক্রন্দন যেন ছড়িয়ে পড়ে। 'যেও না—যেও না তুমি!'

ভাঙা ঘর সারতে হবে। যে ঘরের ভিত পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে তার জন্যে করতে হবে নতুন চিন্তা। আপাতত যেমন করে হোক মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরি করতে হবে। জমা জলের পথ তৈরি করার একটা ব্যবস্থা চাই। এছাড়া চাই একমুঠো খাবার আর বাঁচার অন্যান্য সামগ্রী।

এই সমস্ত চিন্তায় যখন মানুষের মগজ রীতিমত আচ্ছন্ন, ঠিক তখন ফ্যাচাং ঠাকুর এপাড়া ওপাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সাহায্যের ঝাঁপি

খুলে দয়ার প্রতিমূর্তির মত। এমন সময় সংবাদ আসে চড়ারায়নগর থেকে যে চল্লিশখানা নৌকো 'শেলে মাছ' ধরতে গিয়েছিল সাগরদ্বীপ থেকে তিনচার ভাঁটা নিচে তারা সবাই মরেছে। প্রায় আড়াইশোর মত জোয়ান এই নৌকোয় গিয়েছিল মাছ ধরতে। গত ঝড়-বৃষ্টিতে তাদের সলিল সমাধি ঘটেছে। চড়ারায়নগর থেকে আর একপ্রস্থ সমবেত কান্নার সুর ভেসে ওঠে। ফ্যাচাং ঠাকুরও কিছুটা ফ্যাচাঙে পড়ে। মাথায় হাত দেয়। অনেক টাকা দেওয়া ছিল নৌকো-গুলোতে। এই নৌকোর ব্যবসায়ীরা সবাই মোটামুটি শাঁসে-জলে। তাই এদের ক্ষেত্রে কোন কাগজ করা ছিল না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অল্প লোকই নৌকোয় গিয়েছিল। বাকিরা বাড়িতেই আছে। সাগরে গিয়েছিল তারা যারা চিরকাল মাছ-ধরা নৌকোয় মজুরী খাটে। মৎস্যজীবী পল্লীতে এদের সংখ্যাই তো পঁচানব্বই ভাগ।

ফ্যাচাং ঠাকুর ব্যবসায়ীদের কাছে দুঃসংবাদ বিষয়ক খবরাখবর নিয়ে তার কাছ থেকে নেওয়া কর্জের টাকার কথা ওঠালেই তারা সমস্বরে চিৎকার করে ওঠে, আপনি মানুষ না কি? অনেকদিন তো অনেক টাকা নিয়েছেন আমাদের থিকে। এতগুনো নোকের জীবন চলে গেল, জিনিসপত্তর নৌকো চলে গেল, তাতে আপনার দুঃখ নেই? নিজের ক'টা টাকার কথা ভাবছেন?

ক'টা টাকা?

ক'টা ছাড়া আর কি? আপনিই তো গল্প করেছেন আমাদের কাছে, পাঁচটাকা খাটিয়ে বৃদ্ধি ফিকির করে আজ আপনার এই অবস্থা। সেই আসল পাঁচটাকা আপনার তো ঠিক আছে। তাহলে গেল কি?

নেহাৎ কাগজ-পত্র নেই। ভাব-ভালবাসায় ছিল। নাহলে এই কথা কি শুনতুম?

ফ্যাচাং ঠাকুর তার দীর্ঘকাল কারবারের জীবনে এই প্রথম এই ধরনের কথাবার্তা শুনল। আগের দিনে সামনে কেউ টুঁ-শব্দটি করতে

পারত না। আজ ভাবে। কালে কালে হল কি? আরো কত কি হবে কে জানে?

সন্ধ্যা নেমে আসে। আজকের মত বিমর্ষ সন্ধ্যা তার জীবনে খুব কমই এসেছে। সন্ধ্যার ফিকে অন্ধকার যেন গুমরে গুমরে কাঁদছে। নদীর ছলাৎ ছলাৎ শব্দ এর সঙ্গে মিশে দুঃখের মাত্রাটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই বসতে ইচ্ছা হয় না এখানে। কিন্তু এ জায়গা তাকে আষ্টে-পিষ্টে বেঁধে রেখেছে যেন। একে ছেড়ে ওঠার উপায় নেই। সিধু মোড়লের কাৎ হওয়া নৌকোর ওপর পা ছড়িয়ে বসেছিল সে। এমন সময় সে অনুভব করে তার পিঠে কে হাত বোলাচ্ছে। পিছন ফিরে দেখে তপস্বী খামারু। সারা মুখে অল্প অল্প দাড়ি। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা। গায়ে গেরুয়া ফতুয়া। একটুক্রো কাপড় দোপাট করে পরা।

ফ্যাচাং বলে, কি ব্যাপার? তপস্বী মহারাজ, কি মনে করে?

কাজ আছে। খুবই মহৎ কর্ম। তাই জমিদারবাবু তোমার সাহায্য নিতেই পাঠালেন।

আমার সাহায্য নিতে?

হাঁ। হাসে তপস্বী।

চলো আমার সঙ্গে রাজবাড়িতে। সেখানেই কাজকর্মের হিসেব নিকেশ হবে।

মানসিক যে অবস্থা রীতিমত ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল অন্তত-পক্ষে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে আর কোন প্রতিবাদ করে না ফ্যাচাং ঠাকুর। উঠে দাঁড়ায়। এক সময় তপস্বীর পিছু পিছু হাঁটতে থাকে সে।

জমিদার যুগোলকিশোরবাবুকে রীতিমত ভাল লাগে ফ্যাচাং ঠাকুরের। কারণ তার মতে তিনি 'কলির পাঠ' ঠিক মত পড়তে জানেন। চাষীর ছেলে জুতো পরে পরীক্ষা দিতে যাবে। তার আগে জুতোটা মড়গড় করছে। গুন গুন করে গান গেয়ে। তার

জবাব তিনি যা দিয়েছিলেন তা খুব ভাল লেগেছিল ফ্যাচাং ঠাকুরের। শান্তির কথাটা শুনে দু'হাত তুলে নৃত্য করেছিল সে নদীর চত্বরে। আজ তারই সঙ্গে কথা হবে। মনের মত মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা। খুবই জুতসই হবে নিশ্চয়।

কথাবর্তা খুব লাগসই ধরনেরই হয়। যুগোলকিশোরবাবু বলেন, ঠাকুর মশাই, লোকে আপনার একটা বিশেষ ধরনের নামকরণ করেছে।

হাঁ। মুচকি হাসে ফ্যাচাং ঠাকুর।

গোলাপকে যে নামেই ডাকা যাক না কেন আসলে তা গোলাপ।

ফ্যাচাং ঠাকুরের হাসি কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়ে যায়। কারণ কেউ যদি তোয়াজ করে বিনা পয়সায় তাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেয়, সে ব্যাপারে সে খুব হুঁশিয়ার ছেলে।

পরে অবশ্য তার থমকে-যাওয়া-হাসি আবার বেরিয়ে আসে। যুগোলকিশোরবাবু বলেন, আমি জাতে কায়েত, বামুনকে দিয়ে কাজ করিয়ে তার দক্ষিণা দোবো না তা যেন ভাববেন না। বরং আগে ভাগেই সব মিটিয়ে দোবো।

ভরসা পেয়ে ফ্যাচাং ঠাকুর বলে, কাজটা কি বলুন। যদি অধমের পক্ষে সম্ভব হয় নিশ্চয় করব।

নিশ্চয় তুমি পারবে।

পরামর্শ করার কামরাটায় গিয়ে দু'জনের কথাবার্তা চলে। তপস্বী খামারু গোমস্তাবাবুর কাছে নিজের হিসাবের পয়সা বুঝে নেয়।

দু'দিন পরে দেখা যায় জমিদারের লোকজন এসে দাঁড়ায় কদমের উঠোনে। চড়ারায়নগরের কিছু মুরুব্বি মাতব্বর তাদের সঙ্গে এসে দাঁড়ায়। সবার মুখে এককথা, মুচে এখানে এসে রাত্রিবাস করে— তোমার ধরন-ধারন ভাল নয়।

কদম বীরদর্পে সবার সামনে এসে দাঁড়ায়। বলে, আমায় কি কত্তে হবে?

বাস্তু ত্যাগ করতে হবে।

আমি প্রস্তুত হয়েই আছি। অনেক আগে থেকেই আমি জানতুম নড়বড়ে ভিতের ওপর আমার ঘরখানা দাঁড়িয়ে আছে। যেকোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। ঘরে ক'টা জিনিস আছে। নিয়ে আসি।

মাগীর তেজ দেখো।

হ্যাঁ, জাঁহাবাজ মাগী।

প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই এভাবে নাটকের যবনিকা পতন হবে অনেকেই তা আশা করতে পারে নি। তারা রীতিমত নিরাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

॥ ২০ ॥

কদম নদীর বাঁধ ধরে হেঁটে চলে। জেটির কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্রেন ঘুরছে ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে। ট্রলি থেকে চটের গাঁট নামছে গাধাবোটে। ক্রেনের মাথায় পেল্লাই পেল্লাই গাঁটগুলোকে খামচে চাগিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। কর্মব্যস্ত লোকজন পেশীর কসরৎ দেখিয়ে বোটের-পাটাতনে-নামা গাঁটগুলোকে একটু আধটু সরিয়ে নিচ্ছে। থরে থরে সাজানো হচ্ছে চটের গাঁট। যাবে কোন সুদূর বন্দরে। গাঁটের গায়ে তার ঠিকানা স্পষ্ট।

কদম তাকিয়ে থাকে নাবালক ছেলেগুলোর দিকে। যারা এই গাঁটের ট্রলিগুলো ঠেলে ঠেলে আনে। গরমে দরদর করে ঘাম ঝরে পড়ে তাদের সর্বশরীর দিয়ে। কদমের ছেলেপিলে নেই। মুহূর্তের মধ্যে তার মন কেমন যেন হয়ে যায়। একসময় মনে হয় যারা ঘাম ঝরিয়ে কাজ করছে সবাই তো তার ছেলে। কিন্তু এই নাবালকরা

এত কষ্ট সহ্য করবে কেন? কদমের ভেতরটা কেমন যেন টন্‌টন্‌ করতে থাকে। প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

মনে পড়ে তার নিজের কথা। তার ওপর যে অকথ্য অত্যাচার হত তার প্রতিবাদ করতে বুনো মোষের মত একমাত্র এসে উপস্থিত হয়েছিল মুচে। বাকি লোকগুলো মানুষ নাকি? আজ মুচে তাই তার জীবনে অনেক উঁচুতে স্থান করে নিয়েছে। এ নিয়ে প ড়ার অনেকে অনেক কথা বলে। কোন কথা গ্রাহ্য করে না কদম।

ইস্পাতের মত শক্ত মানুষটার জন্যে খাবার যোগাড় করে রাখত সে। মুচে কোন রাতে আসত, কোন রাতে আসত না। পুলিশ হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াত তাকে। মুচে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকত তার দাবার একপাশটিতে। ঘরে কোনদিন আসতে চাইত না। বলত, যদি ঘেরার মধ্যে আসে, ঝট্ করে কায়দা করে ফেলবে। বাইরে থাকলে একছুটে পগার পার। তুমি ঘরে ঘুমোও। আমি ঠিক আছি।

মাঝে একদিন জমিদারবাবুর লোক এসে ট্যাক ট্যাক করে দু'কথা বলার চেষ্টা করেছিল। কদম সাফ জানিয়ে দিয়েছিল তাদের, ঝুড়ি নিয়ে হাটের রাস্তায় যখন হাঁটতে শিখেছি তখন অত কথার ধার ধারি না। তাছাড়া রঙ্গা লাঠি ধরতে পারত তাই জমিদার বাবুদের সাহায্য নিত। আমার সাহায্য নেবার কোন হক্ আছে নাকি?

জমিদারবাবুর পাঠানো লোকদের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল কদমের কথা শুনে। তারা যাবার সময় বলেছিল, নাড়ার গোড়ায় রস না থাকলে কি আর এমনি বাকি-সাকি বেরিয়ে আসে? যাক্, সবকথাই হুজুরকে গিয়ে বলব।

এর পর হুজুর চরম ব্যবস্থা করে দেন।

কদম এগিয়ে যায়। জেটির উত্তর দিকে একদল মুটে-মজুর যন্ত্রের মত কাজ করে যাচ্ছে। বিরাট ভড়-নৌকো থেকে কয়লা

তুলছে তারা ট্রলির ওপর। কয়লা-কালি মেখে ভূতের মত চেহারা। কাউকে চেনা যায় না। ওদের মধ্যে নিজের ছেলে থাকলেও চেনা শক্ত। হাঁ করে ওদের কাজকর্মের দিকে তাকিয়ে থাকে কদম। নৌকো থেকে একটা কাঠের ওপর দিয়ে যেন নাচতে নাচতে ওরা উঠে আসে জেটির ওপর। তাদের পায়ের তলায় নদীর অশান্ত জলরাশি ফুঁসে ফুঁসে ওঠে। তোলপাড় করে।

ট্রলির হাঁ-করা গহ্বরে ঝুড়ির পর ঝুড়ি কয়লা ফেলে দৌড়ঝাঁপ-করা শ্রমিকের দল :

গিরাও—জল্‌দি গিরাও—এক—দো—তিন—বত্রিশ—চাল্লিশ—আউর নেহি। বন্ধ্ করো। সাব্বাস জোয়ান। দূরে দাঁড়িয়ে হেঁকে যায় আর নির্দেশ দেয় কনট্রাকটারের লোক।

ট্রলি ভরে যায়। কালো চেহারার নাবালক ছেলের দল কুটি ওড়াবার মত করে ট্রলি নিয়ে চলে যায়। চক্ষের নিমেষে।

ঘর ঘর শব্দ করতে করতে কয়লার ট্রলি এগিয়ে যায়।

কচিহাড়ের ছেলেগুলো গ্রাম থেকে এসে কাজে ভিড়ে গেছে : বারসেদ বলে, কাল সকাল থিকে কি জ্বররে ভাই। সারাদিন উঠতে পারিনি। সন্দে বেলা 'বাল্লিক' খেয়ে শুয়ে রইনু। সকাল থিকে টিকতে পারনু্নি। না খাট্‌লে বুড়ো বাবা মা তিন চারটে ভাইবোন শুকিয়ে মরবে যে। তাই এসে নেগে পড়নু। আগে একটু কষ্ট নাগছিল। ঘণ্টাখানেক কাজ করার পর ব্যাস্। এখন বেশ কাজ কচ্চি।

আহম্মদ বলে, ই শালা হয়েচে বেশ। কাজ কত্তিচি। মুয়ে খুন বার করে পয়সা নিয়ে যেচ্চি। মহাজনের প্যায়দা শালা অদ্দেক চুষে নিচ্চে সুদের জন্যে। তাহলে কি খাই বল? না খেলে কি করে কাজ করি। অসুখ হলে কোথা থিকে ওষুদ কিনি? ই শালা হয়েচে এক ব্যামো। খেটেও খেতে পারবুনি। বর্ষাকাল। মাথা গোঁজার ঠাঁই অব্দি নেই।

দুপুর ঘনিয়ে আসে। উর্বশী ভোঁ বাজিয়ে শ্যামগঞ্জের ঘাটে এসে থেমে যায়। মিলের প্রথম সিপ্টের লোকরা মিলগেট থেকে বেরিয়ে আসে। কয়লা-কালিমাখা ক্ষুদে মজুরের দল গরম পুকুরের ধারে বিরাট দুর্বাভরা চত্বরে এসে দাঁড়ায়। এখানে স্নানপর্ব সেরে কিছু খেয়ে নিতে হয়।

আহম্মদের মা অনেক আগে থেকে ডিসে করে ভাত নিয়ে বসে থাকে। অনেক মজুরের আত্মীয়েরা খাবার নিয়ে বসে আছে। ভাত বওয়া লোকেরা গ্রাম থেকে বোঝা বয়ে এনে গাছের তলায় বসে হাঁপায়। মাঠে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় গাধা-ঘোড়ার দল। একটু আগে পর্যন্ত চাবুক খেয়ে কাজ করেছে ওরা। এখন একটু জিরিয়ে নিচ্ছে মাঠে চরে। একটু পরে পিঠে আবার 'ছালা' পড়বে। চাবুকের শব্দ হবে, শপাং—

কাজ-ছাড়া মানুষের দল হৈ হৈ করে ছুটে আসে। হুমড়ি খেয়ে তেলের ছোট্ট শিশি তুলে নেয়। একফালি ছেঁড়া লুঙ্গি বা একটুকরো গামছা নিয়ে জলে নেমে যায়। জল থেকে উঠে এসে খাবার পত্র সামনে নিয়ে বসে পড়ে।

কদম ঘরছাড়া অবস্থায় তিনফটকের বস্তিতে এসে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে দুপুরটা এখানে কাটিয়ে যায়। মাছ-চিংড়ি বিক্রি হয়ে গেলে, মনটা ভারি হাল্কা হয়ে যায় তার। এ অবস্থায় এখানে এলে মনটা কেমন যেন ভরে ওঠে।

কদম খাবার সময় ছেলেগুলোর পাশে বসে থাকে। তার ভাব খাতির হয়ে গেছে আহম্মদের মা জরিনা বিবি আর হারেসের বোনের সঙ্গে। এদের প্রতিদিনই বলে কদম, ভাতের সঙ্গে একটু মাছ দিতে হবে এদের। নাহলে বাছারা এই অসুরের খাটুনি খাটবে কেমন করে? জরিনা বিবি বলে, ছেলেকে খাওয়াতে কার না সাধ যায় বুন কিন্তু খাওয়াবো কোথা থেকে? ইদিকে আনতে উদিকে ফুরিয়ে যায় যে।

শুয়োরগুলো একপাল বাচ্চা নিয়ে খালের ধার থেকে এগিয়ে এগিয়ে আসে। কাদামাখা নাদুসনুদুস বাচ্চাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে কদম। মাঝে মাঝে তার দৃষ্টি আশপাশের মানুষ-গুলোর দিকেও ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ক্ষুদে মজুরগুলোর কথাবার্তা ওঠাবসা তার মনের মধ্যে যেন একটার পর একটা ছবি এঁকে যায়।

আকাশে মন্থর সাদা মেঘগুলোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন সে উদাস হয়ে যায়। একটা খাঁ খাঁয়ে শূন্যতা তার মনের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করে সে।

ঝিমিয়ে পড়া বিকেলে ক্লান্ত শরীরখানা টানতে টানতে কদম নতুন আস্তানায় এসে হাজির হয়। এখানে জমজমাট মানুষজন। সবার সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যে তার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। তাকে সবাই ডাকে কদম মাসি বলে। কালানী আর পদ্ম তার জীবনের দীর্ঘশ্বাসভরা কাহিনী শোনার পর বলে, ঠিক করেছো মাসি। অন্যায় যারা করে তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই ভাল। তুমি আমাদের মাসি হয়ে থাকো।

কদম বলে, আমার আর অভাব কি মা, তোমাদের মত মেয়ে যার তার কি কুনু দুঃখ আছে।

সন্ধ্যায় আজকাল জমজমাট হয়ে যায় কালানীদের উঠোন। একরাশ মানুষ আসে। গরীব দুঃখীদের কথা হয়। নতুন চোখ খুলে যায় কদমের। 'এই পৃথিবীতে ভিখারীর মত চাইলে কিছু পাওয়া যায় না। পাওয়ার জন্যে চেষ্টা চালাতে হয়। শক্তি অর্জন করতে হয়।'

কথাগুলো ঠিক ঠিক বলেছিল নিত্যানন্দ। মানুষের মধ্যে থেকে ভিক্ষুকের ভাব কাটিয়ে লড়াই করার ভাব তৈরি করতে হবে। কিন্তু আমাদের জাতটাকে ভিখারি বানিয়ে ফেলেছে ইংরেজ। ইংরেজ চলে গেছে তবু এ ভাব কাটে না। কিন্তু এ ভাব কাটাতেই হবে।

নিত্যানন্দ পায়ে ঘুঙুর পরে মিলের গেটে নাচে। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গায়। লোকজন জমা হলে বলে, আগে মানুষ হিসেবে তৈরি করতে হবে নিজেকে। তারপর লড়াই। জান কবুল লড়াই লড়তে হবে। তাই তার জন্যে মাটি তৈরি করতে হবে মনে।

ব্যাণ্ডনহেড়িয়া গ্রামে গোপন সভা বসে। আজকাল পুলিশ খুঁজে বেড়ায় লালঝাণ্ডার লোকদের। মাঝে পার্টির অনেক লোককে জেলে পুরেছিল। এখনো অনেকের রাস্তায় বার হওয়া বন্ধ।

তবু আব্দুল মোমিন সারাক্ষণ বসে থাকে ছোট্ট ঘরখানায়। তার কাছে খবর পাওয়া যাবে কে কোথায় আছে। এলাকার মধ্যে চটকল আর তেলের ডিপোর শ্রমিকদের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় আবুল হোসেন, বামাচরণ সানি, সাদ ইমানি বেগ। বিহার থেকে আসা মাথুনী সিং এর মধ্যে হিন্দীভাষী শ্রমিকদের মধ্যে বেশ প্রভাব সৃষ্টি করে ফেলেছে। ওপারের পাঁচলার শিবু দাস ভাল কর্মী।

সুধীন পাল, বাসদেও প্রসাদ, অমূল্য সেন, মলয় বোস, সন্তোষ ঘোষ, অজয় দাশগুপ্ত, মহেশ দাশ ইত্যাদিরা ছড়িয়ে আছে সারা শিল্পাঞ্চলে। শ্রমিকদের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব তৈরি করার জন্যে।

সারা শিল্পাঞ্চলে শ্রমিকদের ওপর কুকুর-ছাগলের মত ব্যবহার করা হয়। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে মিল থেকে বার করে দেওয়া হয় যখন তখন। এছাড়া চড়-চাপড় মারার ঘটনা তো আকচার ঘটে যায়। মজবুত শ্রমিক আন্দোলন ছাড়া এর সমাধান হবে কি করে? সুধীন কথাগুলো ভালভাবে বোঝায়। মহাবীর পরমারা গভীর মনোনিবেশ সহকারে শোনে।

চারদিকে যেন বেড়া দিয়ে রেখেছে মিলের মালিকরা। লালঝাণ্ডার লোকরা যেন আশপাশে আসতে না পারে। বেড়া গলা তো দূরের কথা, কেউ ধারে কাছে যেন আসতে না পারে।

কিন্তু দিনে দিনে দেখা যায় সংখ্যা বাড়তে থাকে। মানুষ জানের

মায়া তুচ্ছ করে মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসার নিদর্শন সৃষ্টি করে শক্ত বাঁধনের মধ্যে থেকে, মানুষ বাঁধন ছেঁড়ার রাস্তা বার করার জন্যে এগিয়ে পড়ে।

পরমা নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। একদৃষ্টে তাকায় চিমনী দিয়ে ওঠা কালো ধোঁয়ার দিকে। অজস্র শ্রমিকের রক্ত পরিশ্রুত হয়ে চলে যাচ্ছে মালিকদের ধনভাণ্ডারে। হাজার হাজার শ্রমিকের দীর্ঘশ্বাস হতাশা আর দুঃখ কুণ্ডলী পাকিয়ে দিনরাত উড়ে যাচ্ছে গ্রামে-গ্রামে শহরে-গঞ্জে এমনি কত কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উড়ে যায়। কে তার হিসাব রাখে?

॥ ২১ ॥

উর্বশী আজ দেরি করে আসছে। ভেতরে লোকজন গিজগিজ করছে। ওদিকে কিছুক্ষণ মনটা চলে যায়। নদীর জল শুকনো চরে এসে আছড়ে পড়ে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে যায় জাহাজখানা। কয়েকখানা নৌকো এসে তীরে ভিড়ে যায়। কয়েকজন লোক মালপত্র নিয়ে উঠে আসে। এর ফাঁকে রক্তমাখা বিরাট রাক্ষুসে দাঁত-বের-করা কয়েকটি মূর্তি তার সামনে এসে হাজির হয়, শ্রীদাম চক্রবর্তী, দর্পণ রায় আর সাধুজী। রঙ বেরঙের পোষাক পরে এরা মানুষের মাঝখানে দিব্যি চলাফেরা করে। আপন কাজ গুছিয়ে যায়। অসংখ্য মানুষ এদের ফাঁদে পড়ে আজ গৃহহারা ছন্নছাড়া সাধুজী আবার নাকি কিছুদিন অতিথি হয়েছেন লাল বাড়িতে।

পরমা এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নেয়। কেউ কোথাও নেই। একটা কথা ভাবতে তার ভারি ভাল লাগে, শত্রু মিত্র চিনে পথ চলতে হবে। মিত্র যারা তাদের মধ্যে চাই ইস্পাতের মত কঠিন

একাগ্র। নাহলে শত্রুকে শেষ করা যাবে না। শত্রুকে শেষ করতে না পারলে, শুধুই হৈচৈ, বৃথা আস্ফালন। এতে কোন লাভ নেই।

পরমা বাড়ি গেলে এখন দেখবে কালানী ছবি আঁকছে। কালানীর ছবি খুবই স্পষ্ট। তার ছবি আঁকা ব্যাপারে স্কুল জীবনে সবাই প্রশংসা করত। অনেকে বলতেন, তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভাবনাময়। কিন্তু পরমার সঙ্গে বস্তিজীবনে চলে আসায় সবাই ছি ছি করে বলে ওঠে, যাঃ! সব গেল। অকালে কুঁড়ি ঝরে গেল।

কালানী কিন্তু আজো তার সাধনায় এতটুকু ছেদ টানে না। সমানে চালিয়ে যায়। শুধু আগের আঁকার সঙ্গে আজ একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখন তুলির প্রতিটি টানে যা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে চায়—তা জীবন! জীবনের ছন্দ, জীবনের স্পষ্টতা আজ তার রেখায় রেখায় বিধৃত।

পরমা উঠে পড়ে এক সময়। আজ ছুটির দিন। মহাবীর সম্পর্কে তার যে ভাবনা তাকে রূপ দিতে হবে। তার জন্য ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ করেছে সে। কালানী এদিকেই আসছে। কাছে এসে ধীরে ধীরে বলে তাকে, আজ ডাকি মহাবীরকে?

নিশ্চয়।

প্রায় সেই সময়েই পদ্ম এসে পড়ে। পদ্ম প্রশ্ন করে, কোথা?

একটু হাল্কা হয়েই জবাব দেয় কালানী, কোথা আর ডাকি বলো? এখানেই ডাকতে হয়। কথাবার্তাগুলো এখন থেকে ঠিকঠাক করে নিতে হবে তো।

পদ্ম দাঁড়ায় না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। শ্রীমন্ত ক'দিন জল আসছে না। তার দায়-দায়িত্বটা পরমাদের ঘাড়ে। তাই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করে সে প্রতি মুহূর্তে। আজ এটা স্পষ্ট অনুভব করে পরমা কালানী দুজনেই। কুলুঙ্গীটার ধারে গিয়ে বসে পদ্ম। তার দু'চোখে জল।

কালানী গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। বলে, বাঃ! চমৎকার!

এই না হলে আমার বোনের মত কাজ। আমি পই পই করে বললুম, আমার একমুঠো জুটলে তোমারও একমুঠো জুটবে। তুমি আমার পর নও। আমার আপন বোন। দু'দিন না যেতে যেতেই কথাটা ভুলে গেলে ভাই।

পদ্ম ধরা গলায় বলে, আমার দুর্ভাগ্যের কপাল। সেটা তোমাদের সংসারের ওপর চাপিয়ে অহেতুক ভার সৃষ্টি করতে আমার কেমন যেন বাধছে। আমি নিজেকে কোনো রকমে বোঝাতে পারছি না।

এই পৃথিবীতে কারো কপাল দুর্ভাগ্যের নয় ভাই। আর কেউ বিধাতার কাছ থেকে কেবলমাত্র সৌভাগ্যের ইজারা নিয়ে আসে না। চলো একটু ঘুরে আসি। মনটা হাল্কা হোক। আজ সন্ধ্যায় অনেকেই আসবে এখানে। মনে হয় মহাবীরও আসবে।

পায়ে পায়ে নদীর চরে এসে পড়ে দুজনে। এখান থেকে দক্ষিণে শ্মশান, মহাবীরের কুঁড়ে, উত্তরে শিল্পাঞ্চল আর চিমনীর ধোঁয়া সবকিছু স্পষ্ট দেখা যায়। পদ্ম শ্রীমন্তর কথা চিন্তা করে। নোঙরহীন নৌকোর মত কোথায় ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে লোকটা। মাঝে মাঝে আসে। আবার চলে যায়।

সেদিন শ্রীমন্ত এসে কালানী আর পদ্মকে এক জায়গায় ডেকে বলে, আমার সব গেছে কিন্তু কোন জন্মের সুকৃতির ফলে দুটো মেয়েকে পেয়েছি আজ। এতে আমার মন ভরে গেছে। উপার্জনের টাকাগুলো আজ কালানীর হাতে দিয়ে বলে, যা হয় তুই করিস মা। কালানী টাকা নিতে অস্বীকার করলে, ছোট ছেলের মত কাঁদতে থাকে শ্রীমন্ত। সে কান্না উপস্থিত সবার মধ্যে সংক্রামিত হয়।

কদিন আগে ঢোল কাঁধে শ্রীমন্ত প্রচার করতে বার হয়। সাড়ে-চারটের পরে। গরম পুকুরের ধারে। রথীন বাবু আসবেন—আপনারা সব যাবেন—যাবেন—যাবেন, ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—ডুগ্—

পরমা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভাবে। নতুন দিনের বার্তা বয়ে আনা মানুষটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। মাথার চুল অনেকখানি বেড়ে গেছে। একমুখ কাঁচা পাকা দাড়ি-গোঁফ। কাপড় চোপড় বেশ নোংরা। কিন্তু গলার স্বর তীব্র বর্শার ফলার মত ছুটে যায় যেন। কিছুদিন আগে এর পুরান-কথা আর পুরানের গান শুনে এসেছে পরমা। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ তার কাজেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন অনিবার্য। একে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রচার শেষে শ্রীমন্ত পদ্মর সঙ্গে দেখা করতে আসে। বাবার এই শ্রীহীন মূর্তি দেখে কেঁদে ফেলে পদ্ম। বলে, এ কি চেহারা বাবা তোমার?

কি চেহারা মা? ময়লা জামা-কাপড়! না মা—একে ময়লা বলতে নেই মা। মাটির মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছি ধীরে ধীরে। তাই এমন লাগছে। তোমার মায়ের কাছে তাড়াতাড়ি যেতে হবে তো!

ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে পদ্ম।

শ্রীমন্ত বলে, তোর মায়ের ডাক সকাল সন্ধ্যা, দুপুরে সব সময় শুনতে পাচ্ছি আর স্থির থাকতে পারছিনা মা।

এই কথার জবাব দেয় কালানী। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল সে। দু'চোখের দৃষ্টিতে আগুন জ্বেলে বলে, ধুলোয় শরীরটা মিলিয়ে দিলেই চলবে না আর তাড়াতাড়ি মাসিমার কাছে চলে গেলেও চলবে না। অন্যায় যারা করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে লড়াইটা করে যেতে হবে তো? ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে অন্যায় আর অত্যাচারের স্তম্ভগুলোকে?

শ্রীমন্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে কালানীর মুখের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঢোক গিলে বলে, কথাগুলো শুনতে খুবই ভাল লাগছে মা। কিন্তু পারবি কি তোরা সিংহ, বাঘদের দাপট কমাতে।

মানুষ খাওয়া বন্ধ করতে পারবি? জীবন্ত মানুষগুলোকে দিনের আলোয় চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে ওরা। গ্রামের পর গ্রাম আজ রক্ত-শূন্য কঙ্কালসার মানুষের ভিড়ে ভরে গেছে। যাদের না আছে অন্ন, না আছে শক্তি, না আছে সাহস, না আছে শিক্ষা। এদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে ধান্দাবাজদের। তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এঁটে উঠতে পারবি তোরা?

পরমা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে শ্রীমন্তর দিকে। তার কথাগুলির মধ্যে ক্ষোভ দুঃখ আছে। কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হয়ে যায় সে, শ্রীমন্তের বোধ আজ এই পর্যায়ে উন্নীত দেখে। ভাবতে পারে না সে। আগে সে জানত পুরান আর রামায়ণ মহাভারতের কিছু কিছু অংশ নিয়ে কারবার করে শ্রীমন্ত। এখন দেখছে তার চিন্তা কতদূর বেঠিক। শ্রীমন্তর মত সাদামাঠা স্বল্প শিক্ষিত মানুষও বাস্তবের কষাঘাতে প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষার এক অতি মূল্যবান অধ্যায়ের পাঠ সমাপ্ত করতে সমর্থ হয়েছে।

ধীরে ধীরে অনেকেই এসে পড়ে।

সিরাজ, রথীন, রাজবংশী, সোমনাথ, সাদাকাশ, পীতাম্বর ইত্যাদিরা। এর কিছু পরে মহাবীরও এসে যায়। মহাবীরকে ডাকে পরমা, এই ঘরে এসো।

ঘরের দিকে এগিয়ে যায় মহাবীর। দরজায় গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে, অনেকে বসে আছে একটা চাটাইয়ের ওপর। পা ঘষতে ঘষতে চৌকাঠের বেড়া পার হয়ে চাটাই থেকে বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে মহাবীর। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে ছুটে এসে কালানী বলে, এসো আমার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে হবে।

কোথা?

পাশের ঘরে।

কেন?

দরকার আছে।

কালানীর পিছু পিছু ছোট্ট একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে মহাবীর। কালানী দেয়ালে ঝোলান প্রথম ছবিটা ভাল ভাবে দেখায় মহাবীরকে। একটা শিকার করা জন্তুর মাংস গোল হয়ে বসে খাচ্ছে একদল উলঙ্গ মানুষ। তাদের আশে পাশে রাখা পুরাতন যুগের পাথরের অস্ত্র।

মহাবীর জিজ্ঞাসা করে, কিসের ছবি?

কালানী বলে, আদিম যুগের মানুষরা শিকার করে যা পেয়েছে তা সবাই ভাগ করে খাচ্ছে।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে কালানীর দিকে তাকায় মহাবীর।

কালানী ধীরে ধীরে দ্বিতীয় ছবিটির দিকে নিয়ে যায় মহাবীরকে। বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করে। বলে, এখানে দেখছো দৈহিক শক্তি আর অস্ত্রের জোরে একজন অনেকখানি জমি ঘিরে রেখে দিয়েছে। বাকি মানুষগুলোর হাতে শিকল, ক্রীতদাস সবাই। চাবুকের জোরে কাজ হয়। কয়েকজন সম্পত্তির মালিক। বাকি সবাই ভূমিদাস ক্রীতদাস। মানুষ নিজ স্বার্থে তৈরি করল এই ব্যবস্থা।

মহাবীরের চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

তৃতীয় ছবির দিকে এগিয়ে যায় কালানী। তার অনেক আগেই মহাবীর এগিয়ে এসেছে। কালানী বলে, জমির মালিক ছাড়া এখন কারখানার মালিক হয়ে গেছে অনেকে। অল্প একটু মাইনে দিয়ে মজুরির বাকি সব টাকা মেরে দেয় সাদা চামড়াওয়ালা, আর কালা চামড়াওয়ালা মালিকরা। তাই মালিকদের মূলধন দিনদিন ফুলে-ফেঁপে ওঠে। একটা কারখানার জায়গায় পাঁচটা কারখানা তৈরি হয় আর শ্রমিকরা অকালে চুল পাকিয়ে ক্ষয়রোগ নিয়ে কিংবা জীবন হারিয়ে সংসারের ওপর জগদ্দল পাথর চাপা দেয়। সে পাথর আর ওঠে না। লক্ষ কোটি মানুষের হৃদয়ের যন্ত্রণা ধোঁয়া হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশে ওঠে চিমনী দিয়ে।

উত্তেজনায় কাঁপতে থাকে মহাবীর।

কালানী আর একটা ছবির সামনে নিয়ে গিয়ে দেখায় সাঁওতাল বিদ্রোহের দৃশ্য। তারই পাশে দেখায় বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের দৃশ্য। বলে, মানুষ বুঝতে পারে তাদের শত্রু কে? কারা তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে খায়। কোটি কোটি মানুষকে নিরন্ন রাখে। তাই তারা এক হয়ে আন্দোলনে নামে। এছাড়া কোন পথ নেই। এখন ধীর মাথায় ভাবো, কেউ ছোট, কেউ বড় এমন কোন কথা উঠতে পারে কি এর মধ্যে? আদিম মানুষ যখন মাংস ভাগ করে খাচ্ছে তখন তো জাত ছিল না। কালানী দৃঢ় স্বরে বলে, বড় লোকরা আমাদের কমজোর করে রাখার জন্যে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করে রেখেছে। জাত তৈরি করেছে। আমরা কি সেই অবস্থাকে মেনে চলবো?

নেহি।

তাহলে তুমি মাটিতে বসতে যাচ্ছিলে কেন? সবার সঙ্গে বসবে না কেন?

আমার দেশে…?

কথা শেষ হতে দেয় না কালানী। বলে, তোমার দেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছত্রী, ভুঁইহারদের সঙ্গে তোমরা বসতে পাও না। তোমাদের ঘৃণা করে তারা। দূরে সরিয়ে রাখে। কুয়ার জল নিতে দেয় না। মেয়েদের ওপর অত্যাচার চালায়। কুঁড়েঘর পোড়ায়। নানা ধরনের খবর আসে। এসব খবরের একটাই মানে, ওখানকার মানুষ মানুষকে ভালবাসে না। ওখানে জাতের পরিচয়টাই আসল, মানুষের কোন মূল্যই নেই।

বিলকুল সহি।

আমরা বলতে চাই মানুষের মধ্যে ছোট-বড় বলে কিছু নেই। বড় লোকরা নিজেদের প্রয়োজনে ভাগ করে রেখেছে মানুষকে। আমরা সে ভাগ মানি না। কাজ অনুসারে মানুষ ভাগ, এ যুগে অচল। তুমি তো জানো মহাবীর, বজবজের পাশে বাটানগর। ওখানে একটা

বড় জুতো তৈরির কারখানা আছে। ওই মিলে যারা কাজ করে তারা কি সবাই মুচি? চামড়ার কাজ করলেই কি সবাই মুচি হয়?

না।

চল একসঙ্গে গিয়ে বসতে হবে। আরো অনেক কথা আছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহাবীর দীর্ঘদিনের জড়তার বেশ অনেকখানি কাটিয়ে ফেলে স্বচ্ছন্দে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসে পড়ে। ওখানে পদ্ম বসে আছে। শ্রীমন্তও।

সিরাজ কথা শুরু করে। বলে, পুরুষের কাজের সাথী হিসাবে তার জীবনে একজন মহিলা থাকলে জীবনটা আরো শক্তিশালী হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রেও তাই। দু'জনে যদি একসঙ্গে লড়াই করে তবে কোন বাধাই তাদের ঘায়েল করতে পারে না। সহযোদ্ধা একজন থাকলে দুঃখকে দুঃখই মনে হয় না। অবশ্য দু'জনের মত-পথ-চিন্তা-ভাবনা যদি এক ধরনের হয় তবেই এই অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। আজকের দিনে এই ধরনের মনের মিল বেশি করে প্রয়োজন। পুরুষ মার খাচ্ছে সমাজের ওপর তলার কর্তাদের কাছ থেকে। মেয়েরাও হচ্ছে বঞ্চিত। উভয় দিকেই জ্বালা আর দুঃখ বারুদ-স্তূপের মত জমাট বেঁধে আছে। পুরুষ আর মেয়েদের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তাই দুজনেই পারে ঘনিষ্ঠ, একাত্ম হয়ে জীবনের মূল লড়াইটা করতে।

রথীন একটু হাসতে হাসতে টেনে টেনে বলে, যা বললে তার পেছনে যুক্তি আছে কিন্তু একটা চলমান সমাজ-ব্যবস্থার প্রদর্শনী চলছে। ভোগ বিলাস আর প্রাচুর্য্যের মহোৎসব চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সত্য বস্তুটি টিকবে কতক্ষণ? এঁটে উঠতে পারবে কিনা সেটা হিসেব করে দেখেছো কি? মনে রাখা দরকার, মেকী আর কৃত্রিমতায় বাজার যখন পুরোপুরি দখল হয়ে বসে আছে তখন পাঞ্জা লড়ার মত জোর কব্জিতে রেখেই কথা বলতে হবে। আশপাশ ভাল করে দেখে নিতে হবে। বাঁধন দিতে হবে শক্ত করে। মজবুত বনিয়াদের ওপর রাখতে হবে পুরো ব্যবস্থাটা। সে ধরনের মনের জোর নিয়েই

তোমরা এগোবে। তাই এ ব্যাপারে আমার শুভেচ্ছা থাকলো সবার আগে।

রাজবংশী মুখ খোলে এবার। বলে, আপনি দেখুন অবস্থাটা। এ তো খেলা আছে না। জীবন আছে।

রথীন বলে, মহাবীর শ্মশান ছেড়ে মিলে চলে আসতে পারবে? পীতাম্বর বলছিল কোথায় যেন একটা কাজ ফাঁকা আছে। মিলে পীতাম্বরের পরিচয় কেউ জানে না। মালিকরাও ওকে তাদের লোক ভাবে। সেই সম্পর্কেই ওর কাজটা হবে আর কি!

হাঁ, হামি রাজী। শ্মশানে ভূত ঢুকেছে। কবে জান চলিয়ে যাবে। যত তাড়াতাড়ি পালাতে পাবি ততই মঙ্গল।

কাজ পাবার পর এই পাড়াতেই একটা ঘর নেবে।

হাঁ হাঁ. এদের ছেড়ে আর কুথাকে যাবো?

আর একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, খুব সোজাসুজি উত্তর দেবে। তুমি পদ্মাকে ভালবাস?

পদ্মা হামার দেবী আছে হুজুর। হামার খুব জ্বর হয়েছে, জীবন থাক্‌বে না- বহুৎ জ্বর পদ্মা এসেছে, সেবা করেছে—দাবাই দিয়েছে হামার জীবন দিয়েছে ওকে হামি ভালবাসবো না হুজুর?

ও যদি তোমায় সাদি করতে চায়, রাজী আছ তুমি?

এ কি বলছেন বাবু—মাটির দিকে মাথা নামিয়ে ঘাম্‌তে থাকে মহাবীর

রথীনবাবু পদ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, পদ্মা তোমার মত কি?

তীরের ফলকের মত রথীন বাবুর চোখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলে পদ্মা, মহাবীর নৌকোডুবির সময় আমার জীবন রক্ষা করেছে। এই নিয়ে ওকে জড়িয়ে অনেক নোংরা কথা হয়েছে আমার সম্পর্কে। আপনারা জানেন, শ্রীদাম চক্রবর্তীর লোকরা আমায় ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাদের কুৎসিত মুঠো থেকে পালিয়ে এসেছি আমি। সেই রাতেই আমি মত ঠিক করে ফেলেছিলুম, যে-মহাবীরকে নিয়ে ওরা নানা ধরনের কথাবার্তা রটাচ্ছে তারই সঙ্গে থেকে যাবো। কিন্তু

অসুস্থ বলে সেবা-শুশ্রূষা করে চলে যাই। অল্প সময়ের মধ্যে হলেও সে মানুষটাকে আমি যতদূর চিনেছি সে মনের দিক থেকে অনেক উঁচু। আমার সবকথা শুনে উনি যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হন, আমার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।

মহাবীর ধীরে ধীরে মুখখানা ওঠায়। তার দু'চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে তখন। এই পৃথিবীতে তার যে কানাকড়িও দাম আছে তা কোনদিন ভাবতে পারেনি সে। আজ এক অভিনব পরিবেশে, নিজেকে মানুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখে অদ্ভুত ধরনের তৃপ্তি লাভ করে সে।

কালানী মহাবীরের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে যায়।

পদ্মাও ধীরে ধীরে অনুসরণ করে ওদের দু'জনকে।

সকালে শ্রীদাম চক্রবর্তীর গদীতে রীতিমত সরস এক আলোচনা চলে। শহরে মোকর্দমায় গিয়েছিল দর্পণ রায়। সেখানে নিজ-চোখে দেখে এসেছে, মহাবীর আর পদ্মার রেজিস্ট্রী বিয়ে হয়েছে। বিয়ের অতিথি ছিলেন রথীন রায়, সিরাজউদ্দীন, রাজবংশী যাদব, সোমনাথ চক্রবর্তী, পরমেশ্বর মুখোটি প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিরা! দর্পণ বলে, মহাবীরকে চেনাই যায় না। সেই মদখোর মাতাল লোকটা বেশ ফিটফাট্। জামা কাপড়ে রীতিমত ভদ্রলোক। পদ্মরও রূপ খুলেছে রীতিমত। শালার ভাগ্য ভাল! ছিমস্থ বায়েন পাঞ্জাবির ওপর উড়ুনী ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন কিছুই হয়নি।

শ্রীদাম অনেকক্ষণ কোন কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত একটা শব্দ করে, 'হুঁ'!

আশপাশে যারা ছিল আর কোন মন্তব্য করে না। ধীরে ধীরে সরে যায়। সবাই সরে যাবার পর শ্রীদাম দর্পণকে বলে, যুগটা কেমন যেন পাল্টাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে দর্পণ।

দর্পণ কোন সাড়া করে না। মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

মিলের ভোঁ বাজে। হাজার তাপ্পিমারা প্যান্ট-জামা পরা

চটকল মজুরের দল ফেঁসো ঝাড়তে ঝাড়তে মিল-গেট দিয়ে হু হু করে বেরিয়ে আসে। শরীরগুলো কাঠামোসার। গায়ে 'গত্তির' পরিমাণ খুবই কম। ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করলে কত রকম রোগ ধরা পড়বে তার কোন ঠিকানা নেই। প্রতিদিন তাল তাল ফেঁসো নাকে-মুখে-পেটের মধ্যে চলে যায়। এদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে মহাবীর। জেটি-গেট দিয়ে বার হয়ে বার বার তাকায় দূরে শ্মশানে তার পুরাতন ডেরাটার দিকে। এখান থেকে ছোট্ট বিন্দুর মত দেখায় কুঁড়েটা। পুরাতন দিনের কথা মনে আসে। পাশ দিয়ে যাবার সময় রামনরেশ বলে, সাত বাজে।

হাঁ।

আজ সাতটায় মিটিং আছে। আগে থেকেই তার জানা। তবু রামনরেশ তাকে সজাগ করে দিয়ে যায়। নতুন লোক বলে বোধহয়।

কিছু দূর না এগোতেই ফাগুনী বলে, ইয়াদ হ্যায় তো—

হাঁ ভাই, হাঁ।

পাশে লছমন ছিল বুঝিয়ে বলে, নয়া সাদি করেছিস তো, ভুল হয়ে যেতে পারে—

আরে না না। হামার ভুল হলে বউ মনে করিয়ে দেবে।

তা অবিশ্যি ঠিক। তুমি ভাগ্যবান। এমন বউ ক'জনের ভাগ্যে জোটে।

।। ২২ ।।

লাল কাপড় দেখলে এঁড়েগরু যেমন ক্ষেপে ওঠে আর লাফালাফি করতে থাকে, শ্যামগঞ্জের শিল্পাঞ্চলের বাবু-সাহেবরা তেমনি ক্ষেপে ওঠে লাফালাফি করে লালঝাণ্ডার মিটিং হবে শুনলে। দারোয়ান-গুলো একত্র হয়ে দানায়-দানায় গুজ গুজ করে। দালালরা জটলা পাকায় এখানে ওখানে। কারা মিটিংয়ে যায় তারা দেখে। তারপর শুরু হয় অকথ্যভাবে নির্যাতন-অত্যাচার, দমন-পীড়ন ইত্যাদি।

মিলের বড় কর্তার টেবিলের ওপর বিভিন্ন ভাষায় শ্বেত-পাথরে লেখা থাকে : 'পাঁঠার ইচ্ছায় কালি পুজো হয় না।' চটকল শ্রমিকদের ওপর লাথি কিল চড় ঘাডধাক্কা প্রতিদিনকার ঘটনা। শুধু কি তাই, ঝড়-জলে ওপারের শ্রমিকরা এসে পৌঁছতে না পারলে বড় সাহেব পা দুলিয়ে বলেন, আমার মিলের বাঁশি হলে নদী সাঁতরে লোক আসবে। রথীন নদীর ধারে বসে এই সব কথা চিন্তা করে।

এই ধরনের ঔদ্ধত্যের পীঠস্থানে লালঝাণ্ডার মিটিং। বঙ্কিম মুখার্জি এসেছেন মিটিং করতে। দালাল আর দারোয়ানদের খবরদারী অগ্রাহ্য করে দলে দলে মানুষ ছুটে আসে গরম পুকুরের ধারের মাঠে। প্রতিদিনকার অত্যাচার অবিচার তাদের ছুটিয়ে আনে। সোচ্চার করে তোলে।

সভা চলতে থাকে। মালিক-শ্রেণীর শোষণ যে কি বীভৎস হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে চলেন বক্তা। লোক কমে না, বরং বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত দালালরা পাথরের টুকরো ইঁট ছুঁড়তে শুরু করে দেয়।

বক্তব্যের ভাষা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে : মালিক দালাল দিয়ে শ্রমিকদের সভা ভেঙে দেবে ? হাতে পায়ে শিকল দিয়ে আর কতকাল বেঁধে রাখবে ? হৈ হৈ করে ওঠে সভার লোকজন। ঘন ঘন শ্লোগান ওঠে। বঙ্কিমবাবু বলেন, এত ছোট ঢিল ছুঁড়ে আমায় হটিয়ে দেওয়া যায় না।—মহাবীর, পদ্ম. কালানী, পরমা সবাই এই জমায়েতের আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। তারা বলতে থাকে, ক'জনকে মারে মারুক। চলুক মিটিং।

সভার শেষে সবাই একবাক্যে স্বীকার করে, শ্যামগঞ্জ শিল্পাঞ্চলে এত ভাল সভা এর আগে আর কোনদিন হয় নি। এই সভার জন্যে শ্রীমন্ত থেকে আরম্ভ করে সবাই আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। বস্তির শ্রমিকরা মিছিল করে এসেছে। তা দেখে মিলগেটের শ্রমিক দাঁড়িয়ে যায়। যা এর আগে কোনদিন হয় নি।

শ্রমিকরা সভার পর পরিষ্কার ভাষায় বলেছে, লালঝাণ্ডা সত্যি

কথা বলেছে। ভারত স্বাধীন হলো এখনো মালিকের জুলুম থাকবে কেন? তাহলে আমাদের আজাদীর মানে কি? জুলুম বন্ধ করা দরকার। মাইনের টাকা বাড়াতে হবে। ওদের লাভ তো ভালই হচ্ছে। তবে দেবে না কেন? সব শেষে বলে, লালঝাণ্ডা তো মজুর কিষানের ঝাণ্ডা। চিকাগো শহরের হে মার্কেটে মজুররা আটঘণ্টার বেশি খাটবে না --এই লড়াই করতে গিয়ে জান দিয়েছিল। তাদের রক্তে রাঙিয়ে এই লালঝাণ্ডা। মজদুর-কিষান এই ঝাণ্ডার জন্যে জান দেবে না তো কে দেবে?

মিলের মধ্যে একটা পাল্টা শক্তি দানা বেঁধে ওঠে। ম্যানেজমেণ্ট খুব ভাল বুঝতে পারে। এর পেছনে কয়েকজন করিৎকর্মা লোক আছে। এদের খুঁজে বার করার জন্য লোক ভেজিয়ে দেয়।

প্রথমে সনাতনের নামে চার্জশীট ইস্যু হয়। এতে দমে না সনাতন। দলবল নিয়ে প্রতিবাদ জানায়। সিফট ইনচার্জ সনাতনের পক্ষে কথাবার্তা বলার জন্যে পুলিন দাশকে ধাক্কা মারে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাঘের মত ক্ষেপে ওঠে পুলিন দাশ। ঝাঁপিয়ে পড়ে সিফ্‌ট ইনচার্জের ওপর। সিফ ট ইনচার্জ যে মুখ দিয়ে 'শুয়োরের বাচ্চা' উচ্চারণ করেছিল সে মুখখানা রক্তে ভেসে যায়। তার দু'খানা শক্ত দাঁত অকালে তুলে দিতে হয়।

ম্যানেজমেণ্ট পুলিশকে খবর দেয়। বেধড়ক গ্রেপ্তার করার অনুরোধ জানায়। পুলিশের বড়কর্তা পর্যন্ত এই সময় শ্যামগঞ্জে ছুটে আসে। ম্যানেজমেণ্টের বড়কর্তাদের আড়ালে নিয়ে গিয়ে পুলিশ বলে, গ্রেপ্তার করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আপনাদের গোডাউন আর ফার্নেসখানা আমায় একবার দেখতে হবে।

কেন?

প্রয়োজন আছে। তারপর শুধু ওদের নয় আপনাদেরও গ্রেপ্তার করতে হতেপারে। স্পষ্ট কথা আপনাদের শুনিয়ে দেওয়া ভাল, কোন এক বিশেষ সুত্র থেকে আমাদের কাছে খবর আছে, কয়েক

জন লোককে আপনারা ফার্নেসে পুড়িয়ে মেরেছেন আর কয়েকজনের কিছু জিনিসপত্র এখনো আপনাদের গোডাউনে গেলে পাওয়া যাবে। হয়ত মৃতদেহও দু'একটা পাওয়া যেতে পারে।

দু'চোখ কপালে ওঠে মিঃ আগরওয়ালার। আজকাল সবকথা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। দিনকাল কেমন যেন পালটাচ্ছে।

কি — চলুন। দেখে আসি গোডাউনখানা।

আচ্ছা, যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ততক্ষণ আপনি একটু বিশ্রাম নিন।

ও সি তখন পুলিন দাশের বিরুদ্ধে একটা মামলার কাগজ-পত্র প্রস্তুত করতে ব্যস্ত আর সিফ্‌ট ইনচার্জ শর্মা তার সামনে বসে বয়ান দিয়ে যায়।

এর পরের সভায় শ্রমিকরা শীতের রাতে জমাট-বাঁধা বরফের মত বসে থাকে। মাথায় গামছা বেঁধে বা গায়ে ছোট চাদর জড়িয়ে। তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে আন্দোলনের স্রোত। বোনাসের কথাও শ্রমিকদের মুখে এসে হাজির হয়েছে। দু'একজন কোম্পানীর পা চাটা দালাল তাচ্ছিল্য করে বলছে, কাজ করছো তার মাইনে পাচ্ছো তার ওপর নাকি আবার 'বোনাই' দিতে হবে। এই নিয়ে কত হানাহানি আর নেতাদের হেনস্থা করার চেষ্টা চলে। সে সমস্ত অগ্রাহ্য করে চলে একটার পর একটা জনসভা। ঘটনাগুলো ছায়াছবির মত রথীনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

মালিকরা কিছুটা পিছু হটে যায় কিন্তু একটা তীব্র ধাক্কা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়। গ্রামের শ্রীদাম চক্রবর্তীরা দেখে বেনামী কিছু চিঠি পুলিশের কাছে যাচ্ছে। এতে হয়রান হতে হচ্ছে তাদের! একজন বদ-মেজাজী অফিসারের জন্যে গ্রেফতার হতে হয় সাধুজী, শ্রীদাম চক্রবর্তী আর হালদারবাবুকে। ডাকাতি করা আর ডাকাতের মাল-গছার অভিযোগে। কি করে শায়েস্তা করা যায় এই দলটাকে তার একটা পথ খোঁজে শ্রীদাম। এমন সময় চটকলের বক্সীবাবু এসে খবর দিয়ে যায়, সাহেব আপনাদের একবার ডেকেছেন। আজই সন্ধ্যায়।

সন্ধ্যায় বৈঠক বসে। শ্রীদাম চক্রবর্তী আর দর্পণের সঙ্গে কারখানার ম্যানেজমেন্ট এক সঙ্গে বসে ফন্দী আঁটে। কেমন করে দলটাকে ভেঙে দেওয়া যায়। যারা গ্রামে আর শিল্পাঞ্চলে সমানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। সব শালারা বিদেশের দালাল। বিদেশ থেকে টাকা আসছে। তাতেই ওদের নবর-চবর। দেশের সব কিছুকে তুচ্ছ মনে করে ওরা। বিদেশ ওদের কাছে পিতৃভূমি। নিজের দেশ গোল্লায় যাক্। পরের দেশের গুণগান গায় ওরা। শর্মা সাহেব বেশ রসিয়ে রসিয়ে কথাগুলো বলেন। সবাই একমত হয়। যেমন করে হোক তারা এই দলকে ভেঙে টুকরো টুকরো করবেই। এটা তাদের কাছে ধর্মের কাজ। পবিত্র কর্তব্য।

শ্রীমন্তর মাঝে মাঝে মনে হয় এমন একটা সংসারে একদিনের জন্যেও থেকে যেতে পারল না অন্নপূর্ণা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে। ছোট্ট একটা ঘর নিয়ে মহাবীর আর পদ্মর সংসার। মাঝে মাঝে আসে কালানী আর পরমা। জাত হিসাবে দেখলে অনেক উঁচু জাতের ঘরে জন্মেছে ওরা। পরমার বাবার গলায় পৈতেও আছে। কিন্তু সে সবের কোন মূল্য না দিয়ে দিব্যি বসে পড়ে পদ্মর রান্না ঘরে। মহাবীর এই নতুন জমানাকে বুঝে নিয়েছে মনে মনে। মেনে নিয়েছে। সব সময় গুনগুন করে গান গায় সে।

সেদিন কেউ কোথাও নেই দেখে মহাবীর বলে, এই সিন্‌হল কা রাজকুমারী— সিন্‌হল কা—

মুখ টিপে টিপে হাসে পদ্ম। তারপর ছোট্ট একটা লাঠি নিয়ে ছুটে এসে বলে, গোসা হয়ে গেছে রাজকুমারীর। হটো—হট যাও—

আরে বাপরে—কসুর মাফ কিজিয়ে রাজকুমারীজী—

নেহি নেহি—আমার বাবার রাজ্য থেকে চলে যাও। তোমার মুখ দেখতে চাই না আমি।

কিরপা কিজিয়ে রাজকুমারীজী।

এমন সময় ছুটে এসে পদ্ম মহাবীরের উন্মুক্ত বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে। আনন্দে অধীর মহাবীর বলে ওঠে, হামারি রানী, সিনহল কা রাজকুমারী—

পরক্ষণেই মহাবীরের চেহারা পাল্টে যায়। চা খেতে খেতে বলে, পদ্ম, শালালোক কোসিস করছে পরমা সিরাজ আউর রাজবংশী ভাইকে মারার জন্য। গায়ে হাত দিলে হাড্ডি চুর চুর কর দেগা।

পদ্ম সভয়ে বলে ওঠে, তুমি চট করে যেন কিছু করে ফেলো না। সবার সঙ্গে বসে আলোচনা করে নাও। কি হচ্ছে সব কথা জেনে শুনিয়ে দাও সবাইকে। কোম্পানীর লোক পাগল হয়ে যাচ্ছে দিনের পব দিন।

আরে হামাদের কথা সবাইকে সমঝাতে হবে তো।

হাঁ। তাতো হবে।

ছুটির দিন। মহাবীর মিলের চারদিক একটু ঘুরে বেড়াতে চায়। গরম-পুকুরের ধারের সবুজ মাঠখানা দেখতে খুব ভাল লাগে তার। এখানে দাঁড়িয়ে নেতারা কোম্পানীর গলদ কোথায় তা দেখিয়ে দেয়। পাইপ ভরা গরম জল পুকুরখানায় এসে পড়ছে অনবরত। তাই গরম পুকুর নাম করণ হয়েছে এটার। শীতকালে এখানে নেয়ে খুব আরাম। হাসে মহাবীর।

মাঠের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো লাল ফুলে ভরে গেছে। চৈত্রমাস। এখনই বেশ গরম পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে ধুলো আবর্জনা নিয়ে ঘুর্ণি উঠছে। মোষের পাল নিয়ে নদীর চরের দিকে চলেছে কয়েকটা ছোকরা। হাতে খাটো মাপের লাঠি। চলতে বেচাল দেখে মাঝে মাঝে সাঁটাচ্ছে কষে। একটু ছুটে আত্মরক্ষা করতে চাইছে মোষগুলো।

হোগলা বনের ধারে পূর্বদিকে কিছু কেরানী বাবুদের কোয়াটার। ওর কিছু দূরেই শুয়োরের খোঁয়াড়। একপাল শুয়োর বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে রাস্তার দিকে এগিয়ে আসছে। রামপীরিত একটা অশ্বথ

গাছের ছায়ায় বসে বিড়ি টানছে। মহাবীরকে সে চেনে। দেখেই বলে, মহাবীর তুই তো বাবু বনে গেলি—

বাবু নয় ভাই। এতদিন হামায় কেউ মানুষ বলে ইজ্জত দিত না। আজ হামি সে ইজ্জত পেয়েছি। পৃথিবীতে জন্মে এটা একটা বড় লাভ হয়েছে হামার।

বিড়ি খাবি তো?

হাঁ হাঁ জরুর।

বেলা বেড়ে যায়। উত্তর দিকের নারকেল গাছের সারির তলায় এসে দাঁড়ায় মহাবীর। কতগুলো গরু চরে বেড়াচ্ছে ফাঁকা মাঠে। এখানে কয়েক ঘর বসতি মাত্র। অধিকাংশই কোম্পানীর পেটোয়া।

মহাবীরকে দেখতে পেয়ে কমল এগিয়ে আসে। সহাস্যে বলে, কি নেতাজী, কি খবর?

নেতাজী হামি?

হাঁ।

তুমহার আঁখ আউর দিমাক বিলকুল খারাপ আছে ভাই। নাহলে আমায় নেতাজী বলো।

ছোড়, সমাচার বোল।

সমাচার নেবার জন্যেই তো এলুম মহারাজ। হামি হলুম গিয়ে ছোটা পুঁটিমাছ। জান হামাদের থাকবে কি যাবে জানতে এলুম। বলে হাসতে থাকে মহাবীর। কমল বলে, চল দোস্ত এখানে কথা হবে না। ডেরায় চল। সেখানে চা হবে আউর বাত ভি হবে।

ঠিক হ্যায় চল।

মহাবীরকে দেখে আশপাশের অনেকে এসে দাঁড়িয়ে যায়। খাটিয়া পেতে বসে পড়ে মহল্লার লোকজন। কথাবার্তা বলতে বলতে নগিনা সাহ বলে, আসলি কথা শুনে নাও মহাবীর—পেটের জন্যে সবাই এই বাঙ্গাল মুল্লুকে এসেছে। বঙ্কিম বাবুর কথা আমরা বুঝেছি। সরকার যদি বিহার, ইউ, পি মুল্লুকে কারখানা বানাতো আমরা বিবি

বাচ্চা ফেলে এখানে আসতুম কি? মালিকের অত্যাচার, বাপরে-বাপ—। গোডাউন মে লাশ রাখা থা। ফারনেসমে বহুৎ লাশ গায়েব কর দিয়া। বহুৎ আদমী দেখা। শেষের দিকে ঠক ঠক করে কাঁপতে থাকে নগিনা সাহ। সাধারণ একজন শ্রমিক পর্যন্ত কতটা উত্তেজিত হতে পারে তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে নগিনা।

কমল ধীর গলায় বলে, এই অত্যাচারের খিলাপে আছে মজদুর। কিন্তু পথ দেখাতে হবে তো? কে পথ দেখাবে? তোমরা প্রতিবাদ করছো, আমরা তার সমর্থন করি। কিন্তু পথ দেখাবে কে? মালিকের এই তানাশাহী চুর চুর করবে কে?

শ্যামগঞ্জের সারা শিল্পাঞ্চল জুড়ে এক চাপা গুঞ্জন দেখা যায়। পাওয়া যায় না ওপারের যতীনকে, পাওয়া যায় না রাম অবতার সমেত প্রায় সাত-আটজনকে। সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে গোডাউনে-লাশ-জমা-করে-রাখা আর ফারনেসে পোড়ানোর সংবাদ। উত্তাল হয়ে ওঠে গ্রামগঞ্জ শহরনগর। তারই প্রতিফলন দেখা যায় এই শ্রমিক বস্তিতে।

ম্যানেজমেন্টের মধ্যেও চাপা উত্তেজনা দেখা যায়। কিছুক্ষণ পর পর গাড়ি ছোটাছুটি করে। টেলিফোন বেজে ওঠে। ছুটে আসে পুলিশের গাড়ি। জেনারেল অফিসের নিশ্ছিদ্র কামরার ওপর-তলার কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে। গাড়ি ফেরার সময় দামী কার্পেট উঠে আসে গাড়িতে। আরো কত কিছু। লঞ্চে-ইষ্টিমারেও লোকজন ছোটাছুটি করে।

মাকু, মেড়া আর ভাল মেসিনের জন্যে ঘুষ দিতে চাইছে না শ্রমিকরা। ম্যানেজমেন্টের লোক ধাক্কা দিতে গেলে বা আগের মত ঘাড় ধরে বার করে দিতে গেলে প্রতিবাদ করছে তারা দল বেঁধে।

বাবু-সাহেবদের ওপর চোরা-গোপ্তা আক্রমণ হচ্ছে।

নিত্যানন্দ চৌধুরী হামেশাই পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গলায় হারমেনিয়াম নিয়ে মিল গেটে নাচে। গান গায়। লোক জমা হলে বক্তব্য রাখে।

মজুরদের 'একাই' ছাড়া পথ নেই জলের মত বুঝিয়ে দেন। এইসব বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে উঠে পড়ে লাগে শ্যামগঞ্জের মালিক।

মহাবীর এ ব্যাপারে আসল কায়দাটা শিখে ফেলেছে।

তাই শ্রমিকদের প্রায় সবাই মহাবীরকে খাতির করে। চা খাওয়ায়। স্মরণ করিয়ে দেয় মহাবীরকে বাঙালীদের বড় গুণ জাত-পাত না মেনেই তোমাকে আপন করে নিয়েছে। কাছে টেনে নিয়েছে। শ্মশান থেকে তুলে এনেছে। তুমি বড় হবে।

বাড়ি ফেরার পথে মহাবীর পথের আশেপাশে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম সমারোহে মুগ্ধ হয়। শালিকের দল লাফিয়ে লাফিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাবীর কৃষ্ণচূড়ার ঝুলে-পড়া-একটা-ডাল থেকে কয়েকগুচ্ছ ফুল তুলে নেয়। সেগুলোর ওপরে হাত বুলোতে বুলোতে আপন আস্তানায় এসে পড়ে। দরজার সামনে অপেক্ষমান পদ্ম ভেতরের দিকে এগিয়ে যায়। মহাবীর দ্রুত পায়ে পদ্মর পাশে এসে দাঁড়ায়। ফুলগুলো গুঁজে দেয় তার খোঁপায়।

পদ্ম ঘুরে দাঁড়ায়। সহাস্যে বলে, এত দেরী হলো কেন?

খবর…। হিসাব নিচ্ছিলাম লোকে হামাদের চায় কি চায় না।

হিসাব করে কি পাওয়া গেল?

তুমি হামায় চাও আর তারা হামাদের চায়।

আর আমরা কাদের চাই? বলতে বলতে সহাস্যে ঘরের মধ্যে আসে কালানী।

তোমরা আমাদের চাও। বলে হো হো করে হাসতে থাকে পদ্ম।

কালানী পদ্মর খোঁপার ফুলের বৃহৎ স্তবকখানা ভেঙে দু'ভাগ করে একভাগ নিজের খোঁপায় গোঁজে। সঙ্গে সঙ্গে পদ্মর মুখখানা হাতে নিয়ে বলে, রাগ হলো না তো?

হলো বৈকি।

তাই নাকি?

নিশ্চয়। বলে, এক ধরনের মিষ্টি মুখভঙ্গী করে পদ্ম। যার অর্থ কালানী ছাড়া আর কেউ বোঝে না।

কালানী বলে, এবার আসল কথায় আসা যাক। আজ অনেকজন খাবে এখানে। গভীর রাতে আসবে। আমাদের দুজনের ওপর দায়িত্ব, রান্না-বান্না করতে হবে। আনন্দে উচ্ছসিত হয়ে ওঠে পদ্ম। ঠিক আছে।

কালানী চুপি চুপি বলে. কিন্তু কাউকে বলা যাবে না কে এসেছিল —কেন এসেছিল -কখন এসেছিল ইত্যাদি। বুঝতে পারলে ?

হাঁ ভাই।

শ্যামগঞ্জের শিল্পনগরীর আশপাশে চোখ রাখলে দেখা যাবে কয়েকজন বাবু-সাহেব রীতিমত ব্যস্তসমস্ত। লঞ্চে চলে যায় কোথা। আবার আসে। দিনরাত। কোন বিশ্রাম নেই। মাঝে মাঝে ষ্টীমারেও কেউ কেউ যাতায়াত করছে। গাড়িও ছুটছে।

গতবারের দুর্ঘটনার সময় ম্যানেজমেণ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছে, মানুষ আর সবকিছু চুপচাপ সহ্য করে থাকতে চায় না। তারাও প্রতিবাদ করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। অভিজ্ঞ মহলে যা আলোচনা হয় তার সারমর্ম এটা ঝড়ের পূর্বাভাস। এবার খুব আটঘাট বেঁধেই কাজ করবে কোম্পানী। ব্যবসা চালাতে হবে তাদের। তাই রাস্তা পুরোপুরি পরিষ্কার করে নেবে।

পরমা ঘন ঘন বৈঠক চালায় অনেক দূরে কুমড়োখালির বাসায় গিয়ে। তাদের মধ্যে কৌশল ঠিক হয়। কেউ কোন রকমে চিহ্নিত হয়ে ধরা দেবে না সংগঠনের লোক হিসাবে। শ্রমিকদের মধ্যে মিশে থাকবে। কোন রকম প্রতিবাদ করতে হলে দল বেঁধে করতে হবে।

পরমা বলে, হটকারী কোন পথ নেওয়া হবে না। তাহলে কোম্পানী কচুকাটা করার সুযোগ পাবে! কর্মীরা শ্রমিকদের সঙ্গে সব সময় মিশে থাকবে। যেমন মাছ জলে মিশে থাকে। এই মিশে থেকেই আপন আপন কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

কুমড়োখালির বাদা থেকে ফিরে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে পরমা ; সামনের বাসায় কুকুরের তীব্র চিৎকার। এ স্বর খুব চেনা চেনা। মহাবীরের ভক্তর ঝাঁঝাঁলো চিৎকার। ধীরে ধীরে উঠে আসে পরমা। সঙ্গে কালানী। কয়েকজনের বিটকেল চিৎকার শোনা যায়, বল শালা, পরমা কোথায় ? শালা, শুয়োরের বাচ্চা !

কে একজন বলে দেয় ঐ সময়, সে তো দুটো ঘর পাশেই থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজনপুলিশ ছুটে আসে। তখন অনেক দূর চলে গেছে পরমা। সিরাজ, রাজবংশী, পিতাম্বরদের খবর দিয়ে ঝড়ের মত সে এগিয়ে যায় নিরাপদ স্থান কুমড়োখালির বাদায়।

ভোরের অনেক আগেই গ্রামের শ্রমিকদের কাছে খবর পৌছোয়, কোম্পানী মিথ্যা মামলা করে মিলের একদল শ্রমিককে গ্রেপ্তার করেছে। শ্রমিকরা মিলের মধ্যে কাজ বন্ধ করে হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তাদের মুখিয়া কর্মীদের মিলের মধ্যে দেখতে পায় না। এমন সময় পাট-ঘরের গেঁড়াগুলে জমাদার ডিপার্টমেণ্টে এসে বলে, শালা রাতকে দিন, দিনকে রাত বানাবে ইবার কুম্পানী।

কেন রে ?

মিলের হাসপাতালে দেখ্‌গে যা, হাত-পা-পিঠ পিন দিয়ে চিরে ব্যাণ্ডিজ কচ্ছে। মাথায় কাপড় জড়াচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে ছিনু বলে চারজন দারোয়ান রুলবাড়ি নিয়ে ছুটে এল।

কথা শুনে রাজ্জাক আলী চিৎকার করে ওঠে, চল শালা সব্বাই মিলে যাবো আমরা। চল শালা—একদিন আমাদেরও তো বেকায়দায় ফেলবে। তার চেয়ে যা হবার আজই হয়ে যাক্।

উন্মত্তের মত রাজ্জাক আলী ডিপার্টমেণ্টে ডিপার্টমেণ্টে ছুটে চলে। কাজ ফেলে শ্রমিকরা ছুটে আসে। হাসপাতাল চত্বর শ্রমিকে শ্রমিকে ভরে ওঠে। ভয়ে লাঠি ফেলে পালিয়ে যায় দারোয়ান। একধারে চারজন পুলিশ কাগজপত্রে কি যেন লিখছিল। রাজ্জাক গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, কি লিখছেন ?

সিরাজ, রাজবংশী, মহাবীর, পীতাম্বর, সোমনাথ এরা সবাই কাঙ্গাল, হরিচরণ, ক্ষেত্র আর ওসমানকে মেরেছে। দু'একজনের অবস্থা খুব খারাপ।

আপনি দেখেছেন ?

হাঁ।

আমাদের সঙ্গে চলুন। ক'জনকে আলপিন আর ধুতুরো ফলের কাঁটা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে হাসপাতালের রোয়াকে। ওদের ব্যাণ্ডেজ করিয়ে মিথ্যা কেস লিখছেন আপনি।

না।

মিথ্যে কথা বলছেন আপনি। নরহরি খুলে ফেলতো সব বাঁধন। সব শালা পেটনের ভয়ে দৌড় দেবেখন।

পুলিশ অফিসার আশপাশের পুলিশগুলোকে খুঁজে পায় না। একবার কাগজের দিকে আর একবার রাজ্জাকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, এখন কি করবো ?

ছিঁড়ে ফেলুন মিথ্যেকথা লেখা সব কাগজগুলো। দালাল শালাগুলো টাকাও খেয়েছে। পালিয়েও গেছে। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন থানায়। যাদের বিনা দোষে ধরে নিয়ে গেছেন, ছেড়ে দেবেন।

সমস্ত মিলখানা বন্ধ হয়ে যায়। গরমপুকুর ধারে বিরাট সভা। সেই সভা থেকে ঘোষণা করা হয় শ্রমিকদের ওপর এই ধরনের অন্যায় অবিচার সহ্য করা হবে না। এরা শ্রমিকদের পিটিয়ে মারে। ফার্নেস পুড়িয়ে দেয়। এখন মিথ্যা মামলা দিয়ে কয়েকজন মুখিয়া কর্মীকে জেলে পুরে আবার তাদের খেয়াল খুশি মাফিক যা ইচ্ছে তাই করতে চায়। তা আমরা হতে দেব না। থানায় বন্দী হয়ে আছে মহাবীর রাজবংশী আরো অনেকে। মিছিল করে থানা পর্যন্ত গিয়ে আমাদের কর্মী বন্ধুদের আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই।

মালিকের অন্যায়ের প্রতিবাদে আজ ধর্মঘট। আগামীকাল আবার মিল চলবে।

দীর্ঘক্ষণের করতালির মধ্যে এই প্রস্তাব সবাই মেনে নেয়।

থানার হাজতে মহাবীররা আবদ্ধ। তাদের সারা শরীরে নির্দয় প্রহারের চিহ্ন। থানার বড়বাবু মহাবীরকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি দেখেছ তো, পরমা, সিরাজ, রাজবংশী, ইত্যাদি লোকরা কাঙ্গাল, হরিচরণ, ক্ষেত্র আর ওসমানকে মেরেছে?

না। মিথ্যা কথা।

সত্যি কথা।

আপনি চেঁচিয়ে বললেই মিথ্যা কথা সত্যি হয়ে যাবে?

তোমার কপালে এখনো অনেক কিছু আছে।

আপনি কপাল গুনতে জানেন নাকি বাবু?

তামাসা হচ্ছে শালা—দে তো আচ্ছা করে কয়েক ঘা—

মেরে আমার চামড়া ফাটাতে পারেন বাবু, আমার মন ভাঙতে পারবেন না।

এমন সময় বড় বাবুর দৃষ্টি পড়ে সামনের মাঠের দিকে। হাত থেমে যায় বড় বাবুর। একজন কনেস্টবল ছুটতে ছুটতে এসে খবর দেয়, একপাল লোক আসছে।

ভ্রু কোঁচকায় বড়বাবু।

মিছিলটা থানার কাছাকাছি এসে যায়। সামনের সারিতে পদ্ম, কালানী আর কদম।

দূর থেকে দেখা যায় উদ্ধতভঙ্গীতে মিলের চিমনী আকাশের দিকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

সেখান থেকে আঁকাবাঁকা পথে ছুটে আসছে অংসখ্য নারীপুরুষ।